9517

9517

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

ভারতবর্ষের ইতিহাস

[ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদিগের জন্য নূতন সিলেবাস অনুসারে লিখিত]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন,
এম্. এ., পি-এইচ্. ডি., বি-লিট্ (অক্সন)

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক

শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্. এ., পি-এইচ্. ডি.

প্রণীত

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পঞ্চম সংস্করণ

১৯৩৮

মূল্য এক টাকা আট আনা

প্রকাশক
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এস্-সি.
১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৯৩৪ ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৫ ;
তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৬ ; চতুর্থ সংস্করণ ১৯৩৮ ;
পঞ্চম সংস্করণ ১৯৩৮

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২৫নং ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

আমাদের প্রণীত "ভারতবর্ষের ইতিহাস" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। উক্ত পুস্তকের যে বৈশিষ্ট্য শিক্ষক মহোদয়গণের প্রশংসা ও অনুমোদন পাইয়াছে, তাহার সমস্তই বর্ত্তমান গ্রন্থে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের দুইজনেরই অবসর অল্প। এই নিমিত্ত নিরতিশয় অভিনিবেশ সহকারে প্রুফ সংশোধন সকল সময়ে সম্ভব হয় নাই। এই জন্য পুস্তকের মধ্যে নানাপ্রকার ত্রুটি থাকিয়া যাইতে পারে। শিক্ষক মহোদয়গণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত না হইলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিবার বাসনা রহিল।

কলিকাতা
১লা জানুয়ারী, ১৯৩৮

শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

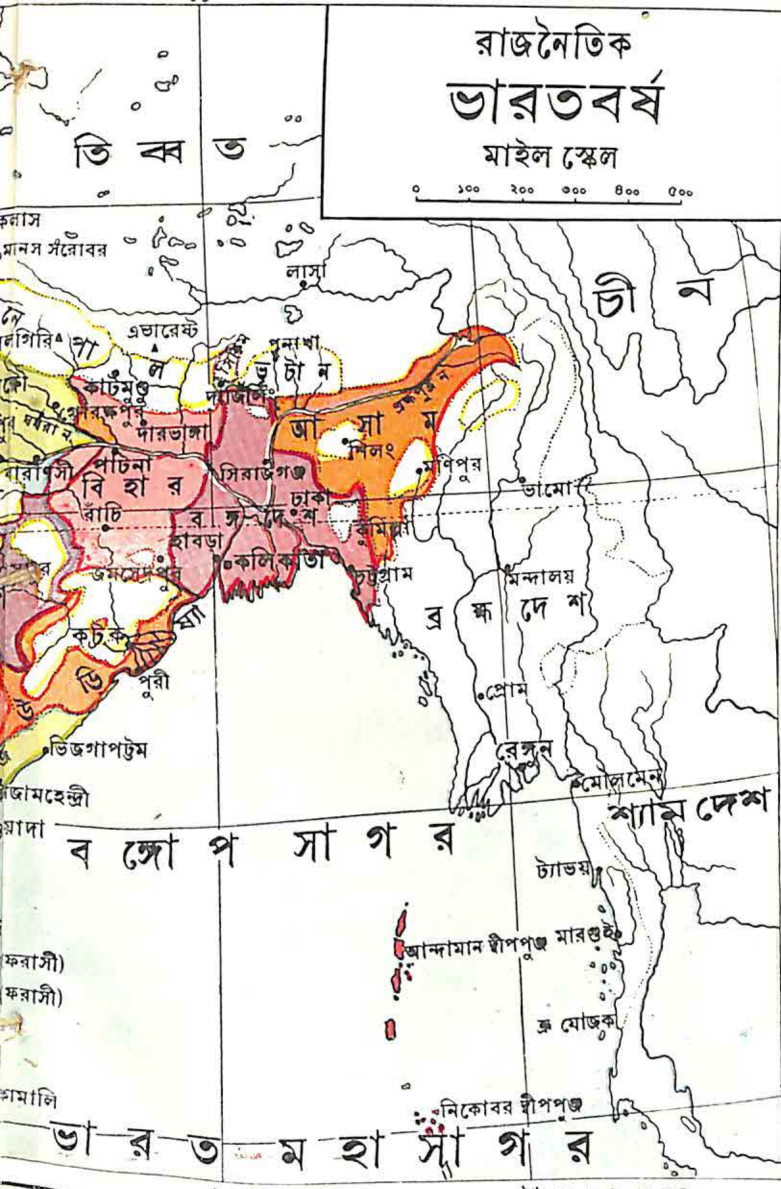
সূচীপত্র

পত্রাঙ্ক

পত্রাঙ্ক

ষষ্ঠ খণ্ড—বর্ত্তমান ভারত


৬৪
৭২
৮০
আ ফ গা নি স্থা ন
কাবুল
কা শ্মী র
শ্রীনগর
জ ম্মু
জম্মু
কান্দাহার
পা ঞ্জা ব
লাহোর
সিমলা
কোয়েটা
মুলতান
ডেরাগাজি খাঁ
বে লু চি স্থা ন
পাণিপথ
হরিদ্বার
আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ
গঙ্গা নদী
পারস্য
শিকারপুর
সিন্ধু নদী
এ জে ন্সি
বিকানীর
দিল্লী
সুক্কুর
রা জ পু তা না
মথুরা
যশলমীর
এ জে ন্সি
সি ন্ধু
আগ্রা
হায়দ্রাবাদ
আজমীর
চম্বল নদী
করাচি
এলাহাবাদ
কর্কট ক্রান্তি
পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যাবলী
উদয়পুর
ক চ্ছ
উজ্জয়িনী
দ্বারকা
গু জ রা ট
ভূপাল
নর্মদা নদী
ইন্দোর
ডিউ(পর্তু)
সুরাট
তাপ্তী নদী
নাগপুর
দমন(পর্তু)
অমরাবতী
বোম্বাই
আহমদনগর
গোদাবরী নদী
আ র ব সা গ র
শোলাপুর
হা য় দ্রা বা দ
হায়দ্রাবাদ
গোয়া(পর্তু)
বিজাপুর
নেলোর
মাঙ্গালোর
ম হী শূ র
মাদ্রাজ
বাঙ্গালোর
ক্যানানুর
মহীশূর
পণ্ডিচেরী
মাহে(ফরাসী)
কালিকট
কারিকল
ত্রিচিনাপল্লী
তাঞ্জোর
কোচিন
ত্রিবান্দ্রাম
মান্নার উঃ
সিংহল
কলম্বো
৬৪
৭২


রাজনৈতিক
ভারতবর্ষ
মাইল স্কেল
০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০
তি ব্ব ত
কৈলাস
মানস সরোবর
লাসা
চী ন
এভারেস্ট
পুনাখা
ভু টা ন
কাটমুণ্ডু
গোরক্ষপুর
দারভাঙ্গা
দার্জিলিং
আ সা ম
শিলং
মণিপুর
ভামো
পাটনা
বি হা র
বারাণসী
সিরাজগঞ্জ
ঢাকা
রাঁচি
ব ঙ্গ দে শ
কুমিল্লা
হাবড়া
কলিকাতা
জমসেদপুর
চট্টগ্রাম
মন্দালয়
ব্র হ্ম দে শ
কটক
পুরী
প্রোম
ভিজগাপট্টম
রেঙ্গুন
মোলমেন
রাজামহেন্দ্রী
শ্যাম দেশ
ব ঙ্গো প সা গ র
ট্যাভয়
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
মারগুই
(ফরাসী)
(ফরাসী)
মোজুক
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
ভা র ত ম হা সা গ র
DRAWN BY M.K NATH

ভারতবর্ষের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও মূলগত ঐক্য

ভারতের অবস্থান ও সীমা :—এশিয়ার দক্ষিণ দিকে যে তিনটি বড় বড় উপদ্বীপ আছে ভারতবর্ষ তাহাদের অন্যতম। হিমালয়, সুলেমান, পাতকোই প্রভৃতি পর্ব্বত বিরাট প্রাচীরের ন্যায় ইহার উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত ঘিরিয়া অবস্থিত। অন্যান্য দিকে সমুদ্রের গভীর জলরাশি ইহার তটভূমি ধৌত করিতেছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য নাম

বৈদিক যুগের ভরত-কুল ও পৌরাণিক ভরত রাজার নামানুসারে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। প্রাচীন-কালে ইরাণ ও গ্রীসের লোকেরা সিন্ধু নদের নামে তাহার পরপারবর্ত্তী দেশের পরিচয় দিত। ইরাণীরা সিন্ধুকে বলিত 'হিন্দু' আর গ্রীকেরা এই শব্দটিকে উচ্চারণ করিত 'ইণ্ডস্', তাই বিদেশীদিগের নিকট ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত।

ভারতের বৈচিত্র্য ঃ—ভারতবর্ষের বিশাল আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য ইহাকে একটি মহাদেশ বলা যাইতে পারে। এই দেশ আয়তনে রুশিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপের সমান। ইহার জনসংখ্যা পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এবং এখানে বহু জাতির বাস। জগতের প্রায় সকল প্রধান ধর্ম্ম এবং দুই শতের অধিক ভাষা এদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত। ভারতভূমির প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। কোথাও বরফে আচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণী শোভা পাইতেছে, আবার তাহারই পাদদেশে স্নিগ্ধ নদী-ধারা কুলু-কুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও আদিম বর্ব্বরজাতীয় লোকের আবাস বহুদূর প্রসারিত নিবিড় বন, আবার তাহারই নিকটে বেদ ও উপনিষদ্ রচয়িতা আর্য্যগণের বংশধরদিগের শ্যামল শস্যক্ষেত্র। কোথাও বা সুজলা সুফলা সমতল ভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, আবার তাহারই সীমান্তে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুরাশি ধূ ধূ করিতেছে।

আয়তন, জনসংখ্যা, ধর্ম্ম, ভাষা ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য

মূলগত ঐক্য ঃ—বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভারত তাহার মূলগত ঐক্য হারায় নাই। মহাভারতের যুগ হইতেই সমগ্র দেশ একই নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সে নাম ভারতবর্ষ। কবি ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণ হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একচ্ছত্র এক বিশাল সাম্রাজ্যের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে স্বপ্ন মৌর্য্যগণের রাজত্বকালে এবং তুঘ্লুক ও তৈমুর বংশীয়দের শাসন সময়ে প্রায় সফল হইয়াছিল। ভারতের জনসমূহের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ হিন্দু। অহিন্দু আদিম জাতিদিগের মধ্যেও হিন্দুদিগের আচার ও অনুষ্ঠানের প্রভাব দেখা যায়। ইস্লাম এ দেশের অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম। বহুদিন একই জন্মভূমির

একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের আদর্শ

ধর্ম্মের প্রভাব

ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া হিন্দু ও মুস্লিম্ সমাজ পরস্পরের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতবাসীদিগের মধ্যে বহু প্রকার ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সংস্কৃত ভাষার সমাদর সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ভারতের অধিকাংশ কথিত ভাষা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন। এমন কি দক্ষিণে মাদ্রাজ, মহিষুর, ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলেও সংস্কৃত ভাষা এবং আর্য্য সভ্যতার প্রভাব দেখা যায়। তমিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাতেও বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিধর্ম্মের প্রভেদ সত্ত্বেও জনসাধারণের আড়ম্বর শূন্য জীবনযাত্রা ও ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাও ভারতের মূলগত ঐক্যেরই নিদর্শন।

সংস্কৃত ভাষার সমাদর

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ:—ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূমি ও বালুচিস্থান বাদ দিলে এই দেশটিকে প্রধানতঃ চারিখণ্ডে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) উত্তরের পার্ব্বত্য প্রদেশ, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-তীরস্থিত সমতল ভূমি, (৩) মধ্যভারত ও দক্ষিণাপথের মালভূমি অর্থাৎ পর্ব্বতবেষ্টিত উচ্চ ভূখণ্ড এবং (৪) দক্ষিণাপথের মালভূমির উভয় পার্শ্বস্থিত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ নিম্নভূমি।

হিমালয় প্রদেশ:—উত্তর সীমান্তে বার শত মাইলের অধিক ব্যাপিয়া পর্ব্বতরাজ হিমালয় আমাদের জন্মভূমির মুকুটরূপে শোভা পাইতেছে। উচ্চতায়, আয়তনে, ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে এই পর্ব্বত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গিরিমালার অন্যতম। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে কাশ্মীর ও নেপালের বৃহৎ রাজ্য ও সিকিম্ এবং ভুটানের ক্ষুদ্র জনপদগুলি অবস্থিত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে তরাইএর নিবিড় বনস্থলী শোভা পাইতেছে।

কাশ্মীর, নেপাল ও তরাই

সিন্ধু-গঙ্গা-তীরবর্ত্তী সমতল ভূমি:—হিমালয়ের দক্ষিণে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। আরাবল্লীর উন্নত ভূভাগ

ইহাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিমে পঞ্চনদ বা পঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধুদেশ ও রাজপুতানার বিরাট মরুভূমি অবস্থিত। পূর্ব্বাংশে গঙ্গাতীরস্থিত উর্ব্বর ভূমি। রাজমহলের অনুচ্চ পর্ব্বতরাজি ইহাকে দুই-খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উপরের অংশ "মধ্যদেশ" ও নিম্নভাগ বঙ্গদেশ নামে খ্যাত।

ভারতমধ্যস্থ অধিত্যকা ভূমি :—গঙ্গা-ধৌত প্রদেশের দক্ষিণে ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী উচ্চভূমি। ইহার উত্তরে বিন্ধ্য ও তৎসংলগ্ন পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট, পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট ও দক্ষিণে নীলগিরি পর্ব্বতমালা অবস্থিত। এই উচ্চ ভূভাগের উত্তর প্রান্তে মালব ও বুন্দেলখণ্ড। গঙ্গা-তীরবর্ত্তী সমতলভূমি হইতে এই দুইটি স্থানে গমনাগমন দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু ইহার দক্ষিণস্থিত প্রদেশ কতকগুলি পর্ব্বত ও নিবিড় বনে দুর্ভেদ্য। এই দুর্গম প্রদেশের মধ্য দিয়াই পশ্চিমে নর্ম্মদা ও তাপ্তী এবং পূর্ব্বে মহানদী প্রবাহিত হইতেছে। এইখানেই দক্ষিণাপথের বিরাট অধিত্যকা অর্থাৎ উচ্চভূমির আরম্ভ। গোদাবরী, কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা ও কাবেরী নদী দক্ষিণাপথের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগরের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

মালব ও বুন্দেলখণ্ড

দক্ষিণাপথের অধিত্যকা

দক্ষিণের সমুদ্রোপকূল :—দক্ষিণ ভারতের দুই পার্শ্বে সাগর হইতে পশ্চিম ও পূর্ব্বঘাট গিরির পদমূল পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ অথচ বহুদূরলম্বিত যে নিম্নভূমি রহিয়াছে তাহা শস্যসম্পদে অতুলনীয়। দুই উপকূলেই বড় বড় বন্দর অবস্থিত। পশ্চিম-ভাগে কোঙ্কণ ও মালবার উপকূল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। পূর্ব্বভাগে তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদ এবং মদুরা ও তিন্নেভেল্লির অনুর্ব্বর

কোঙ্কণ ও মালবার উপকূল

ভূমিভাগ অবস্থিত। প্রাচীনকালে তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী অঞ্চল চোলমণ্ডল (বর্ত্তমান করোম্যাণ্ডেল) এবং মদুরা ও তিন্নেভেল্লি অঞ্চল পাণ্ড্যদেশ নামে পরিচিত ছিল।

চোল ও পাণ্ড্য দেশ

ভারত ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব ঃ—পর্ব্বত ও সমুদ্র দ্বারা বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা স্বকীয় আদর্শে স্বতন্ত্র ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের সমাজনীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভারতীয় দর্শন হিমালয়ের মতই মহান্। পুণ্য-সলিলা গঙ্গা উভয় পার্শ্বস্থিত তীরভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও দর্শন

হিমালয়ের দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীর ও মহাসমুদ্রের দুস্তর পরিখায় পরিবেষ্টিত হইয়াও ভারতবাসী বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া বিদেশী আক্রমণকারিগণ একাধিকবার ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। পরিশেষে বিন্ধ্য পর্ব্বতে বাধা পাইয়া তাহাদের গতিরোধ হইত।

বৈদেশিক আক্রমণ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাধা

উত্তর ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গাতীরে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের সুবিধা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের স্থানে স্থানে মরুভূমি ও ছোট ছোট পাহাড় ও পর্ব্বত আছে। এইজন্য এ অঞ্চলের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন সুসাধ্য ছিল না। মাঝে মাঝে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। বিন্ধ্যপর্ব্বত ও তৎসংলগ্ন গভীর বন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যগুলির

সাম্রাজ্য ও ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব

দক্ষিণ দিকে বিস্তারের ইহাই ছিল প্রধান অন্তরায়। দক্ষিণাপথের উচ্চভূমিতেও প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য সকল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই রাজ্যগুলি সিন্ধু ও গঙ্গাতীরের সাম্রাজ্যগুলি অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। অনেক পরাক্রান্ত রাজা এই সকল রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। তবে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে স্থায়ী ঐক্য স্থাপন সম্ভবপর হয় নাই। পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাটের মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকাভূমির রাজন্যবর্গের সহিত কোঙ্কণ ও চোল দেশের নরপতিগণের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত।

যে মহাসাগর ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহা ভারতের ও বহির্জ্জগতের মধ্যে একটি স্বাভাবিক ব্যবধান বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু বঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত 'সুবর্ণ-ভূমি' অর্থাৎ দক্ষিণ ব্রহ্ম, সুমাত্রা প্রভৃতি ভূখণ্ডে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ও হিন্দু উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা সমুদ্রপথেই হইয়াছিল। প্রাচীনকালে ভারতের সহিত মালয়-দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। আধুনিক যুগে মহাসাগরই ভারতবর্ষ ও সুদূর ইংলণ্ডের ভাগ্য এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। জলপথেই প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ধনরত্ন আসিয়া ভারতের বন্দরে পৌছিত।

সাগরপথে উপনিবেশ স্থাপন

ভারত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য :—ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। আর্য্যদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশ এই দেশেই হইয়াছিল। ভারতের তপোবনেই প্রথম সামরব উচ্চারিত হয় এবং উপনিষদ্ ও বেদান্তের তত্ত্ব কথা প্রচারিত হইয়াছিল। যে দুই ধর্ম্ম সম্প্রদায় (হিন্দু ও বৌদ্ধ) পশ্চিম প্রান্ত ব্যতীত সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষেই তাহার উদ্ভব হইয়াছিল। ভারতের

সুপ্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান

কথাসাহিত্যের প্রভাব গ্রীসদেশীয় ঈশপের গল্পে ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক কাহিনীতে দৃষ্ট হয়। চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতবাসিগণ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় মনীষীদের গ্রন্থ আরব পণ্ডিতগণ সাদরে পাঠ করিতেন। জগতে হিংসা, দ্বেষ ও বিরোধ নিবারণের জন্য এই ভারতেরই একজন বিজয়ী নরপতি সমর-লালসা জয় করিয়া শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বিশ্বের সমস্ত জীবের প্রতি মমতা ভারতীয়ধর্ম্মের বিশেষত্ব। মানুষের জন্য যেমন ভারতবাসী আরোগ্যশালা (হাসপাতাল) স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি মূক পশুদের জন্যও চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শান্তি ও মৈত্রীর বাণী

ভারতের নগর ও পল্লীর স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মেগাস্থিনিস্ হইতে মেটকাফ্ পর্য্যন্ত অনেক বিদেশীয় মনীষী এই শাসন পদ্ধতির উৎকর্ষ লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের একত্র সমাবেশ লক্ষ্য করিলে ইহাকে ভূমণ্ডলের চিত্রশালা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এ দেশের ইতিহাস কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না।

স্বায়ত্ত শাসন

ভূমণ্ডলের চিত্রশালা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ও নানাজাতির পরিচয়

প্রাচীন প্রস্তর-যুগের অধিবাসী

আদিম যুগের জাতিসমূহ :—অতি প্রাচীন কালে ভারতের যাঁহারা অধিবাসী ছিলেন তাঁহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা কিছুই ছিল না। ইঁহাদিগকে প্রাচীন প্রস্তরযুগের লোক বলিয়া অভিহিত করা হয়। পাথর কুড়াইয়া ইঁহারা যে অস্ত্র তৈয়ার করিতেন তাহাতে মসৃণতা অথবা কারুকার্য্যের বালাই ছিল না। ইঁহাদের পরবর্ত্তী অধিবাসীদিগকে নব্য প্রস্তরযুগের লোক বলা হয়। কারণ ইঁহারা যে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ ও মসৃণ। শুধু তাহাই নহে, পাথরের ব্যবহার ব্যতীত তাঁহারা মাটির পাত্র নির্ম্মাণের কৌশল জানিতেন, ভূমি চাষ করিয়া শস্যোৎপাদন করিতেন এবং বড় বড় পাথর দিয়া সমাধিস্থান নির্ম্মাণ করিয়া মৃতের প্রতি সম্মান দেখাইতেন। এখন মধ্যভারত এবং উড়িষ্যার পার্ব্বত্যস্থান সমূহে, বিশেষতঃ সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে যাহারা কোল এবং মুণ্ডা-বংশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ, অনেকের মতে তাহারা নব্য প্রস্তরযুগের অধিবাসীদের বংশধর।

নব্য প্রস্তর-যুগের অধিবাসী

তাম্রযুগ ও সিন্ধু-বিধৌতদেশের প্রাচীন সভ্যতা :—নূতন প্রস্তর যুগের পরে যাঁহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা তামার

ব্যবহার জানিতেন, কিন্তু লৌহের ব্যবহার অবগত ছিলেন না। প্রস্তর ও তাম্রযুগের সন্ধিক্ষণের বহু স্মৃতি-সম্বলিত যে সকল জিনিস সম্প্রতি পঞ্জাবের অন্তঃপাতী হরপ্পা এবং সিন্ধুর অন্তর্গত মহেঞ্জো-দড়ো নামক স্থানের মাটি খুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল আবিষ্কার অপেক্ষা বিস্ময়কর। প্রাচীন কালে, খৃষ্টযুগের হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু উপত্যকায় যে এক সুসভ্য মহাজাতি বাস করিত, এই সকল আবিষ্কারে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। সেখানকার প্রাপ্ত জিনিসগুলি দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় যে স্মরণাতীত কালে যখন অন্যান্য বহুদেশ অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন এই ভারতের বক্ষে এমন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা মিশর (Egypt) ও মহাচীনের সভ্যতা অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নহে; সেখানকার মাটি খুঁড়িয়া যে ইষ্টকালয় বাহির হইয়াছে তাহাতে স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালী, নরনারীর প্রতিকৃতি, বিবিধ জন্তুর আলেখ্য, সুচিত্রিত মাটির পাত্র, স্বর্ণ ও মণি, কতকগুলি মুদ্রা (বা মাদুলি) এবং চিত্রলেখযুক্ত কতিপয় শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। মহেঞ্জো-দড়োর জিনিসগুলি দেখিয়া বোধ হয় সেকালে শিব ও জগদম্বা দেবীর অর্চ্চনা ও বৃক্ষপূজার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সে সময় মৃতদেহ ভস্মীভূত করার প্রথা অবিদিত ছিল না। দগ্ধ অস্থির ক্ষুদ্র কয়েকটি খণ্ড কখন কখন মৃৎপাত্রে অথবা ইষ্টকনির্ম্মিত আধারে রাখিয়া দেওয়া হইত। পারস্যদেশের পশ্চিমস্থিত মেসোপোটেমিয়ার 'সুমের' প্রদেশের সভ্যতার সহিত প্রাচীন সৈন্ধব সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে দ্রবিড় জাতীয় লোকেরাই এই সভ্যতার স্রষ্টা।

সৈন্ধব ভূমির প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা

দ্রবিড়জাতি:—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তমিলদেশের প্রাচীন নাম দ্রবিড়। এই নাম হইতেই দ্রবিড়জাতির নামের উৎপত্তি।



মহেঞ্জো-দড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহর

দক্ষিণ ভারতের তমিল, তেলেগু (অন্ধ্র), মলয়ালম, কাণাড়া প্রভৃতি ভাষায় যাহারা কথা বলে ব্যাপক অর্থে দ্রবিড় বলিতে তাহাদিগকেই বুঝায়। বালুচিস্থানে ব্রাহুই নামে যে একটি ভাষা প্রচলিত আছে উহাও দ্রবিড়শ্রেণীর অন্তর্গত। বালুচিস্থানে দ্রবিড় ভাষা (ব্রাহুই)র প্রচলন দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতেই দ্রবিড়গণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বৈদিক আর্য্যগণ যে দাস বা দস্যু নামক অনার্য্যজাতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দ্রবিড়েরা সেই দস্যু, ইহাই অনেকের অভিমত। দস্যুদের নাক চেপ্টা এবং দেহের রং কালো ছিল। তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। কারণ তাহাদের ভাষায় 'পুর' অর্থাৎ নগর বা দুর্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে দস্যু বলিতে কেবল অন্ধ্র প্রমুখ দ্রবিড়দিগকেই বুঝাইত না; মুণ্ডাজাতির শবরগণও দস্যু নামে অভিহিত হইত।

দ্রবিড় ভাষা

দ্রবিড় সভ্যতা

দ্রবিড়দের কোন কুলক্রমাগত পুরোহিত বা দেববিগ্রহ ছিল না। স্বর্গ, নরক, আত্মা, পাপ প্রভৃতির ধারণাও তাহাদের ছিল না। কিন্তু তাহারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ ছিল এবং তাঁহাকে 'কো' বা রাজা বলিয়া অভিহিত করিত। তাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে 'কো-ইল' বা ভগবানের মন্দির নির্ম্মাণ করিত। কালক্রমে দ্রবিড়গণ শিব, মাতৃকা, নাগ, যক্ষ এবং অন্যান্য দেবতা ও উপদেবতার উপাসক হইয়া উঠে। সাহিত্যচর্চ্চা এবং বিদেশীয়গণের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহারা অতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দড়োর আবিষ্কৃত সভ্যতার তাহারাই প্রকৃত স্রষ্টা কি না তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

তিব্বতীয়-ব্রহ্ম ঃ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দ্রবিড়গণ সম্ভবতঃ

উত্তর-পশ্চিম পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। আর একদল লোক উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তের পার্ব্বত্যপথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কিরাত

ভুটিয়া, নাগা, লেপ্‌চা, কিরান্তী ও নেপালী প্রভৃতি জাতি তাহাদেরই বংশধর। ইহারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহাদের ভাষা তিব্বতীয়-ব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত। কিরান্তীগণই সম্ভবতঃ বেদ-বর্ণিত কিরাত। ইহারা পর্ব্বতের গুহায় বাস করিত বলিয়া উল্লেখ আছে।

আর্য্যজাতি ঃ—এপর্য্যন্ত যে কয়েকটি জাতির কথা বলা হইয়াছে, তাহারা সকলেই আর এক দল আগন্তুকের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। এই বিজেতা দলই বেদবর্ণিত আর্য্যজাতি। উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে এবং দক্ষিণাপথের মহারাষ্ট্র, বেরার, উড়িষ্যা

আর্য্যভাষা

প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি, মরাঠি, উড়িয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাষা যাঁহাদের খাঁটি মাতৃভাষা বলিয়া পরিগণিত আর্য্যগণ তাঁহাদেরই উচ্চশ্রেণীস্থ নরনারীর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। প্রাচীন আর্য্যগণ দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ এবং উচ্চ নাসিকাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা অগ্নি,

পারসিক ও ইউরোপীয়দের সহিত জ্ঞাতিত্ব

ইন্দ্র, দ্যৌ, মিত্র, বরুণ, রুদ্র, বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতার পূজা করিতেন। তাঁহাদের ভাষার সহিত পারস্যের ধর্ম্মগ্রন্থ অবেস্ততে ব্যবহৃত ইরাণী ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইউরোপের সুসভ্য জাতিসমূহের ভাষার সঙ্গেও তাহার কতকটা সাদৃশ্য বর্ত্তমান। কয়েকজন দেবতার নামের সহিত এবং ভাষার সহিত ঐক্য আছে বলিয়াই ভারতীয় আর্য্যগণকে কেবল পারসিক নহে, গ্রীক, রোমক, জার্ম্মান এবং ইংরেজ প্রভৃতি জাতির জ্ঞাতি বলিয়া বর্ণনা করা

হয়, কিন্তু ভাষা ও ধর্ম্মের মিল থাকিলেই সকল সময়ে জাতীয় ঐক্য প্রমাণিত হয় না।

পরবর্ত্তী জাতিসমূহ ঃ—কেবল বৈদিক আর্য্যগণই নহে, আর্য্যদের পরেও অনেক জাতি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারসিকগণ ভূমধ্যসাগর হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পরে পঞ্চনদের কতকটা অংশও তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে মেসিডোন এবং গ্রীসদেশের বিজয়ী বীরগণ পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কতিপয় স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন।

প্রাচীন পারসিক ও গ্রীকগণ

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে শক, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার যাযাবর অর্থাৎ নিয়ত ভ্রমণকারী জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম পথ বাহিয়া দলে দলে আসিয়া এদেশে উপস্থিত হয়। তাহাদের অনেকে পেশোয়ার, তক্ষশিলা, শিয়ালকোট, মথুরা, রাজপুতানা, মালব, সুরাষ্ট্র এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে বসতি স্থাপন করে। ঐতিহাসিকগণের মতে ভারতের অনেক প্রদেশের লোক এই সকল নবাগত জাতির বংশধর। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিজয়দৃপ্ত মুসলমানগণ যখন পারস্যের দিকে অগ্রসর হন, তখন সেখানকার একদল লোক প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিয়া পশ্চিম ভারতের কয়েকটি স্থানে আশ্রয় লয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ তাহাদিগকে পরম সমাদরে অতিথিরূপে বরণ করেন। ইহারাই এখন বোম্বাই প্রদেশে পার্সি নামে খ্যাত। পার্সিগণ আধুনিক ভারতের একটি প্রধান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ সিন্ধুদেশ জয় করেন। একাদশ শতাব্দীতে এবং তাহার পরেও কয়েক

শক-হূণ

পার্সি

মুসলমানগণ

শতাব্দী পর্য্যন্ত তুর্কি ও তাঁহাদের সংসৃষ্ট অন্যান্য জাতি পঞ্জাব অধিকার করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা ভারতের বৃহত্তর অংশের প্রভু হইয়া বসেন। এই সকল আক্রমণকারী মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে এক নূতন তেজ ও শৌর্য্যের সঞ্চার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাচীন ভারত

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগ ও তৎপরবর্ত্তীকালের আর্য্য সভ্যতা

আর্য্যগণের পিতৃভূমি :—আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া বৈদিক-যুগে কোথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস ও আদিম বাসভূমির কথা এখনও অজ্ঞাত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে মধ্য এশিয়াখণ্ডে আর্য্যজাতির আদি নিবাস ছিল। আবার কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে উত্তরমেরু অঞ্চলই আর্য্যদিগের পিতৃভূমি। কোন কোন পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ রুশিয়া অথবা অষ্ট্রিয়াহাঙ্গেরীর নাম করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই স্বীয় মতের অনুকূলে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। এই সকল প্রদেশে বৈদিক আর্য্যদিগের উপাস্য ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতার পূজার কোনও অতি প্রাচীন নিদর্শন এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পশ্চিম-এশিয়ায় যে প্রাচীনকালে আর্য্যগণ এক সময়ে বাস করিতেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে।

আর্য্যগণের ভারতে আগমন :—আর্য্যগণের পূর্ব্ব নিবাস যেখানেই থাকুক তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া এখানকার আদিম অধিবাসীদিগের উপরে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যদিও সর্ব্বপ্রথমে কখন তাঁহারা ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা এখনও স্থির করা যায় নাই, তথাপি

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের (খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) বহু শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা যে উত্তর ভারতের জনপদগুলি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ অবধারিত।

ভারতীয় আর্য্য

সপ্তসিন্ধু ঃ—ভারতীয় আর্য্যগণ প্রথমে আসিয়া 'সপ্তসিন্ধু' অর্থাৎ সিন্ধুপ্রমুখ সাতটি নদীর তীরবর্ত্তী সুন্দর প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই স্থানটি কাবুল হইতে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বৈদিক যুগের আর্য্য জনমণ্ডলী

সপ্তসিন্ধু তীরস্থিত আর্য্যগণের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। কেবল এইটুকু জানা গিয়াছে যে তাঁহাদের মধ্যে কোন একচ্ছত্র রাজা ছিল না। গন্ধারি, যদু, পুরু, ভরত প্রভৃতি নানা শাখায় তাঁহারা বিভক্ত ছিলেন এবং আদিম অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হইত। এই আদিম অধিবাসীদিগকে তাঁহারা দাস বা দস্যু নামে অভিহিত করিতেন। পরবর্ত্তী কালে ইহাদিগকেই অনার্য্য বলা হইত। অনার্য্যগণের দেহের রং কালো এবং নাসিকা চেপ্টা ছিল। তাহারা আর্য্যগণের দেবতা ও যাগ-যজ্ঞে বিশ্বাস করিত না, এবং সুবিধা পাইলেই নানা-প্রকার উপদ্রব করিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইত। তথাপি তাহারা একেবারেই অসভ্য ছিল না।

দস্যুদের সহিত সংগ্রাম

তাহারা পশুপালন করিত এবং সুরক্ষিত 'পুর' বা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত এবং নূতন আগন্তুকদের সাড়া পাইলেই যথাসাধ্য তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিত। কিন্তু আর্য্যগণের নিকট ক্রমশঃ তাহাদিগকে পরাজয় মানিতে হইল। অবশেষে অনেকে পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে ও জঙ্গলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। কেহ বা বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রাণ বাঁচাইল, কেহ বা বন্ধুভাবে আর্য্যসমাজে গৃহীত হইল। যাহারা

জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই আর আর্য্যনিবাসে ফিরিয়া আসে নাই। তাহাদের বংশধরগণ আজও অরণ্যচারী। সেকালের আর্য্যগণ পায়ে হাঁটিয়া অথবা রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন। তাঁহারা বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিতেন এবং তীর, ধনুক, বর্শা ও কুঠার লইয়া যুদ্ধ করিতেন।

মধ্যদেশ অধিকার :—আর্য্যগণ অধিকদিন সপ্তসিন্ধু দেশে আবদ্ধ রহিলেন না। রাজ্যজয় ও নূতন দেশের সন্ধানে তাঁহারা আরও দূরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঋগ্বেদের সময়েই পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও যমুনা নদী এবং সম্ভবতঃ অযোধ্যার সরযূ নদী পর্য্যন্ত আর্য্যভূমি বিস্তৃত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৈদিকযুগে আর্য্য অধিকার গণ্ডক নদী অতিক্রম করিল। সরস্বতী হইতে উত্তর বিহার ও কাশী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ আর্য্যগণের করতলগত হইল। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এই রাজ্যগুলি ভাগ করিয়া লইলেন। থানেশ্বর ও দোয়াবের (অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থিত ভূখণ্ডের) উত্তরভাগে কুরুরাজ্য স্থাপিত হইল, পঞ্চালগণ রোহিলখণ্ড ও মধ্য দোয়াব লইলেন, মৎস্যগণ রহিলেন জয়পুর অঞ্চলে, সাত্বত বা শূরসেনগণ মথুরায়, কোশলগণ অযোধ্যায়, কাশীগণ বারাণসীতে এবং বিদেহগণ উত্তর বিহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কুরুক্ষেত্র

পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী (চিতাং বা রকৃসি) পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুরুভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত বা কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হইল। পঞ্চাল, শূরসেন এবং মৎস্যদেশ সহ অবশিষ্ট কুরুরাজ্য ব্রহ্মর্ষি দেশ নামে খ্যাত হইল।

পূর্ব্ব ভারত জয় :— বিহার এবং বাংলাদেশে বহুকাল অনার্য্যজাতির আবাস ছিল। আরণ্যকের যুগে মগধ বা দক্ষিণ বিহার প্রদেশে

বাংলায় আর্য্যাধিকার

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে। জৈনগ্রন্থে দেখা যায় অঙ্গদেশ বা পূর্ব্ব বিহার এবং বঙ্গদেশ বা পূর্ব্ব বাংলা আর্য্য নিবাসে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের

পরপারের দেশগুলি কিন্তু বহুদিন আর্য্য অধিকারের বাহিরে ছিল। কালক্রমে ঐ ভূখণ্ডে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ নামে এক পরাক্রান্ত রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। তথাকার নরপতিগণ নরক ও ভগদত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন।

কামরূপ

পশ্চিম ভারতে আর্য্যপ্রভাব বিস্তার :—বৈদিকযুগের শেষভাগে ভারতের পশ্চিম অংশে অবস্থিত জনপদ সমূহের রাজগণ আর্য্যদিগের যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন কিন্তু জনপদবাসিগণ বিশুদ্ধ আর্য্য ছিলেন না। মনুসংহিতার যুগে আর্য্যাবর্ত্ত বলিতে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম-সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ বুঝাইত। ইহাতে মনে হয় যে ঐ সময়ে আর্য্যাধিকার আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

আর্য্যাবর্ত্ত

দাক্ষিণাত্য প্রদেশ :—বহুদিন পর্য্যন্ত যমুনা নদী আর্য্য ভারতের দক্ষিণ সীমা ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষভাগেই আর্য্যগণ বিন্ধ্য পার হইয়া দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সাত্বতবংশীয় আর্য্যেরা যমুনা হইতে বেরার এবং গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পরেই ছিল পুলিন্দ, শবর, কলিঙ্গ ও অন্ধ্র প্রভৃতি অনার্য্য জাতির দেশ। পুলিন্দগণ বিন্ধ্যারণ্য ও নর্ম্মদার উপত্যকায় বাস করিত, উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চলে শবরদিগের নিবাস ছিল। কলিঙ্গদেশ উড়িষ্যার বৈতরণী নদী হইতে গোদাবরীর সন্নিহিত প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত। উহার দক্ষিণে গোদাবরী ও কৃষ্ণার তীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে অন্ধ্রগণের আবাসস্থান।

দক্ষিণাপথ

গোদাবরীর দক্ষিণে আর্য্য প্রভাব বিস্তারের কাহিনী রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথের অনেক জায়গাই তখন বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিন্তু আর্য্য ঋষিরা পম্পা বা তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সিংহলের অধিবাসিগণ আর্য্যরাজকুমারদিগের ভুজবলের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

সুদূর দক্ষিণে আর্য্য অভিযান

প্রাচীন আর্য্যগণের রাষ্ট্রীয় সংগঠন :—বৈদিক যুগে আর্য্যগণের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান ভিত্তি পরিবার। পরিবারের কর্ত্তা গৃহপতি। কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গ্রাম ; এবং কয়েকটি গ্রাম লইয়া "বিশ্" বা "জন" সংগঠিত হইত। গ্রামের অধ্যক্ষকে গ্রামণী বলিত এবং বিশ্ বা জনের কর্ত্তাদের উপাধি ছিল "বিশ্পতি" বা "রাজন্"।

বৈদিক যুগে রাজতন্ত্রই সমধিক প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ রাজাই সাধারণতঃ রাজ্য শাসন করিতেন। অবশ্য "গণ" এবং গণজ্যেষ্ঠের উল্লেখ নাই এমন নহে। যে সকল নৃপতিহীন রাষ্ট্রে জননায়কগণ শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন তাঁহাদিগকে "গণ" বলা হইত, এবং শাসকবর্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তি "গণজ্যেষ্ঠ" বলিয়া অভিহিত হইতেন। রাজপদ ছিল প্রায়শঃ বংশগত, এবং অনেক রাজ্যে একই রাজার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিতেন। গৃহপতি যেমন পরিবারের কর্ত্তা—রাজাও সেইরূপ রাজ্যের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি একাধারে ধর্ম্মাধ্যক্ষ, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং যাজ্ঞিক পুরোহিতগণের রক্ষক ও প্রতিপালক ছিলেন। রাজকার্য্যে নৃপতি সেনানায়ক "সেনানী" এবং গ্রামের নায়ক "গ্রামণী"দের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন। সভা ও সমিতি নামে জনসাধারণের যে প্রতিষ্ঠান ছিল রাজাকে তাহার মত অনুসারে চলিতে হইত।

রাজা ও সভা-সমিতি

কিন্তু বৈদিকযুগের শেষভাগে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঋগ্বেদের যুগের ছোট ছোট আর্য্য গোষ্ঠী বড় বড় রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শক্তিশালী নরপতিগণ অপর সকলের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতেন। যাঁহারা কৃতকার্য্য হইতেন তাঁহাদিগকে "একরাট্" বলা হইত। একচ্ছত্র রাজা অর্থে "একরাট্" শব্দ ব্যবহৃত হইত। রাজসূয়, বাজপেয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা এইরূপ প্রভুত্ব স্থাপিত হইত। রাজতন্ত্রের প্রচলন সত্ত্বেও সেকালে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন ছিল না। রাজ্যাভিষেকের সময় প্রত্যেক রাজা কর্ত্তব্যপালনের শপথ গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ ও সভাসমিতির প্রতি আনুগত্যও নরপতিগণকে স্বীকার করিতে হইত।

বৈদিক যুগের শেষভাগে একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

বর্ণঃ—আর্য্যগণের সামাজিক ইতিহাস লিখিতে হইলে দুইটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য। প্রথম, 'বর্ণ' বা জাতি বিভাগ, দ্বিতীয়, 'চতুরাশ্রম'। ঋগ্বেদে আর্য্য ও আদিম অধিবাসিগণের বর্ণভেদের উল্লেখ ত আছেই, তদুপরি আর্য্যজাতির মধ্যে ব্রহ্মণ্, ক্ষত্র এবং বিশ্ (পরবর্ত্তী বৈশ্য জাতি) এই তিন শ্রেণীর লোকের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা (ক্ষত্র) ও ব্রহ্মণ্ বা পুরোহিতের পদ আদি বৈদিক যুগেই কুলগত হইয়া পড়িয়াছিল। একটি সূক্তে মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত করার আভাসও আছে। কিন্তু জাতিভেদ তখনও আর্য্য সমাজে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই। তাই এক জাতির সহিত অন্য জাতির বিবাহ বন্ধনে কোন বাধা ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ নিজ নিজ কৌলিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতেও পারিতেন।

ঋক্ সংহিতা ভিন্ন অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ ও সূত্রের যুগে উচ্চ ও নিম্ন

শ্রেণীর পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন এক জাতির সহিত অন্য জাতির বিবাহ অথবা অন্নগ্রহণ ক্রমশঃ নিষিদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে চাহিতেন না। অসবর্ণ বিবাহের ফলে এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে গুণকর্ম্মানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী বিভাগের জন্য জাতির সংখ্যা বাড়িয়া গেল। অসবর্ণ বিবাহ সমাজে আদরণীয় না হইলেও একেবারে বন্ধ হইল না। শূদ্রগণ প্রধানতঃ পরাজিত আদিম অধিবাসীর বংশধর বলিয়া অনাচরণীয় বিবেচিত হইতেন। বেদপাঠ ও যজ্ঞের অধিকার না থাকিলেও তাহাদের সহিত নিম্ন শ্রেণীর বৈশ্যগণের ব্যবধান ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল।

আশ্রম :—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটি উচ্চ বর্ণের লোকদিগকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের কঠোর অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত। ব্রহ্মচারী অবস্থায় প্রত্যেক বৈদিক ছাত্রকে পবিত্রতার ব্রত লইয়া গুরুগৃহে ভোগবিলাসহীন নিরলস অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে হইত। গার্হস্থ্য জীবনে তাহাকে বিবাহ করিয়া সাধারণ গৃহীর আদর্শ অনুসরণ করিতে হইত। তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ। এই সময়ে তাহাকে বনে কুটির বাঁধিয়া তপস্বীর ন্যায় দিন যাপন করিতে হইত। ইহার পরে সংসারের সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের সর্ব্ব প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুক্তির চিন্তায় জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিতে হইত।

বৈদিক সমাজে নারীর স্থান :—বৈদিক সমাজে নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত উচ্চে। আর্য্যকন্যাগণ পিতার গৃহে শিক্ষালাভ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদমন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী ছিলেন গৃহের কর্ত্রী। স্বামীর সহধর্ম্মিণী-রূপে তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। সে সময়ে মহিলাদিগকে

ঋগ্বেদের যুগে নারীর মর্য্যাদা

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধর্ম্ম ও কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে দূরে রাখা হইত না। আদি যুগে তাঁহারা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিতেন না। বস্ত্রবয়ন ও সূচী-শিল্প প্রভৃতি কর্ম্মে তাঁহাদের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। বিধবা-বিবাহও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না।

পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থ ও কল্পসূত্র রচনাকালে কোনো কোনো বিষয়ে মহিলাদের অধিকার একটু খর্ব্ব হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সময়েও শিক্ষিতা মহিলাগণ রাজসভায় দার্শনিক আলোচনায় যোগদান করিতেন।

আর্য্যগণের ব্যবসায় ও বৃত্তি :—প্রাচীন আর্য্যগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য ও পশুপালন করিয়া তাঁহাদের সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে শিল্পকলার অনাদর ছিল না।

কৃষি ও শিল্প

প্রাচীন গ্রন্থে অনেক স্থানে ধাতুশিল্পী, চর্ম্মকার, রথকার, তন্তুবায় প্রভৃতির উল্লেখ আছে। দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য দিয়া প্রথমতঃ ব্যবসায় পরিচালিত হইত। কিন্তু মুদ্রার ব্যবহারও সম্ভবতঃ অজ্ঞাত ছিল না। "নিষ্ক" নামক স্বর্ণখণ্ড মুদ্রা হিসাবেই বোধ হয় ব্যবহৃত হইত। ভুজ্যুর নৌকাডুবির গল্প হইতে মনে হয় প্রাচীন বৈদিক যুগে হয়তো আর্য্যগণ ভারত মহা-সাগরেও বাণিজ্য করিতেন। পরবর্ত্তী কালের জাতক গ্রন্থে বাবেরু বা ব্যাবিলোন নগরাভিমুখে সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

ব্যবসায় ও নৌবিদ্যা

কিন্তু মধ্যদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ এই সকল বাণিজ্য-অভিযান অনুমোদন করিতেন না।

পোষাক পরিচ্ছদে আর্য্যগণের বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। সেকালে পশমী কাপড়ের প্রচলন ছিল এবং কখন কখন জরীর কাজ করা পরিচ্ছদের উল্লেখ দেখা যায়।

পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য

নানা প্রকারের অলঙ্কারও ব্যবহৃত হইত। আর্য্যগণ প্রধানতঃ দুধ, ফল, শাকসব্জী খাইয়া জীবন ধারণ

করিতেন। মাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল না। উৎসব উপলক্ষেই সাধারণতঃ মাংস খাওয়া হইত। কিন্তু ঋগ্বেদের সময় হইতেই গাভীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ধেনু পবিত্র জীব বলিয়া সমাজে যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইত।

পানীয় আমোদ-প্রমোদ

আর্য্যগণের মধ্যে দুগ্ধ ব্যতীত সোমরস বা সোমলতার রস এবং সুরা নামক অপর এক প্রকার পানীয়ের প্রচলন ছিল। এতদ্ব্যতীত রথচালনা, মৃগয়া, পাশাখেলা এবং নৃত্য-গীতের উল্লেখ দেখা যায়।

ধর্ম্ম :—আর্য্যগণ প্রাকৃতিক মহাশক্তিনিচয় ও তদধিষ্ঠাতৃদেবতাগণকে উপাস্য জ্ঞানে পূজা করিতেন।

ঋগ্বেদের দেবতা

আদিযুগে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা আরাধ্য ছিলেন স্বর্গের দেবতা "দ্যৌ"। তাঁহাকেই জগৎপিতা বলা হইত। গ্রীক্‌গণ ইহাকে জিউস, এবং রোমের অধিবাসিগণ জুপিটার আখ্যা দিয়াছিলেন। পিতা দ্যৌর সঙ্গিনী ছিলেন মাতা পৃথিবী। কিন্তু পরে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশের দেবতা (পরবর্ত্তীকালে জলের অধিপতি) বরুণের পূজার অধিকতর প্রচলন হয়। বরুণই ছিলেন বৈদিকযুগে 'ঋত' অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিধির নিয়ন্তা, স্রষ্টা ও পালনকর্ত্তা। পরিশেষে বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিলেন। ইহা ব্যতীত অপর যে সকল দেবতার নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে অগ্নি, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, বায়ু, নাসত্য বা অশ্বিদ্বয় (সম্ভবতঃ শুকতারা ও সান্ধ্যতারা, পরবর্ত্তীকালে স্বর্গীয় বৈদ্য), সৌরদেবতা সূর্য্য, মিত্র ও ত্রিবিক্রম বিষ্ণু, প্রবল ঝটিকা ও অশনির দেবতা রুদ্র এবং উষাদেবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

একেশ্বরবাদ

বিভিন্ন দেবগণ যে একই মহাশক্তির বিভিন্ন বিকাশ, ঋগ্বেদে তাহারও

আভাস পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী বৈদিকযুগে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং "প্রজাপতি" দেবগণের অগ্রগণ্য বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনিই পরে ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। রুদ্র-শিব এবং বিষ্ণু পূজাও উত্তরোত্তর আর্য্যসমাজে প্রচলিত হইতে লাগিল। দার্শনিকগণ বিশ্বের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান পাইয়া তাহা জনসমাজে প্রচার করিলেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বসত্ত্ব যে অবশেষে একই ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় পর্য্যবসিত ক্রমশঃ এই মহাসত্যের উপলব্ধি হইতে লাগিল। কর্ম্মফল ও দেহান্তরবাদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সূত্রের যুগে জীবে দয়া ও গাভীরক্ষণের উপকারিতাবোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে মূর্ত্তিপূজা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী বৈদিকযুগের ধর্ম্ম

পরব্রহ্ম

অহিংসা

সাহিত্যচর্চ্চা, বেদ :—প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণ সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বেদ নামক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণ বেদের মন্ত্রগুলিকে ভগবৎবাণীরূপে শ্রদ্ধা করিতেছেন। ভগবানের শ্রীমুখনির্গত শ্রুত বাক্য বলিয়া ইহাকে 'শ্রুতি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বেদমন্ত্র ঋক্, সাম, যজুষ্ ও অথর্ব্ব এই চারি সংহিতায় বিভক্ত।

শ্রুতি

সংস্কৃত সাহিত্যে বেদই প্রথম স্থানের অধিকারী। শুধু তাহাই নহে, আর্য্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্র প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃদেবগণের উদ্দেশে লিখিত।

ঋগ্বেদ

আর্য্যগণ সুখ-সমৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন এবং স্তুতিগান, ঘৃতাহুতি, সোমরস দ্বারা তাঁহাদের তুষ্টিসাধন করিতেন। ঋগ্বেদ দশ মণ্ডল বা গ্রন্থাংশে বিভক্ত। যে সকল ঋষির নিকট ভগবানের বাণী প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রত্যেক মণ্ডলে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মধ্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

পরবর্ত্তী বেদসমূহ

সামবেদের অধিকাংশই ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত, কিন্তু সঙ্গীতের আকারে গ্রথিত। যজুর্ব্বেদে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্ম্মের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় মন্ত্রসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের উদ্দেশে লিখিত কয়েকটি চমৎকার স্তোত্র আছে, কিন্তু এই বেদ প্রধানতঃ কতকগুলি আভিচারিক মন্ত্রের সমষ্টি, এবং অপদেবতা, ব্যাধিপীড়া ও হিংস্রজন্তুর প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত।

বৈদিক গ্রন্থের বিভাগ ঃ—উপরে যে চারিখানি বেদ সংহিতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা হিন্দুদের শ্রুতি বা শ্রুত বাক্যের এক অংশ মাত্র। ইহার আরও তিনটি অংশ আছে। তাহাদের নাম

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। "ব্রাহ্মণ" মুখ্যতঃ গদ্যে লিখিত বৈদিক যজ্ঞীয় মন্ত্রের বিবৃতি। "আরণ্যক" ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ভাগ; যাঁহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রণিধানের উপযোগী কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় পরিপূর্ণ। "উপনিষদ্" গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি আরণ্যকেরই অংশ বিশেষ। ইহাতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্পকীয় অনেক গভীর তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সূত্র গ্রন্থ ঃ—উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই "শ্রুতি"র পরিসমাপ্তি। তৎপরে "সূত্র" নামক গ্রন্থগুলি রচিত হয়। ইহা "স্মৃতি"র অন্তর্ভূত। প্রাচীন ঋষিগণ বংশপরম্পরাক্রমে যে সকল বেদসম্মত নিয়ম পদ্ধতি স্মরণ করিয়া রাখিতেন, তাহার নাম স্মৃতি। ছয়খানি বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের অবয়বস্বরূপ, বেদপাঠ ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানসহায়ক গ্রন্থ এবং ছয়খানি দর্শন শাস্ত্র লইয়া প্রধানতঃ "সূত্র" সাহিত্য রচিত। সূত্র সমূহ কয়েকটি মাত্র শব্দ বা অক্ষরে লিখিত সংজ্ঞা বা বচনের সমষ্টি। অল্প কথায় অতি সংক্ষেপে বহু তথ্য প্রকাশ করাই ইহাদের বিশেষত্ব।

স্মৃতি ও শ্রুতি

ছয় বেদাঙ্গ ঃ—বেদাঙ্গ সাহিত্য শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প সংজ্ঞক ছয়ভাগে বিভক্ত। শুদ্ধ করিয়া বেদ পড়িতে হইলে যে শাস্ত্রে বর্ণাদির বিশুদ্ধ উচ্চারণ অবগত হওয়া যায় তাহার নাম "শিক্ষা"। যে শাস্ত্রে বৈদিক পদ-বিন্যাসের কথা আলোচিত হইয়াছে তাহার নাম "ছন্দ"। "ব্যাকরণ" বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রণালী। ভাষাবিদ্যার এই শাখাতেই পাণিনি তাঁহার "অষ্টাধ্যায়ী" গ্রন্থ লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। "নিরুক্তে" শব্দের উৎপত্তি বিচার ও বেদান্তর্গত কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা আছে। শব্দবিদ্ যাস্ক এই গ্রন্থের প্রণেতা। "জ্যোতিষ" শাস্ত্রে নক্ষত্র তারা প্রভৃতির সংস্থান আলোচিত হইয়াছে। "কল্প"সূত্র হইতে ধর্ম্মের বিধান ও প্রণালী অবগত হওয়া যায়। কল্পসূত্র আবার কয়েকটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। "শ্রৌত"সূত্রে বৈদিক যাগযজ্ঞের নিয়মাদি বর্ণিত হইয়াছে। "শুল্ব"সূত্র যজ্ঞস্থান, বেদী প্রভৃতির পরিমাপনির্দ্দেশক শাস্ত্র। ভারতীয় রেখা-গণিত বা জ্যামিতির ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন

পাণিনি ও যাস্ক

হিন্দু রেখা-গণিত

গ্রন্থ। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অনুষ্ঠানগুলির কথা "গৃহ্য"সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। "ধর্ম্ম"সূত্র পাঠে শাসনপদ্ধতি, দণ্ডবিধি ও অন্যান্য নিয়মাবলীর কথা অবগত হওয়া যায়। কথিত আছে যে, এই সকল প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়াই মনু ও তাঁহার পরবর্ত্তী সংহিতাকারগণ তাঁহাদের শ্লোকবদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

মনুসংহিতা

ছয় দর্শন ঃ—হিন্দুদের দর্শন প্রধানতঃ ছয় শাখায় বিভক্ত ছিল। যথা—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। সাংখ্যদর্শন কপিলের, যোগদর্শন পতঞ্জলির, ন্যায়দর্শন গৌতম অক্ষপাদের, বৈশেষিকদর্শন কণাদের, পূর্ব্বমীমাংসা জৈমিনির ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত বাদরায়ণ ব্যাসের প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই সকল দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব কাল এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু এগুলি উপনিষদের পরবর্ত্তী ও বাণ প্রণীত হর্ষচরিতের পূর্ব্বযুগে উদ্ভূত সন্দেহ নাই

বিভিন্ন দর্শনের উদ্ভবকাল

মহাকাব্যের সূচনা ঃ—বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহাতে অনেক উপাখ্যান বা ইতিহাস এবং বীরগণের উদ্দেশ্যে রচিত 'গাথা নারাশংসী' বা স্তুতি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল ইতিহাস ও গাথাই ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া মহাভারত ও রামায়ণ নামক মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছে।

মহাভারত ঃ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই মহাকাব্যের প্রণেতা। এই বিরাট্ গ্রন্থখানি হাস্তিনপুরের ভরতবংশের দুইটি শাখার মধ্যে আত্মকলহের কাহিনী লইয়া লিখিত। ভরত বা কুরুবংশের এক নৃপতির ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিল। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন ১০২ সন্তানের জনক, তন্মধ্যে দুর্য্যোধনই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। পাণ্ডুর ছিল পাঁচ

পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাণ্ডুপুত্রগণ পঞ্চালরাজের কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া জ্যেষ্ঠতাতপুত্রগণের নিকট পৈতৃক রাজ্যের অংশ দাবী করেন। কুরুরাজ্যের প্রান্তে তাঁহাদিগকে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান দেওয়া হইলে তাঁহারা সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দ্রপ্রস্থ বর্ত্তমান দিল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত। পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সহ্য হইল না। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করেন এবং কৌশলে পরাজিত করিয়া তের বৎসরের জন্য ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাকে নির্ব্বাসনে প্রেরণ করেন। নির্ব্বাসনকাল অতীত হইলে পাণ্ডুপুত্রগণ তাঁহাদের রাজ্য ফিরিয়া পাইবার দাবী জানাইলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় কুরুগণ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ইহার ফলেই চিরস্মরণীয় কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অন্যান্য মহারথিগণের পরিচালনা সত্ত্বেও কুরুবীরগণ একে একে মহাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া কুরুরাজ্য অধিকার করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ

মহাভারতে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনী ছাড়াও অনেক সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। গল্পের দিক হইতে শকুন্তলা, সাবিত্রী, নলদময়ন্তী প্রভৃতির উপাখ্যান যেমন সুন্দর, পাণ্ডবসখা যদুবীর কৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত গীতার দার্শনিক তত্ত্ব ও ভীষ্মোক্ত রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যাগুলিও তেমনি অপূর্ব্ব ও মনোহর। মধ্যযুগে যে প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্ম ভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, গীতার উপদেশগুলি তাহার প্রধান ভিত্তি।

মহাভারতের উপাখ্যান, কৃষ্ণ ও গীতা

রামায়ণ :—রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা বাল্মীকির নাম চির-

স্মরণীয়। অযোধ্যার রাজা দশরথপুত্র রামচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনেই এই মহাগ্রন্থ রচিত। রাম বিদেহ বা উত্তর বিহারের রাজা জনকের কন্যা সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাজান্তঃপুরের একটি ষড়যন্ত্রের ফলে সব ওলট্-পালট্ হইয়া গেল। যিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতেছিলেন, তাঁহাকেই চৌদ্দ বৎসরের নির্ব্বাসনদণ্ড বরণ করিতে হইল। অভিষেক উৎসব পরিত্যাগ করিয়া কুমার রাম তাঁহার সহধর্ম্মিণী সীতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে লইয়া দণ্ডকারণ্যে চলিয়া গেলেন। সেখানে গোদাবরী তীরে কুটির বাঁধিয়া তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অরণ্যের এই নিভৃত জীবনেও তাঁহাদের শান্তি ছিল না। লঙ্কার (বর্ত্তমান সিংহল) রাজা রাবণ সীতাকে অপহরণ করে। রাম কিষ্কিন্ধ্যার বানর সেনানায়কগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদের সাহায্যে রাবণকে বধ করেন। এই যুদ্ধে রাবণের বংশের প্রায় সকলেই নিহত হয়। তৎপরে রাম সীতাকে উদ্ধার করেন। নির্ব্বাসনের সময় অতিবাহিত হইলে তাঁহারা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ভাই ভরত কর্ত্তৃক সাদরে অভিনন্দিত হন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই সীতার চরিত্র সম্পর্কে প্রজাপুঞ্জের সন্দেহের কথা রাম-চন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তখন প্রজারঞ্জনের জন্য রাম তাঁহার প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নীকে বনবাসে প্রেরণ করেন। পুণ্যবতী সীতা বাল্মীকির তপোবনে আশ্রয় লইলেন। সেখানে কুশ ও লব নামে তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বড় হইলে তাঁহারাই পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহাকাব্যের প্রভাবঃ—রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুদের বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণের অতি প্রিয় এবং পবিত্র গ্রন্থ। এই দুই মহাকাব্যের নায়ক রাম ও কৃষ্ণ, নারায়ণ বা বিষ্ণুর অবতাররূপে

পূজিত। ইঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতবর্ষে এক অপূর্ব্ব ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারতকে কখনও কখনও পঞ্চম বেদ বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল ভাষাতেই মহাকাব্যদ্বয়ের অনুবাদ হইয়াছে। মহাকাব্যের নায়কগণ আদর্শ মানবরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। সীতা ও সাবিত্রী হিন্দু রমণীর আদর্শ-স্থানীয়া। অর্জ্জুন ও ভীমসেনের শৌর্য্য ও পরাক্রম, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি ও আনুগত্য, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা ও কর্ণের মহানুভবতা বিবিধ ঐতিহাসিক লিপিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি পরবর্ত্তীযুগের কবিগণ যে সকল কাব্য রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহার আখ্যানভাগ প্রধানতঃ এই দুই প্রাচীন মহাকাব্য হইতে গৃহীত। মহাকাব্য দুইখানি সেই যুগের বীরত্বের ও সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। সেকালের স্বয়ম্বর বা পতি-নির্ব্বাচন প্রথা একটি স্মরণীয় বিষয়। এই প্রথা অনুসারে রাজকুমারীগণ তাঁহাদের পাণি-প্রার্থী পুরুষগণের মধ্য হইতে ইচ্ছামত স্বামী বাছিয়া লইতেন অথবা বিক্রম প্রদর্শনে কিংবা অস্ত্রযুদ্ধে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিতে পারিতেন, তাঁহারই গলে বরমাল্য প্রদান করিতেন।

ভক্তি-ধর্ম্ম

সীতা ও সাবিত্রী

মহাবীরের ধর্ম্মমত

জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর বলিয়া পৃথক্ কোন শক্তি নাই। প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ যে জিনের মধ্যে দেখা যায় তাঁহাকেই পরম দেবতা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দধামে প্রবেশ করাই মোক্ষ। অঙ্গ, ... মূলসূত্র প্রভৃতি পুস্তক জৈনদের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে অনাস্থা

...বতের যে সুমহান্ ধর্ম্ম একদিন অর্দ্ধেক পৃথিবী
...াছিল, আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী ভক্তি-
প্রতি... করে, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা
হইয়া উঠিল। উপনিষদের ঋষিরা ...ংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার
করিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুমোদিত ...লবস্তুর রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন।
প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ...র উত্তরস্থিত পর্ব্বত-
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিতৃষ্ণা এবং ধর্ম্মসংস্কার প্রচে... খণ্ডে কপিলবস্তু
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইল। পূর্ব্বদি... ানে জন্মগ্রহণ
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব সুস্পষ্ট ... স্তম্ভ এখনও
ক্ষত্রিয়গণই এই আন্দোলনের ... ষই সিদ্ধার্থ
করিলেন। জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম নামে ... ইহাচ

বেদমার্গবিরোধী সম্প্রদায়ের উদ্ভব

বেদবিরোধী সম্প্রদায় এই সময়ে পূর্ব্বভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে, দুইজন ক্ষত্রিয় কুমারই তাহার প্রকৃত প্রবর্ত্তক।

জৈনধর্ম্মের অভ্যুত্থান :—চব্বিশজন তীর্থঙ্কর বা সংসারার্ণবতারক ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষ জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জনের নাম ঋষভ এবং শেষ দুইজনের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। ঐতিহাসিকগণের মতে পার্শ্বই জৈনধর্ম্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তক। ইনি কাশীর একজন রাজপুত্র ছিলেন এবং

তীর্থঙ্কর পার্শ্ব

পূজিত। ইঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতবর্ষে এক অপূর্ব্ব ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারতকে কখনও কখনও পঞ্চম বেদ বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল ভাষাতেই মহাকাব্যদ্বয়ের অনুবাদ হইয়াছে। মহাকাব্যের নায়কগণ আদর্শ মানবরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। সীতা ও সাবিত্রী হিন্দু রমণীর আদর্শ

ভক্তি-ধর্ম্ম

সীতা ও সাবিত্রী

অধিনায়ক ছিলেন।
ও ভীমসেনের শৌ
ভ্রাতৃভক্তি ও আনুগত্য, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা ... যায় না। যৌবনে তিনি
ঐতিহাসিক লিপিতে সমুজ্জ্বল হইয়া ... ন এবং তাঁহার গর্ভে বর্দ্ধমানের
পরবর্ত্তীযুগের কবিগণ যে স ... রের আকর্ষণ তাঁহার ভাল লাগিল না।
হইয়াছেন, তাহার আ ... বৎসর, সেই সময়ে তিনি সংসারের মায়া
হইতে গৃহীত। ম ... দ্বাদশ বৎসর কাল কৃচ্ছ্রসাধন ও ধ্যান ধারণায়
অবস্থার প্রতিচ্ছ ... । ত্রয়োদশ বর্ষে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া 'জিন' বা
স্মরণীয় বিষয়। জৈন ... 'জয়ী' নামে অভিহিত হন। এই সময়
প্রার্থী পুরুষগা ... হইতেই তিনি মহাবীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ
বিক্রম প্রদর্শ ... ন। তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম প্রথমে ছিল 'নিগ্র ... বা বন্ধনমুক্ত। পরবর্ত্তীকালে ইঁহারা জৈন (বা জিনের মতাবলম্বী) নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অবশেষে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৮-২৭ হইতে ৪৬৮ অব্দের মধ্যে একদিন দক্ষিণ বিহারে পাবা নামক ক্ষুদ্র শহরে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

পার্শ্ব জৈনদের জন্য যে চারিটি ব্রত বা নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, মহাবীর তাহার সহিত জিতেন্দ্রিয়তার সঙ্কল্প যোগ করেন। পার্শ্বের অনুগামিগণ পরবর্ত্তীকালে 'শ্বেতাম্বর' সম্প্রদায়ের ন্যায় পোষাক পরিধান করিতেন, কিন্তু মহাবীর জৈনসন্ন্যাসীদিগের "দিগম্বর" বা উলঙ্গ থাকিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন জৈনগণের মতে

জগৎস্রষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর বলিয়া পৃথক্ কোন শক্তি নাই। প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ যে জিনের মধ্যে দেখা যায় তাঁহাকেই পরম দেবতা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দধামে প্রবেশ করাই মোক্ষ। অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূলস্থত্র প্রভৃতি পুস্তক জৈনদের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত।

মহাবীরের ধর্ম্মমত

বৌদ্ধধর্ম্ম ঃ—ভারতের যে সুমহান্ ধর্ম্ম একদিন অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়িয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী ভক্তি-প্রণত চিত্তে যে ধর্ম্মের কথা স্মরণ করে, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ গৌতম কপিলবস্তু নগরের শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন কপিলবস্তুর রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। রাপ্তী নদী ও বস্তী জিলার উত্তরস্থিত পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডে কপিলবস্তু অবস্থিত। সিদ্ধার্থ কপিলবস্তুর নিকটে লুম্বিনির উদ্যানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোক নির্ম্মিত রুম্মিন্‌দেই স্তম্ভ এখনও এই জন্মস্থানের চিহ্ন নির্দ্দেশ করিতেছে। জন্ম সময়েই সিদ্ধার্থ মাতৃহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃস্বসা ও বিমাতা গৌতমীর স্নেহ-যত্নেই তিনি বড় হইয়া উঠেন।

বুদ্ধের জন্ম

ষোল বৎসর বয়সের সময় তাঁহার যশোধরা নাম্নী একটি সুন্দরী রমণীর সহিত বিবাহ হয় এবং রাজপ্রাসাদের ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাঁহার দিন কাটিতে থাকে। কিন্তু রাজপ্রাসাদ হইতে ভ্রমণে বাহির হইবার সময় চারিদিনের চারিটি দৃশ্যে তাঁহার মনে সংসারের সকল ভোগসুখে বিতৃষ্ণা জন্মিল। একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, একজন ব্যাধি-প্রপীড়িত লোক, একটি শবদেহ ও একজন সন্ন্যাসীর দিব্য কান্তি তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। সংসারের অনিত্যতায় যখন তিনি

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, সেই সময় যশোধরা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পুত্রবাৎসল্য আবার তাঁহাকে সংসারের মায়ায় নূতন করিয়া আবদ্ধ করে এই আশঙ্কায় একদিন রাত্রির অন্ধকারে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বাহির হইলেন এবং সমগ্র বিহার প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গয়ার নিকটে উরুবিল্ব নামক স্থানে তিনি কঠোর তপশ্চর্য্যায় রত হইলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে বুঝিলেন কেবল কৃচ্ছ্রসাধনে জ্ঞানের আলোক পাওয়া যায় না। নির্ব্বাণের আলোকে প্রবুদ্ধ হইতে হইলে অন্য সাধনা চাই। তাই নৈরঞ্জনা (বর্ত্তমান লীলাজন) নদীতে স্নান করিয়া বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের মূলে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এইখানে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। জ্ঞানের আলোকে তাঁহার দেহমন প্লাবিত লইল। এই সময়ে তিনি বুদ্ধ বা শাক্যমুনি অর্থাৎ শাক্য বংশের ঋষি বলিয়া পরিচিত হইলেন। কাশীর অদূরবর্ত্তী সারনাথে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর জীবনের কাজ সাঙ্গ হইলে গোরখপুর জিলার কুশীনগর বা বর্ত্তমান কসিয়া নামক স্থানে আশী বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সিংহলের কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৪-৪৩ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৬ বা ৪৮৩ অব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

গৃহত্যাগ

সিদ্ধিলাভ

পরিনির্ব্বাণ

বুদ্ধের উপদেশ :—বুদ্ধ কোন বিষয়েই আতিশয্য পছন্দ করিতেন না। কেবল পার্থিবসুখে অথবা কেবলমাত্র কঠোর তপস্যায় জীবন

যাপন না করিয়া মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি শিষ্যগণকে এই আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিতেন; এবং ইহাই নির্ব্বাণ-লাভের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। ইহাকেই 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা

মধ্যপন্থা



বুদ্ধদেব

হইত। সম্যগ্‌দৃষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকর্ম্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎজীবন, সৎব্যায়াম বা চেষ্টা, সৎস্মৃতি ও সম্যক্‌সমাধি বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ লাভের উপায়রূপে

গৃহীত হইয়াছিল। সকল বস্তুরই লয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব প্রত্যেকেরই নির্ব্বাণ লাভের জন্য উদ্যম ও "অপ্রমাদ" অত্যাবশ্যক, ইহাই ভগবান্ বুদ্ধের শেষ বাণী।

বৌদ্ধসঙ্গীতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ :—বুদ্ধদেব ধর্ম্মসম্পর্কে নিজহস্তে কিছুই লিখিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধসঙ্গীতি বা সম্মেলনে এই সকল উপদেশ আবৃত্তি করা হইত। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে এইরূপ অন্ততঃ চারিটি মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজগৃহের অধিবেশনই সর্ব্বপ্রথম। প্রথম সভার অন্ততঃ এক শত বৎসর পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হয়। অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় সভা আহূত হইয়াছিল। চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছিল সম্ভবতঃ খৃষ্ট-জন্মের প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্ব-কালে।

ত্রিপিটক

বৌদ্ধগণের ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটক (তিনটি পেটিকা) নামে অভিহিত। এই ত্রিপিটকের প্রথম ভাগ "সূত্র" বা বুদ্ধের বাক্য ও কার্য্যাবলী। দ্বিতীয় পেটিকার নাম "বিনয়"—বৌদ্ধ ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ও অনুশাসন। তৃতীয় পেটিকা "অভিধর্ম্ম" বলিয়া খ্যাত। ইহাতে বিভিন্ন দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা আছে।

হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য :—হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে কোন কোন বিষয়ে যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়। হিন্দুধর্ম্মের নিবৃত্তি, কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ জৈন ও বৌদ্ধগণও বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু অনেক বিষয়ে ইঁহারা হিন্দুমত গ্রহণ করেন নাই। জৈন ও বৌদ্ধগণ বেদের বিধানে বিশ্বাস করিতেন না।

কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ

আত্মা এক, অদ্বিতীয় ও সর্ব্বব্যাপী—এই বৈদান্তিক মতবাদেও তাঁহাদের আস্থা ছিল না। পশুবলিকে তাঁহারা ঘৃণা

করিতেন এবং সকলেই অহিংসা ও সর্ব্বজীবের প্রতি করুণা এবং মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে যদিও জীবহিংসার বিধান আছে, তথাপি অহিংসায় বিশ্বাসী লোকেরও অভাব নাই। বেদপুরাণ-মার্গাবলম্বী হিন্দু ও তদ্‌বিরোধী বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যসীমায় জৈনগণের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আবার বৌদ্ধদের সঙ্গেও তাঁহাদের অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মকার্য্যে ব্রাহ্মণ-নিয়োগ প্রথা জৈনদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। হিন্দুদের প্রধান দেবতাগণকে তাঁহারা মানিয়া চলেন এবং পূজাও করিয়া থাকেন। এই সকল দেবতাকে অবশ্য তাঁহারা নিজেদের তীর্থঙ্করগণের ন্যায় অর্চ্চনীয় মনে করেন না। পক্ষান্তরে বৌদ্ধগণের মত তাঁহারাও পরব্রহ্মে বিশ্বাস করেন না ও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। মহাপুরুষদিগকে দেবতা জ্ঞানে পূজা উভয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত। বৌদ্ধগণের ন্যায় জৈনেরাও জীবজন্তুর প্রতি বিশেষ করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু জৈনগণ বৌদ্ধগণ অপেক্ষা অধিক কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী। তাঁহারা মনে করেন, প্রাকৃতিক সকল জিনিষেরই প্রাণ আছে, কঠোর তপস্যা পুণ্যার্জ্জনের উপায়, এবং 'দিগম্বর' বা নগ্ন হওয়া সাধুতার অঙ্গ। অহিংসাকে তাঁহারা এমন প্রাধান্য দিতে লাগিলেন যে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিও তাঁহাদের নিকট অতিশয় আদর পাইতে লাগিল। জৈনদের পিঞ্জরাপোলে সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু আশ্রয় ও আহার্য্য পাইয়া থাকে।

অহিংসা

ভারতে জৈনধর্ম্মের স্থায়িত্বের কারণ:—কালক্রমে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু জৈনধর্ম্ম এখনও ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে পরিগণিত। ইহার

অনেকগুলি কারণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের সহিত জৈনমতের সাদৃশ্য অনেক বেশি। এই কারণে জৈনদিগকে প্রতিকূলতার আঘাত কম সহ্য করিতে হইয়াছে। ইঁহারা সমগ্র ভারতে ধর্ম্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে কখনও কোন প্রবল সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হন নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির কারণঃ—মৌর্য্যবংশের পতন ও শুঙ্গ-বংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশসমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজ-প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইল। পূর্ব্বে বৌদ্ধ রাজগণের প্রভাবে এই ধর্ম্মের প্রতাপ ও প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের পতনের সহিত ধর্ম্মের প্রসার হ্রাস পাওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কুষাণ সম্রাট্-গণের কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সরল ও সহজ নৈতিক অনুশাসন-গুলির পরিবর্ত্তে বুদ্ধদেবের পূজা ও বুদ্ধভক্তি তাঁহাদের সময়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ও হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিলন

তখন আর হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কোন পার্থক্য রহিল না। দেবজ্ঞানে মানুষকে ভক্তি ও পূজা করিবার পদ্ধতি বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত হইল। ব্রাহ্মণদের দেবতার মত বুদ্ধমূর্ত্তিরও পূজা হইতে লাগিল। বুদ্ধদেব সাধারণ লোকের বোধগম্য ভাষায় ধর্ম্মপ্রচারের ও উপদেশ দানের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচারকগণ তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ-সমাদৃত সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বয়ং বুদ্ধ হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গৃহীত হইলেন। তাহার পরে আবার দেশের মধ্যে যখন তান্ত্রিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করিল, তখন তাহার প্রভাবে শাক্যমুনি প্রবর্ত্তিত পবিত্র ধর্ম্মের আদিম বিশুদ্ধতা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। গুপ্ত-সম্রাট্গণের ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী কয়েকটি রাজবংশের প্রসাদে ও

আনুকূল্যে, তমিল সাধুগণের শিব-বিষ্ণু-ভক্তি কীর্ত্তনের ফলে এবং কুমারিল ও শঙ্করের মত ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল। অবশেষে দক্ষিণ ভারতের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ও লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে ও সর্ব্বশেষে উত্তর ভারতে 'মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু'দিগের প্রতি নবাগত মুসলমান নায়কগণের আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ রশ্মিটুকুও অন্ধকারে বিলুপ্ত হইল।

নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান

পঞ্চম অধ্যায়

গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান

ষোড়শ রাজ্য বা মহাজনপদ :—খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অথবা তাহার প্রাক্কালে হিন্দুকুশ ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী সুবিশাল ভূখণ্ডে ষোলটি বিরাট্ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। ইহা ব্যতীত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও ছিল। এই সকল রাষ্ট্রের কয়েকটিতে গণতন্ত্র এবং অপর-গুলিতে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল।

গণতন্ত্র :—উত্তর বিহারে বৃজি-লিচ্ছবির যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র প্রথায় শাসিত হইত। প্রাচীন ভারতের যে সকল জনপদে একচ্ছত্র নৃপতি ছিল না, এবং শাসনভার জন-নায়কগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহাদিগকে 'সংঘ' বা 'গণ' বলা হইত। গণতন্ত্রের শাসন কার্য্য 'সংস্থাগারে' 'পরিষদ্' কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইত। পরিষদ্ জনসভারই নামান্তর। যে স্থানে সভা হইত তাহার নাম ছিল সংস্থাগার। দেশের প্রবীণগণ শাসন কার্য্য

পরিষদ্

চালাইতেন, তাঁহাদিগকে 'গণজ্যেষ্ঠ', 'সংঘমুখ্য' এবং কখনও কখনও রাজা বলা হইত।

এক-নৃপ-শাসিত পরাক্রান্ত রাজ্যসমূহ:—গণ ও সংঘগুলি ক্রমশঃ পার্শ্ববর্ত্তী পরাক্রান্ত রাজগণের করতলগত হইল। বৈদিক যুগের শেষভাগেই রাজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনা নরপতিগণের মনে উদিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চারিটি শক্তিশালী রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। এই রাজ্যগুলির নাম অবন্তি, বৎস, কোশল এবং মগধ। অবন্তি বা মালব প্রদেশে উজ্জয়িনী নগরে রাজা প্রদ্যোত শাসন করিতেন। বৎসের রাজা ছিলেন উদয়ন। এই দেশটি এলাহাবাদের সন্নিকটে কৌশাম্বী বা কোসমের চারিদিকে অবস্থিত। কোশল বা অযোধ্যার অধীশ্বর ছিলেন প্রসেনজিত এবং মগধ বা দক্ষিণ বিহার বিম্বিসার কর্তৃক শাসিত হইত। ইহাদের মধ্যে প্রথমে কোশল দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে। কোশলের রাজগণ আপনাদিগকে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। অযোধ্যায় তাঁহাদের রাজধানী ছিল, পরে উহা শ্রাবস্তীতে স্থানান্তরিত হয়। ইহাদের অধীনে কোশলের সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কাশী রাজ্য অধিকার করিয়া কোশলরাজগণ নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত কপিলবস্তুর শাক্যজনপদ পর্য্যন্ত আপন অধিকারে আনয়ন করেন। কিন্তু শীঘ্রই মগধের অভ্যুত্থানে কোশলের প্রাধান্য বিনষ্ট হইল।

কোশলের অভ্যুত্থান

মগধের অভ্যুত্থান:—একদিকে শোণ ও গঙ্গানদী, অপরদিকে ছোটনাগপুরের পর্ব্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত হইয়া মগধরাজ্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনে সুরক্ষিত ছিল। ইহার রাজধানী 'গিরিব্রজ' বা প্রাচীন রাজগৃহ চারিদিকে পর্ব্বত প্রাকারে একরূপ দুর্ভেদ্য ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশাল হর্য্যঙ্ককুলের মুকুটমণি বিম্বিসার মগধের

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নব রাজগৃহে (আধুনিক রাজগির) মগধের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অঙ্গ বা পূর্ব্ববিহার জয় করেন। তৎপরে কোশলরাজ প্রসেনজিতের এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়া কাশীরাজ্যেরও এক অংশ অধিকার করেন। বৃদ্ধকালে রাজা বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হইলেন। দুঃখে, শোকে অভিভূত হইয়া তাঁহার বিধবা পত্নী কোশলরাজকন্যাও দেহত্যাগ করিলেন। ইহাতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃহন্তা অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু এই সংগ্রামে তিনি জয়ী হইলেন না। অবশেষে সন্ধি স্থাপনের সঙ্গে কাশীরাজ্য স্থায়ীভাবে অজাতশত্রুর অধিকারে আসিল। এইখানেই মগধের রাজ্য-বিস্তার ক্ষান্ত হয় নাই। কালক্রমে উত্তর বিহারের শক্তিশালী বৃজি (বৈশালী) রাষ্ট্রও মগধের অধিকৃত হইল। বৃজি-বিজয় মগধরাজের একটি স্মরণীয় কীর্ত্তি।

বিম্বিসার

অজাতশত্রু

বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালেই মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ মগধে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মগধ রাজ্যের সীমা এই সময়ে ছোটনাগপুর হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল রাজ্য সুশাসনের জন্য রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে একটি রাজধানী স্থাপন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল। সুতরাং অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ী শোণ ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার পিতা পূর্ব্বেই এইখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন

নন্দ সাম্রাজ্য :—উদয়ীর পরে মগধের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু মগধরাজগণ তাঁহার পরেও যে

ক্রমাগত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং একদিন কোশল, বৎস ও অবন্তি প্রমুখ গঙ্গা, যমুনা ও চম্বল উপত্যকার শক্তিশালী দেশ সমূহের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হর্য্যঙ্ককুলের * পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয় শৈশুনাগবংশ শূদ্রবংশোদ্ভব নন্দগণের নিকট পরাভূত হইল। এই শূদ্রগণ 'নব নন্দ' নামে পরিচিত।

মহাপদ্ম

নন্দবংশীয় প্রথম রাজার নাম মহাপদ্ম উগ্রসেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। পুরাণে তাঁহাকে 'একরাট্' বা একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মহাপদ্ম উগ্রসেন চতুঃপার্শ্বস্থিত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিয়া সমগ্র গঙ্গাধৌত উপত্যকা এবং সম্ভবতঃ কলিঙ্গ রাজ্যও আপন অধিকারে আনিয়া 'একচ্ছত্র' রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পরে এই বংশের আটজন রাজা একে একে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের শেষ রাজার নাম ধননন্দ অর্থাৎ ধনশালী নন্দ। ইঁহার বিপুল সেনাবাহিনীতে বিশ সহস্র অশ্ব, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই সহস্র রথ এবং তিন বা চারি সহস্র হস্তী ছিল।

ধননন্দ

দারায়ুস ও আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ :—সেকালে সিন্ধু নদীর তীরদেশে মগধের মত কোন পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। বিম্বিসার যখন মগধের রাজা তখন সম্রাট্ কুরুস্ পারস্য দেশে এক প্রবল রাজ্য স্থাপন করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২২ হইতে ৪৮৬ অব্দের মধ্যে সম্রাট্ দারায়ুসের নেতৃত্বে এই রাজ্যের পরিসর বিশেষ

দারায়ুস

* পুরাণে হর্য্যঙ্ককুলের নৃপগণকেও শৈশুনাগবংশীয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধ-সাহিত্যে এই দুই বংশ পৃথক্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি সিন্ধু উপত্যকা অধিকার করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩০ অব্দে ম্যাসিডনের রাজা মহাবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য দেশ জয় করিয়া বিপুল বিক্রমে ভারতবর্ষ বিজয়ে অগ্রসর হন। ভারতের সীমান্ত প্রদেশ তখন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উত্তর পঞ্জাবে সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অম্ভি রাজা রাজত্ব করিতেন। ঝিলাম বা বিতস্তা নদীকে গ্রীকগণ হিদাস্পিস্ বলিতেন।

আলেকজাণ্ডারের অভিযান

আটক ও রাওয়ালপিণ্ডির অনতিদূরে হাসান আব্দালের সন্নিকটে তক্ষশিলায় অম্ভির রাজধানী ছিল। ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যস্থলে পূরুর রাজ্য। চিনাবের পূর্ব্বদিকে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশ এবং ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি গণতন্ত্রশাসিত স্বাধীন জাতির বাসস্থান ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কাবুল নদীর উত্তরদিকে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতিসমূহকে পরাভূত করেন। তৎপরে সিন্ধু পার হইয়া তক্ষশিলায় পৌছিলে অম্ভিরাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষায় তিনি আরও সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে তিনি পূরুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পূরুরাজ অতুল বিক্রমের সহিত আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ করার চেষ্টা করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। কিন্তু পূরুরাজ পরাজিত হইয়া ম্যাসিডন-অধিপতির নিকট বন্দী হইলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহার শৌর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার নিকট কিরূপ ব্যবহার আশা কর?" পূরুরাজ কহিলেন, "রাজার মত।" ম্যাসিডনরাজ এই

তক্ষশিলা

পূরু

হিদাস্পিসের যুদ্ধ

উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া পূরুকে মুক্তি দিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার রাজ্যও প্রত্যর্পণ করিলেন।

ইহার পরে আলেকজাণ্ডার হিফাসিস বা বিপাশা নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজ্যগুলিও জয় করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁহার রণশ্রান্ত সৈন্যদল আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিপাশার তীর হইতে ফিরিয়া যাইতে হইল। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ এক বিরাট্ নৌ-বহর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে একদল সৈন্য তুলিয়া দিলেন। অবশিষ্ট সেনাবাহিনী ঝিলাম নদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ফিরিবার পথে পঞ্চনদের দক্ষিণে মালবদিগের সহিত গ্রীকদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার নিজেই আহত হইয়া পড়েন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ম্যাসিডনরাজই জয়লাভ করিলেন এবং তাঁহার আদেশে মালব রাজ্য বিধ্বস্ত করা হইল। অবশেষে আলেকজাণ্ডার বালুচিস্থানের মরুপথে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া তিনি ব্যাবিলনে পৌঁছিয়াছিলেন। সেখানে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তন

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল :—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। তাঁহার অভিযানের ফলে এদেশ হইতে ইউরোপ গমনাগমনের নূতন পথ আবিষ্কৃত হয় এবং বাণিজ্যের পন্থাও নিরাপদ এবং সুগম হইয়া উঠে। সিন্ধু উপত্যকার দুর্দ্ধর্ষ উপজাতি ও রাজাদিগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া তিনি পরোক্ষ ভাবে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়া

প্রত্যক্ষ ফল

দিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডার যে সকল নগর ও সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, মৌর্য্যরাজগণ তাহা একেবারে বিনষ্ট করেন নাই। অশোকের রাজ্যে যবন বা গ্রীকগণের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং একজন যবন রাজাকে তিনি সুরাষ্ট্র বা কাথিওয়াড় প্রদেশে শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় হিন্দুগণ যবনসম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাঁহার অভিযানের প্রভাবে যে উত্তরকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মধ্য এশিয়ার বাহ্লীক দেশ হইতে আগত যবনদিগের আধিপত্য স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল

পরোক্ষ ফল

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাহ্লীকযবন বিজয়ের ফলেই ভারতের সহিত ইউরোপের ভাব-বিনিময় সহজ হইয়া উঠে। মিনাণ্ডার ও হেলিওডোরসের মত যবনরাজা ও রাজপুরুষগণও ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণের উপদেশাবলী শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেন। আবার ভারতীয় শিল্প, প্রতিমারচন, জ্যোতিষশাস্ত্র ও মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌর্য্য সাম্রাজ্য

যবনাতঙ্ক :—আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে গ্রীকগণের ভারত জয়ের চেষ্টার শেষ হয় নাই। হিন্দুগণ গ্রীকদিগকে যবন বলিতেন। আলেকজাণ্ডার ফিরিয়া যাইবার পরেও দুইশত বৎসরের অধিককাল এই গ্রীক বা যবনগণ ভারতবাসীর নিকট একটা উপদ্রব হইয়া রহিল। পুনঃপুনঃ যবন আক্রমণ সত্বেও যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য্যই তাহার প্রধান কারণ। সংস্কৃত নাট্য-কাব্য 'মুদ্রারাক্ষস' রচয়িতা বিশাখদত্ত এই হিন্দু নরপতির বীরত্ব-কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে পৃথিবী ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে চন্দ্রগুপ্তের ভুজযুগ আশ্রয় করিয়াই রক্ষা পাইয়াছিলেন।

গ্রীক উপদ্রব ও মৌর্য্যবংশের অভ্যুত্থান

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য :—চন্দ্রগুপ্তের পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম মৌর্য্যবংশ। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার মায়ের বা পিতামহীর নাম ছিল মুরা। অনেকের মতে এই নাম হইতে মৌর্য্য নামের উৎপত্তি। তাঁহারা বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেরই শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে মৌর্য্যদিগকে একটি স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয় বংশ বলা হইয়াছে। বুদ্ধের সময় ইঁহারা পিপ্পলীবন নামক রাষ্ট্রের অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

মৌর্য্যবংশের আদিকথা

মগধে নন্দগণ যখন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল তখন চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার একজন ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন।

নন্দবংশের পতন

তিনি আলেকজাণ্ডারের সুদক্ষ সেনাপতিগণকে পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করিয়াছিলেন।

গ্রীকগণকে বিতাড়ন

আলেকজাণ্ডারের সুবিখ্যাত সেনাপতি সেলিউকস পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশ লইয়া একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনিও পঞ্জাব জয়ের আশায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইল। কেবল সন্ধি প্রার্থনা করিয়া তিনি অব্যাহতি পাইলেন না, বর্ত্তমান আফগানিস্থান ও বালুচিস্থানের বৃহত্তর অংশ ব্যাপী চারিটি প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সখ্যস্থাপন করিতে হইল। দুই রাজবংশের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস্ নামে এক গ্রীক দূত প্রেরণ করিলেন।

সেলিউকসের সহিত সন্ধি

নন্দগণকে পরাভূত ও গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত গঙ্গা ও সিন্ধুবিধৌত সমগ্র ভূখণ্ডের অবিসংবাদী অধীশ্বর হইলেন। সুদূর সুরাষ্ট্র দেশও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। কথিত আছে, তিনি দক্ষিণে মহিশুর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার

মেগাস্থিনিস্ ঃ—গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ একজন বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। বহুকাল মৌর্য্য-দরবারে থাকিয়া তিনি তাৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথা

লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে এদেশের লোকেরা নিম্নলিখিত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ), (২) কৃষক, (৩) পশুপালক ও শিকারী, (৪) শিল্পী ও ব্যবসায়ী, (৫) যোদ্ধা, (৬) পরিদর্শক বা প্রতিবেদক এবং (৭) অমাত্য।

সামাজিক বিভাগ

ভারতবাসিগণ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত; সেকালে চৌর্য্য ও প্রবঞ্চনা বিরল ছিল; যজ্ঞের সময় ব্যতীত কেহ কখনও মদ্য পান করিত না। তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করিত, সুতরাং কদাচিৎ মামলা মোকদ্দমা হইত। কেহ মিথ্যা কথা বলিত না, অন্যায় করা অথবা অন্যায় সহ্য করা উভয়ই পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজ্যের কোনও কোনও অংশে দাসত্ব প্রথা অজ্ঞাত ছিল। কৃষকগণকে লোকে পরোপকারী জ্ঞানে সম্মান করিত এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিত। শস্যক্ষেত্রে শত্রুরাও যুদ্ধবিগ্রহাদি করিত না। সুতরাং প্রাচুর্য্য সম্ভারে সেকালের লোক সুখে শান্তিতে জীবন কাটাইত।

লোকচরিত্র

রাজধানী পাটলিপুত্র গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। এই বিরাট্ নগরী দৈর্ঘ্যে নয় মাইল ও প্রস্থে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত ছিল। চারিদিকে গভীর পরিখা ও অত্যুচ্চ প্রাচীর থাকায় শত্রুগণ সহজে নগর আক্রমণ করিতে পারিত না। প্রাচীরে ৫৭০টি উচ্চ স্তম্ভ ও ৬৪টি তোরণ ছিল। রাজপ্রাসাদ প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেও শোভায় ও সম্পদে ইহা পারস্যের রাজপ্রাসাদকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

রাজধানী

রাজধানীর কার্য্য সুনিয়মে পরিচালন করার ভার একটি সভার উপর অর্পিত ছিল। এই সভায় ত্রিশ জন সদস্য ছিল। তাঁহারা আবার ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া রাজধানীর নানা কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও রাজস্ব আদায়

করিতেন। প্রত্যেক বিভাগে পাঁচ জন সভ্য থাকিতেন। পঞ্চসভ্য গঠিত এই ক্ষুদ্র কার্য্যনির্ব্বাহক সংসদ্‌গুলি পরবর্ত্তীকালের "পঞ্চায়তে"র সহিত তুলনীয়। ইঁহারা কারুশিল্প পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, বৈদেশিকগণের যত্ন লইতেন, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখিতেন। ব্যবসা বাণিজ্য ইঁহাদের নির্দ্দেশে পরিচালিত হইত। দ্রব্যাদি রাজমুদ্রাঙ্কিত করিয়া ইঁহারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেন এবং বিক্রীত দ্রব্যের এক-দশমাংশ মূল্য রাজকররূপে আদায় করিতেন।

নগরসভা

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসনেও শৃঙ্খলার অভাব ছিল না। এই কার্য্যের ভার পৃথক্ এক শ্রেণীর রাজপুরুষের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা জমি জরিপ, জল সেচন, রাজস্ব আদায় ও জনহিতকর কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহারা রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেন ও স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বিভিন্ন স্থানের পথ ও দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। তখনকার দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। কোন কোন অপরাধে অঙ্গচ্ছেদের বিধান ছিল। দেশের কোথায় কি ঘটিতেছে এবং রাজা ও রাজকর্ম্মচারীদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে প্রজাদিগের অভিমত জানিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইত। তাহারা গোপনে দেশের গুপ্তসংবাদ রাজার নিকট জানাইত। এইরূপে সর্ব্বত্র শাসন ও শৃঙ্খলা-কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইত।

রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা

কঠোর আইন

গুপ্তচর

মৌর্য্যরাজের অপ্রতিহত প্রভুত্বের আর একটি কারণ তাঁহার বিশাল সৈন্য-বাহিনী। এই সেনাদলে ছয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার হস্তী ও বহুসংখ্যক রথ ছিল। জলপথে রাজ্যরক্ষার জন্য একজন

মৌর্য্য সেনা

নাবধ্যক্ষের অর্থাৎ নৌ-সেনাপতির অধীনে বহু রণতরী লইয়া একটি বিরাট নৌবহর থাকিত। রাজধানীর মত সেনাদল ও নৌ-বাহিনী পরিচালনের ভারও ত্রিশজন দ্বারা গঠিত একটি সভার হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই পরিচালক সমিতিও পাঁচ পাঁচ জন সদস্য লইয়া গঠিত ছয়টি ক্ষুদ্র সভায় বিভক্ত ছিল। উহাদের একটি সভা নৌ-সেনাপতির সাহায্য করিত। আর একটি রসদ ও যান-বাহনের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিত। অপর বিভাগগুলি পদাতিক, অশ্বারোহী সৈন্য, যুদ্ধরথ, এবং গজারোহী সেনাদলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল।

সমরসভা

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রঃ—মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে যেমন মৌর্য্য শাসন প্রণালীর অনেক বিষয় জানিতে পারা যায় তেমনি আর একখানি গ্রন্থেও এই সময়কার বা অল্পকালপরবর্ত্তী রাজ্য-শাসন পদ্ধতির বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের নাম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্য বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই পুস্তকখানি তাঁহার রচনা কিনা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু মৌর্য্য রাজত্বকালে না হইলেও এই বইখানি যে খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক রাজদূতের ন্যায় অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থকারও সুনিয়ন্ত্রিত শাসন-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তকে বর্ণিত আছে যে রাজা "মহামাত্র" এবং "অমাত্য" উপাধিধারী রাজপুরুষগণের সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। মেগাস্থিনিস্‌ও এই অমাত্যগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মন্ত্রি-পরিষদ্ নামে রাজার একটি পরামর্শসভা ছিল, জরুরী প্রয়োজনে তিনি সেই সভা আহ্বান করিতেন। অর্থশাস্ত্রে নগর ও সমর-বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত "নগরাধ্যক্ষ" ও "বলাধ্যক্ষ" নামক

মহামাত্র

মন্ত্রি-পরিষদ্

রাজপুরুষগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য শাসনের বিভাগ ও উপবিভাগের কথাও কৌটিল্যের গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। প্রজাসাধারণ ও রাজকর্ম্মচারীদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিস্তৃত ভাবে গুপ্তচর প্রথার প্রচলন ছিল। রাজার একদল নারী প্রহরী থাকিত। অর্থশাস্ত্রকারের মত এই যে রাজা আপনাকে সাধারণের বেতনভোগী ভৃত্য বলিয়া মনে করিবেন এবং প্রজার সুখ-শান্তি ও সন্তোষ বিধানই তাঁহার আপন কল্যাণ মনে করিয়া রাজ্য-শাসনে আত্মনিয়োগ করিবেন।

অধ্যক্ষগণ ও জনপদ বিভাগ

গুপ্তচর ও স্ত্রীপ্রহরী

প্রজার কল্যাণে আত্মনিয়োগ

বিন্দুসারঃ—চব্বিশ বৎসর রাজ্য-শাসনের পরে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র "বিন্দুসার" তাঁহার পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার উপাধি ছিল "অমিত্রঘাত" বা শত্রুহন্তা। বিন্দুসার পিতৃ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তিনি দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। গ্রীক রাজগণের সহিত তিনি মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। সিরিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার রাজা (সম্ভবতঃ ইনি সেলিউকসের পুত্র) তাঁহার দরবারে একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর একজন দূত আসিয়াছিলেন মিশরের রাজার দরবার হইতে। বিন্দুসার অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী রাজার সভায় তিনি কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহ দমন

গ্রীকগণের সহিত মিত্রতা

অশোক ও তাঁহার রাজ্যাভিষেকঃ—২৭৩ বা ২৭২ হইতে ২৩২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বিন্দুসার-পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহের শৌর্য্য-বীর্য্য ও বিচক্ষণতার

ফলে গ্রীক আক্রমণের ভয় তখনকার মত অপনীত হইয়াছিল। ভারতবাসিগণ এই সুযোগের অপব্যবহার করেন নাই। বিন্দুসারের পুত্র অশোক প্রিয়দর্শী এই সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষে নবীন আদর্শে নূতন রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। পঁচিশ অথবা আঠাশ বৎসর কাল রাজত্বের পরে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়। কথিত আছে, বিন্দুসারের সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই সংগ্রামে অন্যান্য ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া অশোক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি সত্য কিনা বলা যায় না। তবে অশোকের রাজ্যাভিষেকে যে প্রায় চারি বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজ্যাভিষেকে বিলম্ব

অশোকের বিজয় অভিযানঃ—রাজত্বের প্রারম্ভে অশোকের সাম্রাজ্য-বিস্তারের স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পরে তিনি উড়িষ্যার বৈতরণী নদী হইতে গোদাবরীর সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রবল পরাক্রমশালী কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। কিন্তু এই ভীষণ সংগ্রামে অগণিত লোকক্ষয় ও রক্তপাতের শোচনীয় দৃশ্যে তিনি অভিভূত হইলেন। দুঃখে, শোকে, নিদারুণ অনুতাপে, মানুষের জন্য সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না। রাজ্য জয় করিতে হইলে অহিংসা বা "ধর্ম্ম-বিজয়" দ্বারা করিতে হইবে। ধনুর্ব্বাণ দ্বারা নয়। এই আদর্শ তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি সশস্ত্র সৈনিক দ্বারা রাজ্য জয়ের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-প্রচারক দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চোল,

কলিঙ্গ বিজয়

ধর্ম্ম-বিজয়

পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি দেশে * অহিংসার বাণী প্রচারের জন্য প্রচারক প্রেরিত হইল। সিরিয়ার আন্টিয়োকস্ থিয়স্, মিশরের টলেমি ফিলাডেল্ফস্ প্রভৃতি যবন নৃপতিগণের নিকট রাজা অশোক দূত প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা জাতিনির্ব্বিশেষে অভয়দান এবং সংযম ও জীবনির্ব্বিশেষে সেবাধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন।

অশোকের সময়কালীন তমিল রাজগণ

অশোকের সমসাময়িক যবন রাজগণ

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন ও প্রচারঃ—কলিঙ্গ যুদ্ধের পরেই রাজা অশোকের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল। তখন বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। প্রথমে তিনি একজন সাধারণ উপাসকের ন্যায় থাকিতেন, কিন্তু কিছুকাল পরে 'সংঘ' বা বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য দূরদূরান্তে লোক প্রেরিত হইতে লাগিল। কেবল ভারতবর্ষে নহে, পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস্, মিশর, সিংহল প্রভৃতি স্থানেও প্রচারক প্রেরিত হইল। স্বীয় পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্রকে তিনি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারের ভার রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি অর্পিত হইল এবং এই কার্য্যের জন্য 'ধর্ম্মমহামাত্র' নামে একদল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা দেশে দেশে, নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়া উপদেশ বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত ও স্তম্ভগাত্রে

প্রচার

* চোল—ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর ; পাণ্ড্য—মদুরা ও তিন্নেভেলি ; সত্যপুত্র—উত্তর মালবার ; কেরলপুত্র—দক্ষিণ মালবার ও উত্তর ত্রিবাঙ্কুর ; তাম্রপর্ণী—সিংহল।

উৎকীর্ণ ধর্ম্ম-লিপির সাহায্যে এবং লোকচিত্তাকর্ষক অন্যান্য প্রণালীতে অশোকের বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সকল ধর্ম্ম-লিপি দেশের সকলকে পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে উদ্বুদ্ধ করিত। যাহাতে মানুষ মানুষের প্রতি সদয় ব্যবহার করে, জীবজন্তুর প্রতি কেহ কখনও নির্দ্দয় না হয় তজ্জন্য উপদেশ লেখা থাকিত। সত্যবাদিতা, সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্যান্য গুণের অনুশীলন করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করা হইত।

ধর্ম্মলিপি

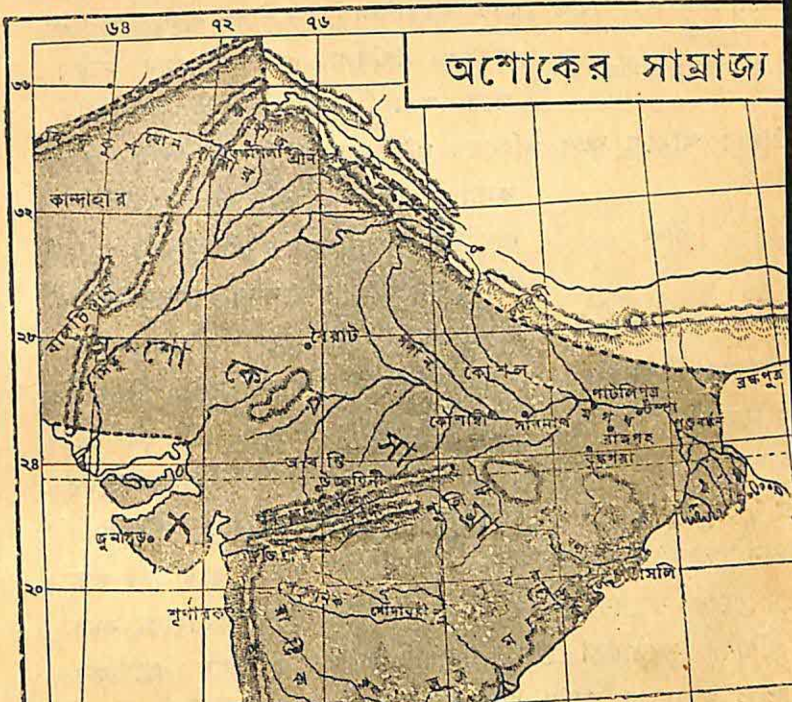
সম্রাট্ স্বয়ং "বিহার-যাত্রা"র আমোদ প্রমোদ বন্ধ করিয়া মৈত্রী ও অহিংসার বাণী প্রচারে বহির্গত হইলেন। তিনি একে একে বৌদ্ধ তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিলেন। কথিত আছে যে তিনি পাটলি-পুত্রে এক ধর্ম্মসভা আহ্বান করিয়া ভগবান্ বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম্মমত নিরূপণ ও সংঘভেদ অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের দলাদলি নিবারণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অশোক নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কদাপি অপর ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করেন নাই। ব্রাহ্মণ, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিত। ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ব্যতীত অন্যদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের লোকই যাহাতে সুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারে তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

ধর্ম্মযাত্রা

পাটলিপুত্রে বৌদ্ধসভা

অশোকের উদারতা

অশোকের রাজধর্ম্ম পালন :—কলিঙ্গ বিজয়ের পর মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সীমানা উত্তরে হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে মহিষূর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে গুজরাট ও সুরাষ্ট্র



DRAWN BY M.K. NATH

কাথিওয়াড়) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অশোক রাজ্য শাসনে কখনও শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। তবে পিতা পিতামহের কঠোর শাসননীতি তাঁহার আমলে বহুল পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রজার কল্যাণ সাধনের জন্য অনেক সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। প্রজাদিগকে তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের সময় হইতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে রাজকুমারগণ 'মহামাত্র' উপাধিধারী রাজপুরুষদিগের সাহায্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ইহাতে কোথাও প্রজার প্রতি অবিচার হয় এই আশঙ্কায় তিনি রাজধানী হইতে শান্ত, সংযত এবং মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিশেষ এক শ্রেণীর মহামাত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি 'রাজুক' নামক একদল কর্ম্মচারীকে সুদক্ষ ধাত্রীর ন্যায় স্নেহ-যত্নে প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছিল এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত জীবহত্যা অথবা কোনও প্রাণীর অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইল। দরিদ্রগণ নিয়মিতভাবে ভিক্ষা পাইত এবং মানুষ ও ইতর জীবজন্তুর জন্য চিকিৎসালয়ের বন্দোবস্ত হইল। রাস্তার দুইপার্শ্বে আতপ-নিবারক ছায়া-বহুল বৃক্ষশ্রেণী ও মাঝে মাঝে পানীয় জলের কূপ ক্লান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করিত। প্রজারঞ্জক রাজা অশোকের আদেশেই এইরূপ সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের সীমা

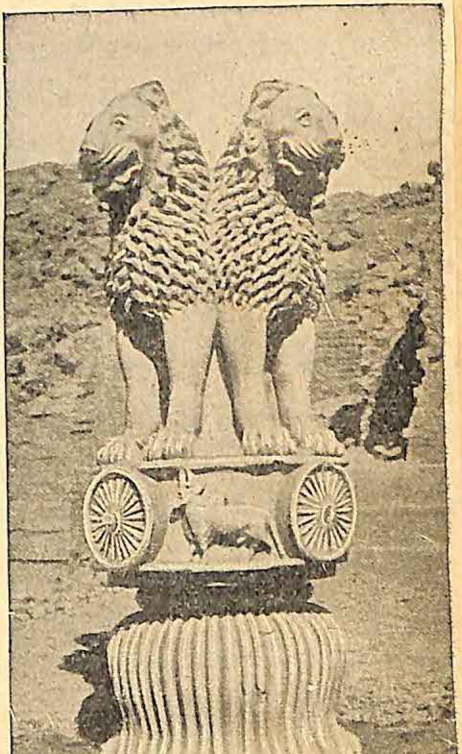
শাসন

রাস্তা ও ভৈষজ্যাগার (হাসপাতাল)

অশোকের সময়ে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্প :—ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্পের উন্নতিবিধানেও অশোক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহের কাষ্ঠনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদের পরিবর্ত্তে তিনি

প্রস্তরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পাটনার নিকটবর্ত্তী কুম্রাহর ও অন্যান্য স্থানে এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি অনেকগুলি স্তূপ, শিলাস্তম্ভ ও গুহানিবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অশোকের শিলাস্তম্ভগুলি এত সুন্দর ও মসৃণ এবং স্তম্ভচূড়ার সিংহাদি পশুর প্রতিকৃতিগুলি এমন জীবন্ত যে সেই প্রাচীন যুগের শিল্পোৎকর্ষ দেখিয়া আজিও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

অশোকের রাজপ্রাসাদ—স্তূপ, স্তম্ভ



সারনাথ স্তম্ভশীর্ষে সিংহমূর্ত্তি

অশোকের কার্য্য পর্য্যালোচনা ঃ— অশোকের অক্লান্ত চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহের ফলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম পৃথিবীর এক প্রধান ধর্ম্মে পরিণত হইল। তাঁহার জীবনের আদর্শ ও অনুশাসন তাঁহার মৃত্যুর বহু পরেও ভারতের রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত

বৌদ্ধধর্ম্মের জগদ্ব্যাপী মহা-সম্প্রদায়ে পরিণতি

করিয়াছিল। তাঁহার সময়েই হিমালয় হইতে মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন প্রায় সফল হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সমরোদ্যম ও দেশ জয় অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রচারই তাঁহার নিকট সমধিক আদরণীয় ছিল। ফলে ভারতবাসিগণের বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষার ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। যে মৌর্য্য সেনা একদিন বিজয়দৃপ্ত সেলিউকসের বিশাল বাহিনী পরাভূত করিয়াছিল, অশোকের মৃত্যুর পরে তাহারা মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত ব্যাক্ট্রিয়ার বা বাহ্লীকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের আক্রমণ হইতেও সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিল না।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধন

সামরিক অবনতি

অশোকের পরবর্ত্তী মৌর্য্য রাজগণঃ—অশোকের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহার এক পুত্র কাশ্মীরে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন, আর এক পুত্র পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিলেন। অনেকে অনুমান করেন তিনি নামে মাত্র রাজা ছিলেন এবং অশোকের দুই পৌত্র 'সম্প্রতি' ও 'দশরথ'ই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিতেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী রাজগণের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। গার্গী-সংহিতায় লিখিত আছে—ইঁহাদের কেহ কেহ অধার্ম্মিক, দুর্ব্বল ও অত্যাচারী ছিলেন। দক্ষিণাপথের ও কাবুল উপত্যকার রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গ্রীকগণ আবার নূতন উৎসাহে ভারত আক্রমণ করিল। তাহারা অযোধ্যা ও মগধ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথ সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮৭ অব্দে তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হন।

বিচ্ছিন্ন মৌর্য্যরাজ্য

গ্রীক আক্রমণ ও মৌর্য্যগণের পতন

সপ্তম অধ্যায়

মৌর্য্য সম্রাট্গণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজগণ ও শকাধিকার

আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ সাম্রাজ্য :—মৌর্য্যগণের পরে মগধ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে পুষ্যমিত্র রাজত্ব করেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ অথবা বৈম্বিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮৭ হইতে ৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত এই বংশের নৃপতিগণ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। অনেকের মতে ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পুষ্যমিত্র

পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্য দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী হইতে উত্তরে বিপাশা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মালবের পূর্ব্বাংশের শাসনভার রাজপুত্র অগ্নিমিত্রের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। অগ্নিমিত্র বিদর্ভ বা বেরাররাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে পুষ্যমিত্র কলিঙ্গের চেতবংশের সহিতও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অশোকের মৃত্যুর পর চেতবংশীয়েরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পুনঃপুনঃ মগধ আক্রমণ করিয়া কলিঙ্গের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেন।

পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্যের সীমা

এদিকে মগধ সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা লক্ষ্য করিয়া গ্রীকগণ পুনরায় উৎসাহের সহিত ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া রাজপুতানার অন্তর্গত চিতোরের নিকটবর্ত্তী মধ্যমিকা জয় করেন এবং পাটলিপুত্র আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু সেখান হইতে তাঁহারা বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

গ্রীকগণের পরাজয়

অশ্বমেধ যজ্ঞ

দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পুষ্যমিত্র তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ্ পতঞ্জলি সম্ভবতঃ এই যজ্ঞে উপস্থিত

ছিলেন। অশোকের অহিংসা প্রচারের পর আবার পশুবধ ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে পুষ্যমিত্রের সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ লেখকগণও পুষ্য-মিত্রকে বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী এবং অত্যাচারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু শুঙ্গবংশের রাজত্বকালেই মধ্য ভারতে বহু বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ ও শিলাপ্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল। তখনকার ব্রাহ্মণ রাজগণ যদি সত্য-সত্যই পরধর্ম্মাসহিষ্ণু হইতেন তাহা হইলে হয় তো এই সকল বৌদ্ধ কীর্ত্তি স্থাপন সম্ভব হইত না।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয়

পুষ্যমিত্রের পরে তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের সময় বিদিশা বা মালবের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বর্ত্তমান বেসনগর অন্যতম রাজধানী ছিল। বিদিশার রাজগণ পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলার যবন রাজগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিদিশা

এই বংশের পরবর্ত্তী নৃপতিগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিগণই রাজ্য শাসন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে বসুদেব নামক জনৈক অমাত্য তাঁহার প্রভুকে হত্যা করিয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করেন। বসুদেবের স্থাপিত বংশের নাম কাণ্ববংশ। ইঁহারা মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। আনুমানিক ৩০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে দক্ষিণাপথের "অন্ধ্র" বা সাতবাহন বংশের নিকট ইঁহারা পরাজিত হন। ইহার পরে শকগণের মধ্যদেশ জয় পর্য্যন্ত 'মিত্র' নামধারী কয়েকজন রাজা অযোধ্যা, কৌশাম্বী (এলাহাবাদের নিকটে), মথুরা এবং অন্যান্য স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কাণ্ববংশ

"মিত্র রাজগণ"

কলিঙ্গরাজ খারবেল

দক্ষিণাপথ ঃ—রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই দক্ষিণাপথ। কিন্তু সাধারণতঃ নর্ম্মদা এবং কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানই দক্ষিণাপথ নামে পরিচিত। এখানে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের পতনের পর দুইটি রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে। প্রথম কলিঙ্গের চেত রাজ্য, দ্বিতীয় দক্ষিণাপথের সাতবাহন রাজ্য। চেতবংশীয় খারবেল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজার দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শাসন অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই সাতবাহনগণ সমগ্র দক্ষিণাপথের অধীশ্বর হইলেন।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি প্রতিষ্ঠান

সাতবাহন সাম্রাজ্য ঃ—সাতবাহন বা শাতবাহন বংশের প্রথম রাজার নাম সিমুক। তাঁহার পুত্র প্রথম শাতকর্ণি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে শকগণ সাতবাহন সাম্রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শক প্রাধান্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। সাতবাহন বংশের গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি বিদেশীদিগের হস্ত হইতে হৃতরাজ্য উদ্ধার করিলেন, এবং উত্তরে মালব এবং দক্ষিণে কর্ণাট বা কাণাড়া পর্য্যন্ত সমুদয় জনপদের অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার পুত্র পুলুমায়ি গোদাবরী নদীতীরে প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান নগরে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণাপথের এই সাম্রাজ্যটির পতন হয়।

সুদূর দক্ষিণ ভারত ঃ—ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের সীমার বাহিরে দ্রবিড় বা তমিলগণ বাস করিতেন। অশোকের সময় দ্রবিড় দেশ চোল, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র ও সত্যপুত্র এই চারিটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীকে 'চোল' বলা হইত, মদুরা ও তিন্নেভেলির নাম ছিল পাণ্ড্য দেশ। দক্ষিণ

মালবারে কেরলপুত্র এবং উত্তর মালবারে সত্যপুত্র রাজ্য অবস্থিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে সত্যপুত্রের আর অস্তিত্ব রহিল না। মাদ্রাজের নিকটে পল্লব নামে একটি রাজবংশের অভ্যুত্থান হইল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লবদের রাজ্য পূর্ণ প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

পল্লব রাজ্য

মাদ্রাজের নিকটে কাঞ্চী বা বর্ত্তমান কাঞ্জীভেরামে তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। প্রায় ৩৬০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু গোপ নামে এই রাজ্যের এক রাজা

চোল এবং পাণ্ড্য

উত্তর ভারতের সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হন। অপরাপর তমিল রাজ্যের মধ্যে চোলগণ সামরিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। চোলবংশের একজন রাজা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু বাণিজ্যে কেহই পাণ্ড্যগণের সমকক্ষ ছিল না।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসন ঃ—প্রিয়দর্শী অশোকের অযোগ্য বংশধরদিগের শাসনকালে গন্ধার অর্থাৎ বর্ত্তমান পেশ্ওয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি জিলা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মৌর্য্য প্রভুত্ব লুপ্ত হইল। স্থানীয় রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। গ্রীকগণ এই সময় সিরিয়া, বাহ্লীক প্রভৃতি দেশ শাসন করিতেছিলেন, তাঁহারাও ভারতের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে আপনাদিগের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিরিয়ার বিজয়দৃপ্ত নৃপতি তৃতীয় আন্তিয়োক্ (আন্টিয়োকস্) আনুমানিক ২০৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া উত্তরাপথের অভিমুখে অগ্রসর হন

ডেমেট্রিয়স্

এবং কতকগুলি হস্তী গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। তাঁহার জামাতা বাহ্লীকের রাজা দিমিত্রিয় বা ডেমেট্রিয়স্ পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশসহ উত্তর-পশ্চিম

ভারতের বহু নগর ও জনপদ জয় করিলেন। মিনাণ্ডার বা মিলিন্দ নামক একজন পরবর্ত্তী রাজা পঞ্চনদের শাকল বা শিয়ালকোট নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া মধ্যদেশের অভ্যন্তরে আধিপত্য বিস্তার করেন। কথিত আছে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিনাণ্ডার



মিনাণ্ডারের মুদ্রা

গ্রীকশাসনের অবসান

কিন্তু ইহার পরে গ্রীক শাসন আর অধিককাল স্থায়ী হইল না। মধ্য এশিয়া ও ইরাণ হইতে আগত কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ জাতির নিকট তাঁহারা পরাভূত হইলেন। এই নবাগত বিজেতৃগণ প্রধানতঃ শক, পহ্লব বা পার্থিয়ান এবং ইউচি এই তিন দলে বিভক্ত ছিল। শক এবং ইউচিদিগকে "সিথিয়ান" অর্থাৎ "শকদ্বীপবাসী" এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হইত।

শক জাতিঃ—শকগণের মধ্যে যাহারা সার্ব্বভৌম নরপতি

তাহাদের রাজধানী উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত ছিল। মোগ, অয় প্রভৃতি রাজগণ সেখানে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। তক্ষশিলা, মথুরা, উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চলে শকবংশীয় ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী রাজপুরুষগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শক সম্রাট্‌গণ

উজ্জয়িনীর মহাক্ষত্রপগণের মধ্যে রুদ্রদামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিন্ধু হইতে কোঙ্কণ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং দক্ষিণাপথের সাতবাহন বংশে কন্যা দান করিয়াছিলেন।

পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপ

ভৃগুকচ্ছের ক্ষত্রপগণের মধ্যে নহপানই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সাতবাহন-কুল-রবি দক্ষিণাপথেশ্বর গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপ-বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন।

পহ্লব রাজবংশ :—শক সম্রাট্‌গণের পরে পহ্লবগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধীশ্বর হন। এই বংশের সর্ব্বপ্রধান রাজা ছিলেন দেবব্রত গুদুফর বা বিন্দফর্ণ (গণ্ডোফারনিস্)। ধর্ম্মবীর যীশুখৃষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য পূতশীল টমাস্ ইঁহার সময়ে ভারতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া প্রাণোৎসর্গ করেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

গণ্ডোফারনিস্

কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা :—পহ্লবগণের পরে কুষাণগণ উত্তর ভারত শাসন করিয়াছিলেন। ইঁহারা চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী ইউচি জাতির শাখা। অপর এক পরাক্রান্ত জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত

হইয়া ইউচিগণ তাঁহাদের আদিম বাসস্থান ছাড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া আসেন এবং মধ্য এশিয়ার সৈহুন বা জাক্সার্টিস্

ইউচিগণের আগমন

উপত্যকা হইতে শকদিগকে বিতাড়িত করেন। তৎপরে পাঁচটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া তাঁহারা অক্সাস নদীর উপত্যকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইঁহাদের কুষাণ শাখার দলপতি কুয়ুল বা প্রথম কদফিস্ আপনাকে

প্রথম কদফিস্

সমগ্র ইউচিজাতির একমাত্র অধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করেন। কাবুল ও পশ্চিম গন্ধার বিজয় করিয়া তিনি পারস্যের সীমান্ত হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হন। তাঁহার পুত্র বিম বা দ্বিতীয় কদফিস্ ভারতের

দ্বিতীয় কদফিস্

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহু দেশ জয় করেন। সম্ভবতঃ কাশী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া তিনি একজন মহাসেনাপতির হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন।

কণিষ্কঃ—বিম বা দ্বিতীয় কদফিসের পরে কণিষ্ক রাজা হন। কুষাণ রাজগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। অনেকের মতে তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার রাজ্যাভিষেক-সম্বৎসরই উত্তরকালে শকাব্দ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কণিষ্ক উত্তরাপথ বিজয় সম্পূর্ণ করেন এবং কাবুল উপত্যকা ও কাশ্মীর হইতে কাশী পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগের

সাম্রাজ্যের সীমা

অধীশ্বর হন। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ারে। এই স্থানে তিনি যে বিরাট চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে চীন ও মুসলমান পরিব্রাজকগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র ও পহ্লবভূমির রাজগণকে পরাজিত করিয়া তিনি চীন

চরকের চিকিৎসাগ্রন্থ, নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক সূত্র এই সময়ে রচিত হয়। ভারতের রাজন্যবর্গের জ্ঞানানুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নবাগত শক ও কুষাণ নরপতিগণ দেশীয় রাজগণের ন্যায়ই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষার সমাদর করিতেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্প

এই সময়ে স্থাপত্য (এমারত নির্ম্মাণ) ও ভাস্কর্য্য (মূর্ত্তি তৈয়ার) শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পুণার নিকটে ভাজার প্রাচীন বিহার, কার্লের চৈত্য গৃহ, ভূপাল রাজ্যে অবস্থিত সাঁচি স্তূপ ও তাহার সুবিখ্যাত তোরণ প্রভৃতি এই যুগের শিল্পোৎকর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয়। মাদ্রাজের অন্তর্গত গুণ্টুর জিলায় অবস্থিত অমরাবতীর এবং মধ্য ভারতে বরহুত বা ভারহুত গ্রামের পাষাণ বেষ্টনী যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই এই যুগের ভাস্কর্য্য-শিল্পে মুগ্ধ হইয়াছেন। গন্ধার রাজ্যে পেশোয়ারের নিকটে যে ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত খৃষ্টের জন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে প্রচলিত গ্রীস ও রোমের ভাস্কর্য্যরীতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

গ্রীস্ ও রোমের প্রভাব:—মৌর্য্যগণের পরবর্ত্তী যুগে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের সহিত, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সহিত অনেক বিদেশীয় জাতির সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল। এই সংস্পর্শের ফলে পরস্পরের সহিত ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। যাঁহারা এ দেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এদেশবাসিগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। ভারত সীমান্তের যবন ও শক নৃপতি ও রাজ-পুরুষগণ অনেকেই ভারতীয় ধর্ম্ম সাদরে গ্রহণ করেন; পক্ষান্তরে গন্ধারের শিল্পে ও ভারতীয় জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে বিদেশীয় এবং বিশেষভাবে গ্রীক প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের প্রতি ভারতীয় পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

ভারতীয় রাজগণ গ্রীক ও রোমকদিগের অনুকরণে তাঁহাদের নিজ রাজ্যে নূতন রকমে মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

বাণিজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনঃ—এই যুগে রাষ্ট্রীয় কার্য্যে ও বাণিজ্যাদিব্যপদেশে ভারতীয়গণের দূরদেশে সমুদ্রপথে গমনাগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় রাজদূতগণের কার্য্যক্ষেত্র একদিকে রোম সাম্রাজ্য অপর দিকে সুদূর চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিশরের বাণিজ্য পোতগুলি পশ্চিম ভারতের সমুদ্রোপ-কূলস্থিত বন্দরে আসিয়া লাগিত। রোমের একজন গ্রন্থকার আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, রেশমী কাপড় ও মণিমাণিক্য বিক্রয় করিয়া ভারতবাসী প্রতিবৎসর রোম সাম্রাজ্য হইতে বহু অর্থ লইয়া যায়। 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' নামক পুস্তকেও সমুদ্রপথে চীন সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে চীনের পট্টবস্ত্রের যে বর্ণনা আছে কাহারও কাহারও মতে তাহা এই যুগের কথা। এই সময়ে বঙ্গদেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবস্ত্র তৈয়ার হইত। উহা এত চিক্কণ ও চমৎকার ছিল যে সেকালের রোম সাম্রাজ্যের ধনী বিলাসিগণ বঙ্গের মস্‌লিন বস্ত্র ক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কারুশিল্পী ও বণিক্‌গণ দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতেন। এই দল বা সঙ্ঘগুলি "শ্রেণী" নামে অভিহিত হইত। বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও ক্ষত্রশক্তির প্রভাব নানা দেশে বিস্তৃত হইল। যবদ্বীপ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বেই অধিকৃত হইয়াছিল। প্রায় এই সময়েই ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীনের অন্তর্গত চম্পা জনপদে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত

বঙ্গীয় মস্‌লিন

শিল্পী ও বণিক্‌সঙ্ঘ

যবদ্বীপ ও চম্পায় উপনিবেশ স্থাপন

হইয়াছিল এবং উহার অদূরবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জেও বহুদিন হিন্দু অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল।

বিক্রমাব্দ প্রভৃতির উদ্ভব ও প্রচলনঃ—শকাধিকারের যুগে কয়েকটি সম্বৎ বা অব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাজা তাঁহাদের রাজ্যাভিষেক বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য অব্দ বা সম্বৎ প্রচলন করিতেন। শকাধিকারকালে যে অব্দগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রথমটির নাম বিক্রমাব্দ। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ সালে এই অব্দ গণনা আরম্ভ হয়। শকাব্দ ৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিক্রমাব্দ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই অব্দ প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কোনও শিলা লিপি অথবা মুদ্রায় বিক্রমাদিত্য নামে যে কোনও রাজা ছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। গুপ্ত রাজত্বকালে এই অব্দটি "মালবগণাম্নাত" বলিয়া পরিচিত ছিল, অর্থাৎ মালবগণের অধিকৃত ভূখণ্ডে ইহা বংশানুক্রমে চলিয়া আসে। বিক্রম নাম পরে যুক্ত হইয়াছিল।

বিক্রমাব্দ

শকাব্দ কোনও শক রাজার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কে তাহা এখনও নিঃসংশয়ে জানা যায় নাই। কেহ বলেন সম্রাট্ কণিষ্কই শকাব্দের প্রবর্ত্তক, আবার কেহ বলেন দ্বিতীয় কদফিস্ অথবা পশ্চিম ভারতের কোনও ক্ষত্রপরাজের অভিষেক উপলক্ষেই শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল।

শকাব্দ

অষ্টম অধ্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্য

শক উপদ্রব ও গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুত্থান :—মগধের মৌর্য্য-বংশীয় সম্রাট্‌গণের বাহুবলে গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল, আর শকদিগের আধিপত্য বিনষ্ট হইয়াছিল মগধের গুপ্ত সম্রাট্‌গণের পরাক্রমে।

শকদের উপদ্রব

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত :—চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন রাজা গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরকুলের সহায়তায় তিনি আপন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ক্রমে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয় এবং তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

লিচ্ছবিরাজ্যের সহিত মিত্রতা স্থাপন

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে খৃষ্টীয় ৩২০ অব্দে তাঁহার রাজত্বকালে একটি অব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। উহার নাম গুপ্তাব্দ বা গুপ্ত-সম্বৎ। কুমারদেবীর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

গুপ্তাব্দ

সমুদ্রগুপ্ত :—সমুদ্রগুপ্তই ছিলেন গুপ্তবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। প্রাচীন ভারতে যে সকল সম্রাট্ অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম। তিনি গঙ্গা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের ছোট বড় অনেক রাজাকেই একে একে পরাভূত

করেন। এই সকল পরাজিত রাজগণের মধ্যে চন্দ্র বর্ম্মা ও গণপতি নাগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার পরে তিনি দক্ষিণ ভারত বিজয়ে অগ্রসর হইয়া আরও অনেক রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্তু দক্ষিণাপথের বিজিত রাজগণের রাজ্যগুলি তিনি স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন নাই। আনুগত্য স্বীকার করা মাত্রেই তিনি পরাজিত রাজগণকে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এইখানেই তাঁহার দেশ জয় শেষ হয় নাই। একদিকে সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ), কামরূপ (আসাম) ও সুদূর নেপাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং অপরদিকে পঞ্জাব, রাজপুতানা ও মালবের গণতন্ত্র-শাসিত রাজ্যসমূহ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। পশ্চিম ও উত্তর ভারতের শক ও কুষাণ রাজগণ ও সিংহলরাজ মেঘবর্ণকেও সমুদ্রগুপ্তের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সিংহলের রাজাকে তিনি বুদ্ধগয়ায় একটি সংঘারাম অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আবাস প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছিলেন।

উত্তর-দক্ষিণে অভিযান

শককুষাণ রাষ্ট্র ও সিংহলের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন

এইরূপে মগধরাজ সমুদ্রগুপ্তের অপ্রতিহত প্রভাব ভারতের দূর-দূরান্তে পরিব্যাপ্ত হইল। ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে সমুদ্রগুপ্ত অশোকের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু অশোকের মত তিনি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের রীতি অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্রের সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। সমুদ্রগুপ্তের সময়ে এই ধর্ম্ম পূর্ণ গৌরবে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই কারণে সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞ ভারত ইতিহাসের একটি

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের জয়

স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। গুপ্ত নৃপতিগণ প্রত্যেক ধর্ম্মই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা

সমুদ্রগুপ্ত অসাধারণ প্রতিভাশালী সম্রাট্ ছিলেন। কেবল সামরিক অভিযান ও রাজ্য জয়ের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদ্বান্, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও তাঁহার যশ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কতকগুলি মুদ্রায় রাজার বীণা-বাদন-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা



সমুদ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) (৩৮০-৪১৩ খৃঃ):—সমুদ্রগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র রামগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি আবার তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন বলিয়া একটি জনমত প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত গুপ্তবংশের যতগুলি প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে সমুদ্রগুপ্তই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য দক্ষিণাপথের পরাক্রান্ত বাকাটক বংশীয় নৃপগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া শকক্ষত্রপগণকে পরাভূত করেন এবং মালব

ও সৌরাষ্ট্র (কাথিওয়াড়) জয় করেন। কতকগুলি মুদ্রায় ইঁহাকে বিক্রমাদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় বিক্রমশালী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য পাটলিপুরবরাধীশ্বর ও উজ্জয়িনী-পুরবরাধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। এই সকল অবিসংবাদিত তথ্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই উজ্জয়িনীর সেই সুপ্রসিদ্ধ শকারি বিক্রমাদিত্য, যাঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্নের সমাবেশ হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। অবশ্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় একই সময়ে নবরত্নের অবস্থিতি বিশ্বাসযোগ্য কিনা সন্দেহ।

শকগণের উচ্ছেদ

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যই

ভারত-বিশ্রুত

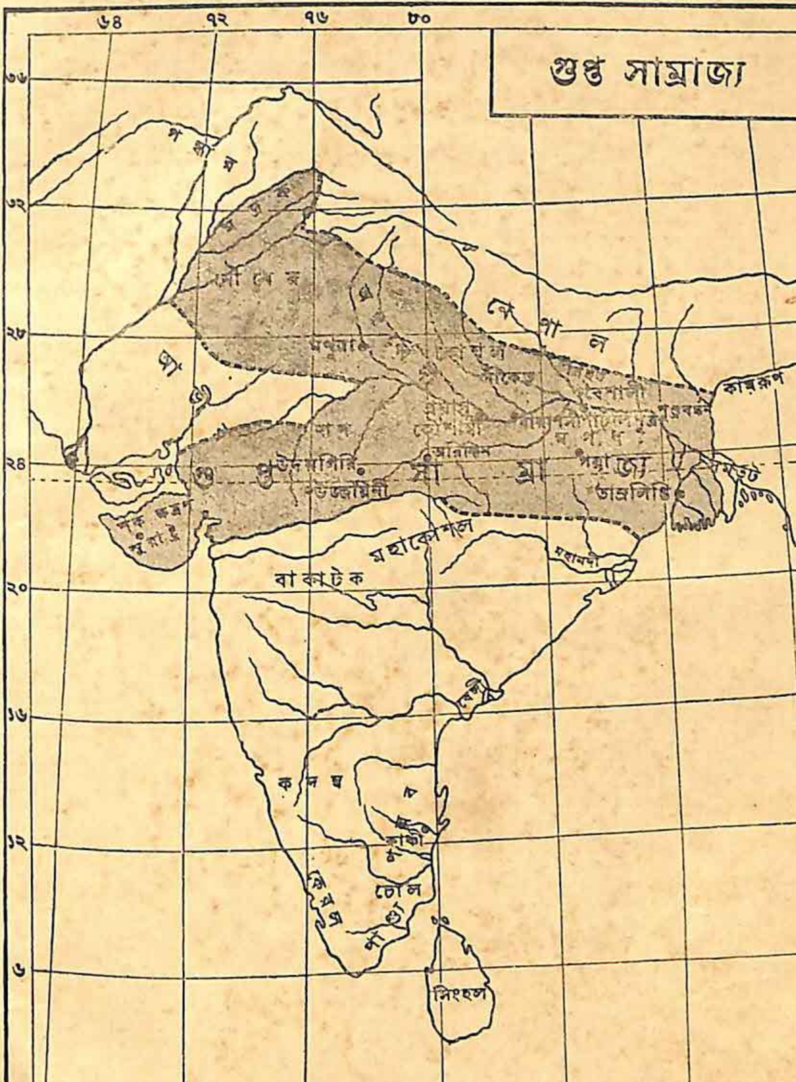
শকারি বিক্রমাদিত্য



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

ফা-হিয়েন :—চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে সে সময়ের রাজ্য শাসন ও দেশের অবস্থা সম্পর্কে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। পাটলিপুত্রে অশোকের রাজপ্রাসাদ এবং মগধের দাতব্যচিকিৎসালয় দেখিয়া ফা-হিয়ান বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। জনসাধারণ ধনসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অন্ত ছিল না। শাসকগণ পীড়ন-নীতি পছন্দ করিতেন না, কঠোর আইনের কঠিন শাসনে লোক

সুশাসন



গুপ্ত সাম্রাজ্য
নেপাল
কামরূপ
বৈশালী
মগধ
তাম্রলিপ্তি
মহাকোশল
মহানদী
বাকাটক
উজ্জয়িনী
কাঞ্চী
চোল
সিংহল

উৎপীড়িত হইত না। রাজস্বের অধিকাংশই খাসমহল হইতে আদায় হইত। রাজকর্ম্মচারিগণ নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন এবং দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাম্রলিপ্তি বা তমলুক একটি প্রধান সামুদ্রিক বন্দর ছিল। এইখান হইতে বড় বড় জাহাজ সুদূর যবদ্বীপে যাত্রা করিত। সে সময় যবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের একটি কেন্দ্র ছিল।

তাম্রলিপ্তি

প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৪-৫৫ খৃঃ):—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর প্রথম কুমারগুপ্ত পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। পিতামহের ন্যায় তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই। পুষ্যমিত্র নামক এক দুর্দ্দান্ত জাতির অভ্যুদয়ে এই সময়ে গুপ্ত রাজ-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অবশেষে রাজকুমার স্কন্দগুপ্তের প্রাণপণ চেষ্টায় গুপ্তবংশের পতনোন্মুখ গরিমা অতি কষ্টে রক্ষা পাইল।

পুষ্যমিত্রগণ

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৬৭ খৃঃ):—পিতার মৃত্যুর পরে বিজয়ী কুমার স্কন্দগুপ্ত রাজা হন। কিন্তু এই সময়ে পুষ্যমিত্রগণ অপেক্ষাও ভীষণতর, হিংস্র, দুর্দ্ধর্ষ হূণ জাতি মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া স্কন্দগুপ্ত তাঁহার পিতামহের ন্যায় 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

হূণগণের আক্রমণ

স্কন্দগুপ্তের পরবর্ত্তী রাজগণ:—সম্ভবতঃ ৪৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজগণ অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের পরে বুধগুপ্ত

বালাদিত্য এবং দশপুর বা মান্দাশোরের "জনেন্দ্র" যশোধর্ম্মা মিহির-গুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

যশোধর্ম্মা :—মান্দাসোর লিপিতে লেখা আছে যে যশোধর্ম্মা হিমালয় হইতে পূর্ব্বঘাট এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে তিনিই উজ্জয়িনীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য। কিন্তু তিনি যে কখনও বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই।

মৌখরি বংশ ও তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণ :—যশোধর্ম্মার হস্তে পরাজিত হইবার পরও হূণেরা বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে উপদ্রব করিয়াছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস প্রধানতঃ হূণ আক্রমণকারীদের সহিত ভারতীয় রাজগণের সংঘর্ষের ইতিহাস। এই শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মৌখরি বংশ ও থানেশ্বরের রাজগণই সর্ব্বপ্রধান। আধুনিক রাজপুতানা, পশ্চিম বিহার ও যুক্ত প্রদেশে মৌখরি বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের শেষ প্রসিদ্ধ রাজা গ্রহবর্ম্মা থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর-বর্দ্ধনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মালবের একজন রাজা কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন এবং তাঁহার পত্নী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বন্দী করা হয়।

গ্রহবর্ম্মা

থানেশ্বরের রাজবংশ :—রাজ্যশ্রীর পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন পুষ্যভূতি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র অংশে এই বংশ দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজত্ব করিতেছিল। ইহাদের রাজধানী ছিল থানেশ্বরে। বালাদিত্য, যশোধর্ম্মা এবং মৌখরিগণের ন্যায়

প্রভাকরবর্দ্ধন

প্রভাকরবর্দ্ধনও হূণগণের বিরুদ্ধে শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনও হূণদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। মালবের গুপ্ত রাজাকে দারুণ সংগ্রামে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহার ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পশ্চিম বঙ্গের গৌড় বা কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন।

রাজ্যবর্দ্ধন

বাংলার রাজা শশাঙ্ক

হর্ষ শীলাদিত্য :—গ্রহবর্ম্মার মৃত্যু ও রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার ফলে মৌখরি এবং পুষ্যভূতি বংশের রাজপদ শূন্য হইল। তখন দুই রাজ্যের অমাত্যগণ একত্র হইয়া থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্দ্ধনের ও মৌখরি কুলের বিধবা রাণী রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে উভয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সম্ভবতঃ ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষ এই দুইটি রাজ্যেরই পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসর হইতেই হর্ষাব্দ আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু প্রথমে কিছুকাল পর্য্যন্ত হর্ষ রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই।



শীলাদিত্য

হর্ষাব্দ



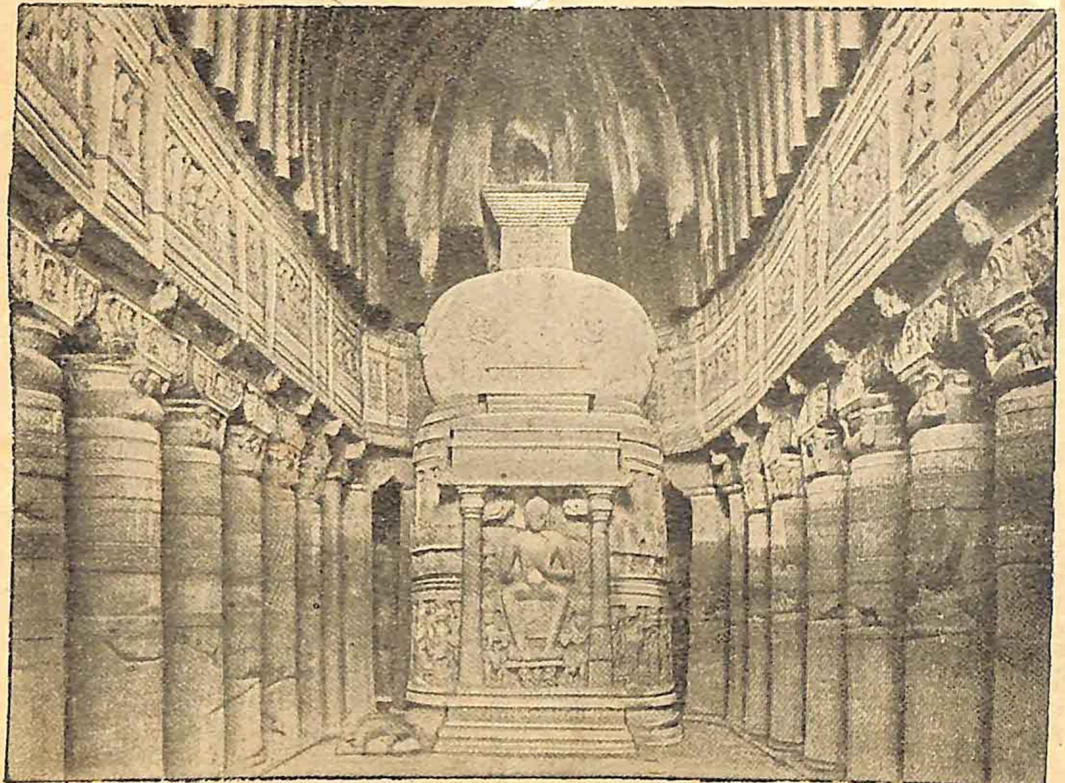
সন্তান ও মাতা—অজন্তা

বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্বমালব পর্য্যন্ত স্থান বিশ বৎসর কাল শাসন করিয়াছিলেন (৪৭৭-৯৬ খৃঃ)। তাহার পর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্ত নাম-ধারী অনেক নৃপতি রাজত্ব করিয়া ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের শাসনে গুপ্ত বংশের পূর্ব্ব গৌরব আর অক্ষুণ্ণ রহিল না।

পরবর্ত্তী গুপ্তরাজ-গণ

হূণগণ পুনরায় বিপুল বেগে ভারত আক্রমণ করিয়া গুপ্তগণের বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। পঞ্জাব ও মধ্যভারতে হূণ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। ওদিকে বঙ্গ, কনৌজ, মালব ও কাথিওয়াড়ের সামন্ত রাজগণ সুযোগ বুঝিয়া একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

হূণ



চৈত্য গৃহ—অজন্তা

গুপ্তযুগের সভ্যতা ঃ—গুপ্ত সম্রাট্‌গণের যুগ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরভ্যুত্থানের যুগ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কণিষ্ক ও অপরাপর কুষাণ ও শক রাজগণের শাসন সময়েও সংস্কৃত ভাষার সমাদরের অভাব ছিল না; সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ ও ক্রমোন্নতি কোথাও বাধা পায় নাই। গুপ্তযুগ শিল্প ও সাহিত্যের চরম উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশের যুগ; পুনরভ্যুত্থানের যুগ নহে। সাহিত্যে কালিদাসের প্রতিভায় অশ্বঘোষ ও ভাসের খ্যাতি ম্লান হইল। কবি হরিষেন ও বীরসেন যথাক্রমে সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁহার পুত্রের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সম্রাটের গুণকীর্ত্তনে তাঁহারা যে গুণপণার পরিচয় দিয়াছেন তাহা কালিদাসের পক্ষেও অগৌরবের হইত না। মৃচ্ছকটিকের যশস্বী গ্রন্থকার শূদ্রক এই যুগেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পাটলিপুত্রের আর্য্যভট ও মালবের বরাহমিহির যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই।

জ্ঞানোন্নতি
কালিদাস
ও অন্যান্য কবি

শিল্প

পৌরাণিক ও স্মৃতি-সাহিত্য এই সময়ে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের উৎকর্ষেও এই যুগ গৌরবোজ্জ্বল হইয়াছে। অজন্তা গুহার চিত্রাবলী গুপ্তযুগের বিশ্ব-বিশ্রুত কীর্ত্তি। দিল্লীতে চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আজিও গুপ্ত-যুগের ধাতুশিল্পের চরম উন্নতির সাক্ষ্য দিতেছে।

তৃতীয় খণ্ড

মধ্যযুগের পূর্ব্ব সূচনা

নবম অধ্যায়

হূণগণের সহিত সংঘর্ষ ও কনৌজের অভ্যুত্থান

হূণগণের কথাঃ—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে যে বর্ব্বর জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাহারা মধ্য এশিয়ার বিশাল প্রান্তর হইতে দুই দলে বাহির হয়। একদল অক্সাস্ নদীর উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, অপর দল ইউরোপ অভিমুখে চলিয়া যায়। যাহারা ইউরোপের দিকে গিয়াছিল, তাহারা বিখ্যাত এট্টিলার নেতৃত্বে রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে, আ'র যাহারা ভারতবর্ষের দিকে আসিয়াছিল, তাহারা গন্ধার রাজ্য জয় করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। ইহারা শ্বেত হূণ নামে পরিচিত ছিল। প্রথমে স্কন্দগুপ্তের হস্তে তাহাদের পরাভব ঘটে, কিন্তু কিছুকাল পরেই সুদক্ষ দলপতি তোরমানের নেতৃত্বে তাহারা আবার গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। তোরমান ও তাহার পুত্র মিহিরগুল বা মিহিরকুল পঞ্জাব এবং পূর্ব্বমালবে হূণরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মিহিরগুল পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল বা শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করেন। হিন্দুরাজগণ এই বর্ব্বর জাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মগধের গুপ্ত রাজা

তোরমান ও মিহিরগুল

শাসনভার গ্রহণ করার পরেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বিপন্ন ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। তারপর কামরূপের রাজা ভাস্কর-বর্ম্মার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে দমন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সগৌরবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে হর্ষের মিত্র কামরূপের রাজা গৌড়ের রাজধানী অধিকার করেন। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়।

ভাস্করবর্ম্মা
শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ

হর্ষের বিজয় যাত্রা

হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত হর্ষের বিজয়-বাহিনী অগ্রসর হইয়াছিল। নর্ম্মদা পার হইয়া তিনি দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণাপথের পরাক্রমশালী চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার গতিরোধ করেন। দক্ষিণের এই অভিযান ব্যর্থ হইলেও পশ্চিমে তাঁহার আক্রমণ নিষ্ফল হয় নাই। কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত বলভীর রাজা ধ্রুবসেন তাঁহার নিকট পরাভূত হন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরে হর্ষ 'মগধ-রাজ' উপাধি ধারণ করিয়া সুদূর চীনে রাজদূত প্রেরণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি গঞ্জাম বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন।

চালুক্যদের ও বলভীর
সহিত যুদ্ধ

পূর্ব্ব ভারতে
অভিযান

হর্ষের রাজ্যসীমা পূর্ব্ব পঞ্জাব হইতে বিহার ও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে বলভীর রাজা এবং পূর্ব্বে কামরূপের রাজা তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার চালুক্য প্রতিপক্ষেরাও তাঁহাকে সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সাম্রাজ্য সীমা

পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তরাজগণের ন্যায় হর্ষও কেবলমাত্র যোদ্ধা ছিলেন না, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রবল বিদ্যানুরাগ তাঁহাকে ভারত-ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার রচিত রত্নাবলী ও অন্যান্য নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। কাদম্বরী ও হর্ষচরিত প্রণেতা বাণ তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

হিউয়েন সাঙ (ইউয়ান্ চোয়াং) ঃ—শৈবধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হর্ষ অপর ধর্ম্ম সম্পর্কে সর্ব্বদা উদার নীতি অবলম্বন করিতেন। শেষ বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। তাঁহার অনেক বৌদ্ধ বন্ধু ছিল। তাঁহাদের মধ্যে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হিউয়েন সাঙ ৬৩০ হইতে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সে সময়কার দেশের অবস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি মূল্যবান বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তখন পাটলিপুত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। হিউয়েন সাঙ তথাকার প্রাচীন প্রাসাদাবলীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন রাজধানীর দক্ষিণে নালন্দায় (বর্ত্তমান বরগাঁও) একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এশিয়ার দূর দূরান্ত হইতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী এই শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইত। নূতন রাজধানী কনৌজ তখন সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে অবস্থিত। চীন পরিব্রাজক হর্ষের পরাক্রম ও দানশীলতার কথাও বলিয়াছিলেন। হর্ষ কর্ত্তৃক ছয় বৎসরের যুদ্ধে ভারতের পঞ্চ রাষ্ট্র বিজয়ের কাহিনীও হিউয়েন সাঙের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে এবং জীবহত্যা নিবারণের জন্য যে সকল

নালন্দা

কনৌজ ও তাহার রাজা

বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, হিউয়েন সাঙ তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাজা রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিদর্শনে বাহির হইতেন। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পথিক ও অতিথির জন্য সুব্যবস্থা হইত। হর্ষ নিজে দানশীল, সদাশয় ও ধর্ম্মপ্রাণ হইলেও রাজ্য শাসনে গুপ্তগণের মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার শাসনকালে হিউয়েন সাঙ একাধিকবার দস্যুহস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

কনৌজ ধর্ম্মসম্মিলন

হিউয়েন সাঙের বিবরণে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে একটি বিরাট্ ধর্ম্ম সম্মিলনের উল্লেখ দেখা যায়। ভগবান্ বুদ্ধের একখানি মূর্ত্তিসহ প্রতিদিন একটি শোভাযাত্রা বাহির হইত। বিশজন রাজা এই মূর্ত্তির অনুগমন করিতেন। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনার জন্য ধর্ম্ম মহাসভার অধিবেশনের কথাও চীন পরিব্রাজক লিখিয়াছেন। এই সভায় শত শত পণ্ডিত সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

প্রয়াগের মহামোক্ষপরিষদ্ বা মহাসম্মিলন

কনৌজের অনুষ্ঠান শেষ হইলে হর্ষ তাঁহার চীনদেশীয় বন্ধুকে লইয়া প্রয়াগে গিয়াছিলেন। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তে যে দান ও ধর্ম্মোৎসব হইত, তাহা দেখিয়া হিউয়েন সাঙ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। সেখানে বুদ্ধ, সূর্য্য ও শিবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া সম্রাট্ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে ঈপ্সিত দ্রব্য দান করিতেন। যখন সর্ব্বস্ব দান শেষ হইত, তখন সম্রাট্ একখানি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং বুদ্ধের চরণে প্রণত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেন।

দশম অধ্যায়

কনৌজ বিজয়াকাঙ্ক্ষী রাজন্যগণের দ্বন্দ্ব এবং প্রতিহার (রাজপুত) সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন

মহোদয়-শ্রী :—হর্ষের সময় হইতে মুসলমানগণের ভারত বিজয় পর্য্যন্ত কনৌজের আধিপত্য লইয়া বহু যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। ভারতের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত নরপতিগণও 'মহোদয়-শ্রী', অর্থাৎ কনৌজের রাজৈশ্বর্য্য অর্জ্জন পরম গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। এই নগর বিজয়ের জন্য বার বার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। অবশেষে প্রতিহার বংশের রাজপুতগণ কনৌজ অধিকার করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

হর্ষের মৃত্যুর পরে কনৌজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী নৃপতিগণের কেহই তাঁহার মত পরাক্রমশালী ছিলেন না। তাই কনৌজরাজের দুর্ব্বলতার সুযোগে অন্যান্য দেশাধিপতিগণ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যশোবর্ম্মা কনৌজের পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। ভবভূতি প্রমুখ কবিগণ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশ্মীররাজের আক্রমণে শীঘ্রই তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল।

ভবভূতি

কাশ্মীর :—হর্ষের সময় হইতেই কাশ্মীর রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে। অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য উত্তরের তুখার ও তিব্বতের ভৌট্টদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি

ললিতাদিত্য

যশোবর্ম্মার পরাভব। দশম শতাব্দীর শেষাংশে দিদ্দা নাম্নী এক রাণী সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্ত্তী রাজগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া আর কনৌজ আক্রমণ করিতে পারেন নাই।

রাণী দিদ্দা

বঙ্গদেশ ও পাল সাম্রাজ্যঃ—পূর্ব্ব ভারতে এই সময় বাংলা রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের বীরগণ দিল্লীর লৌহস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাপয়িতা রাজা চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌখরিবংশের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ হয়। তাহার পরবর্ত্তী শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের রাজা শশাঙ্ক কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু হর্ষ ও তাঁহার মিত্র কামরূপ-রাজের প্রতিকূলতায় তাঁহার বিজয় অভিযান বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিবেশী রাজগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে বঙ্গদেশে অরাজকতা উপস্থিত হইল। অরাজক দেশে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার হয়। বঙ্গদেশেও এইরূপ "মাৎস্য ন্যায়" বা অরাজকতার উৎপীড়ন চলিতেছিল। অবশেষে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করা হইলে তিনি বাংলায় শান্তি স্থাপন করেন।

বঙ্গবাসীর বীরত্ব

শশাঙ্ক

পালগণের অভ্যুত্থান

গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল অতীত গৌরবের লীলাভূমি পাটলিপুত্রে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া মৌর্য্য এবং গুপ্তগণের ন্যায় পূর্ব্ব ভারতের লুপ্ত গরিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পরে তিনি কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধ নামে এক ব্যক্তিকে কনৌজের সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। কয়েকখানি

ধর্ম্মপাল

প্রাচীন লিপিতে দেখা যায় যে কেবল কনৌজ নহে, হিমালয় প্রদেশের কেদার হইতে দক্ষিণ ভারতের গোকর্ণ পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরও অভাব ছিল না। দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূট সম্রাট্ ধ্রুব ও তদীয় পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ এবং মারবারের গুর্জ্জর-প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাষ্ট্রকূট সম্রাট্গণ গৌড়রাজকে গঙ্গা যমুনা দোয়াব হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং প্রতিহার-রাজ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং কনৌজ অধিকার করিয়া মধ্যদেশে গুর্জ্জর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

তিন পক্ষের সংগ্রাম

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল পিতার ন্যায় সমরকুশল ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। মুঙ্গেরে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া তিনি হৃত সাম্রাজ্য উদ্ধারের সঙ্কল্প করিলেন। আসাম ও উড়িষ্যা জয় করিয়া তিনি দ্রবিড় ও গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণ করেন। একখানি প্রাচীন লিপিতে দেখা যায় তাঁহার সৈন্যগণ উত্তরে কম্বোজ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার এক রাজা নালন্দায় একটি সংঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং নগরহার বা জেলালাবাদের জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য নালন্দা মহাবিহার-পরিপালকের পদ পাইয়াছিলেন।

দেবপাল

দেবপালের পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল রাজা হন। কিন্তু রাজ্যশাসন অপেক্ষা তপশ্চর্য্যায় অধিক অনুরাগ ছিল বলিয়া তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পুত্র নারায়ণপালের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ

পাল সাম্রাজ্যের পতন

করেন। এই সময়ে প্রতিহারগণ প্রথম ভোজের অধিনায়কত্বে কনৌজে তাঁহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাংলার সৈন্যদলকে পরাজিত করেন। ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল খুব সম্ভব পাল রাজার নিকট হইতে উত্তরবঙ্গ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর কম্বোজ নামক এক জাতির উপদ্রবে পালবংশের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছিল। তথাপি প্রথম মহীপালের অধীনে আবার তাঁহাদের লুপ্ত গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কনৌজ বিজয়োদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা আর কখনই সম্ভব হয় নাই।

পুনরভ্যুত্থান

প্রতিহার সাম্রাজ্যঃ—প্রতিহারদিগের পরাক্রমে কনৌজে পাল প্রভুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। প্রতিহারগণ জাতিতে রাজপুত ছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে রঘুকুলতিলক লক্ষ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রতিহার বংশ গুর্জ্জর জাতির শাখা বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। এই বংশের নরপতি নাগভট, ধর্ম্মপাল ও তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকে পরাভূত করিয়া কনৌজের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র প্রথম ভোজ সম্ভবতঃ ৮৩৬ হইতে আনুমানিক ৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রতিহার বংশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ব পঞ্জাব হইতে গৌড়বঙ্গের প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। ভোজরাজের পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপালের সময়েই প্রতিহার সম্রাট্গণ গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র মহীপাল কিছুকাল পর্য্যন্ত পিতার সাম্রাজ্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রকূটবংশোদ্ভব তৃতীয় ইন্দ্রের আক্রমণের পর প্রতিহার

প্রতিহারগণের পূর্ব্বকথা

প্রথম ভোজদেব

প্রথম মহেন্দ্রপাল

সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। পালরাজগণ মগধ ও তীরভুক্তি জয় করিলেন। বিভিন্ন রাজপুত বংশ সুবিধামত অন্যান্য প্রদেশগুলিও অধিকার করিয়া লইলেন। যমুনা ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী স্থানে চন্দেল্লগণ প্রবল হইয়া উঠিল। পরমারগণ মালবের এবং ত্রিপুরীর চেদিগণ আপনাদিগকে প্রয়াগের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন

গুজরাটে চৌলুক্য বা সোলঙ্কিগণের স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল। উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুতীরে উদভাণ্ড বা ওহিন্দে ব্রাহ্মণশাহী নামে নূতন একটি রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ১০১৮ অব্দে গজ্না বা গজ্নীর সুলতান মামুদ প্রতিহার সাম্রাজ্যের রাজধানী কনৌজ অধিকার করেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই কনৌজের প্রতিহার রাজা রাজ্যপাল শত্রুহস্তে নিহত হইলেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিহার বংশের গৌরবসূর্য্যও চিরতরে অস্তমিত হইল।

উদভাণ্ডের শাহী

প্রতিহার বংশের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বঃ—প্রতিহারগণই উত্তর ভারতের শেষ পরাক্রান্ত হিন্দুসম্রাট্‌বংশ। তাঁহাদের আনুকূল্যে সাহিত্য-চর্চ্চার উন্নতি হইয়াছিল এবং তাঁহাদের শাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল। একজন আরব পর্য্যটক ভারতের অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা প্রতিহার সাম্রাজ্যে দস্যু তস্করের উপদ্রব অল্প ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরবদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতিহার রাজগণ অনেক অশ্বারোহী সেনা ও বিশাল উষ্ট্রবাহিনী রাখিতেন। তাঁহাদের সময় হইতে রাজপুত জাতির গৌরবের যুগ আরম্ভ হয়। এই নবশক্তির বিরুদ্ধে প্রথমে পাল ও রাষ্ট্রকূটগণ এবং পরে পঞ্চনদবিজয়ী মুসলমানগণ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে রাজপুত ও মুসলমানদিগের বহু শতাব্দীব্যাপী সংঘর্ষের সূচনা হয়।

একাদশ অধ্যায়

কনৌজের সমৃদ্ধির যুগে দক্ষিণাপথের অবস্থা

কনৌজ ও দক্ষিণাপথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ—দক্ষিণাপথের যে কয়েকটি প্রবল রাজবংশ কনৌজ সম্রাট্‌দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চালুক্য এবং রাষ্ট্রকূটদিগের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাতাপি নগরীর চালুক্য বংশ ঃ—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম পুলকেশী চালুক্য রাজ্য স্থাপন করেন। বাতাপিপুরে বা বিজাপুর জিলার অন্তর্গত বাদামিতে তাঁহার রাজধানা ছিল। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ চতুর্দ্দিকে রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিতীয় পুলকেশী ৬০৯ হইতে ৬৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি। তিনি কনৌজরাজ হর্ষকে পরাভূত করেন। কাঞ্চীর পল্লববংশীয় রাজা মহেন্দ্রবর্ম্মাও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজসভা দর্শন করিয়াছিলেন এবং রাজার পরাক্রম ও প্রজার শৌর্য্যের কথা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ৬৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি মহেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র কাঞ্চীরাজ নরসিংহবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশী

নরসিংহের পরে পল্লবগণের শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। চালুক্যগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিলেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

পল্লব রাজধানী জয় করেন। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বাতাপির চালুক্য সাম্রাজ্য রাষ্ট্রকূটগণের আক্রমণে হীনবল হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য ঃ—রাষ্ট্রকূট রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার নাম দন্তিদুর্গ। তাঁহার খুল্লতাতের পৌত্র তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৪-৮১৫ খৃঃ) এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি প্রতিহাররাজ নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বাংলার ধর্ম্মপাল ও তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকেও তাঁহার প্রবল প্রতাপ স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

তৃতীয় গোবিন্দ

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ (৮১৫-৭৮ খৃঃ) নাসিক হইতে মান্যখেট নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন। নিজাম রাজ্যে অবস্থিত বর্ত্তমান মালখেডই রাষ্ট্রকূট রাজধানী মান্যখেট। অমোঘবর্ষের প্রপৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৪-১৬ খৃঃ) প্রতিহার-বংশীয় প্রথম মহীপালকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। অবশেষে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় তৈল নামক এক চালুক্যবীর রাষ্ট্রকূটগণকে পরাজিত করিয়া কল্যাণের চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রথম অমোঘবর্ষ

ভারতীয় নৃপতিগণের মধ্যে রাষ্ট্রকূটগণ যে মহাপরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, সেই সময়কার আরবলেখকগণের বিবরণ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা লিখিয়াছেন চীনের অধীশ্বর, বোগ্‌দাদের খলিফা, কনস্তান্তিনোপলের বাদশাহ এবং রাষ্ট্রকূট সম্রাট্ সেকালে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তর ভারতের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সমূহের পতন

প্রতিহার রাজ্য ধ্বংস :—৯৭৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল। উত্তর ভারতের গৌরব, হর্ষ ও ভোজের সমৃদ্ধ রাজধানী কনৌজ ১০১৮ খৃষ্টাব্দে গজ্‌নীর মামুদের হস্তগত হইল। এই সময় হইতে তরাইনের যুদ্ধ (১১৯২ খৃঃ) পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে আর প্রতিহার সাম্রাজ্যের মত কোনও শক্তিশালী রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। সমগ্র দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে এই সকল ছোট রাজ্যের প্রায় সবগুলিই বিনষ্ট হইল। ইহাদের মধ্যে :—(১) বাংলার পাল ও সেন রাজ্য, (২) জেজাকভুক্তি বা বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল রাষ্ট্র, (৩) ডাহল বা জব্বলপুর অঞ্চলের চেদি রাজ্য, (৪) মালবের পরমার, (৫) গুজরাটের চৌলুক্য ও বাঘেলা, (৬) কনৌজ ও কাশীর গাহড়বাল, (৭) পূর্ব্ব পঞ্জাব, দিল্লী ও আজমীরের তোমর এবং চাহমান রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার পাল ও সেন রাজগণ :—দশম শতাব্দীর শেষদিকে কম্বোজগণের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য কিরূপ বিধ্বস্ত হইতেছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম মহীপালের আমলে বাংলার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি চোল বিজয়বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সম্ভবতঃ কাশী পর্য্যন্ত রাজ্য জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপে আর একবার বাংলার অভ্যুত্থান হইল বটে, কিন্তু কেন্দ্রস্থ রাজশক্তি তেমন প্রবল রহিল না। কতকগুলি করদ ও মিত্র রাজ্য লইয়া সাম্রাজ্য শাসন চলিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-

গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপাল

পশ্চিম বঙ্গের শূর রাজ্য এবং পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্রবংশ শাসিত রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শূরবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা আদিশূর সম্পর্কে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, সমসাময়িক কোনও লেখায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

শূরবংশ

প্রথম মহীপালের পরে নয়পাল বাংলার রাজা হন। তাঁহার রাজত্ব-কালে চেদিরাজ কর্ণ কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু অতীস বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চেষ্টায় সন্ধি স্থাপিত হয়। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল কর্ণের কন্যা বিবাহ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপালের সময় উত্তর বঙ্গে দিব্য বা দিব্বোকের অধিনায়কত্বে এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার ফলে পাল-সাম্রাজ্য দ্বিতীয়বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। তাহার পরে তাঁহার দুই পুত্র ও এক পৌত্র বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়সেনের পরাক্রমে বঙ্গদেশে পাল প্রভুত্বের অবসান হইল। বিহারে মুসলমান আক্রমণ পর্য্যন্ত পাল বংশের শাসন কোনও রকমে টিকিয়াছিল।

প্রথম মহীপালের বংশধরগণ

পালবংশের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বঃ—পালরাজগণ সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসনে বঙ্গদেশ এক সময়ে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই বংশের একজন রাজা মহোদয় বা কনৌজের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অপর একজন সুদূর সুমাত্রার রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। পালগণ উদ্দণ্ডপুর (বিহার) ও বিক্রমশিলার সংঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি

সুমাত্রার সহিত মিত্রতা

তাঁহাদের উদারতার অভাব ছিল না। পালগণ অনেক সময়েই ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিয়োগ করিতেন। বিক্রমাদিত্য, হর্ষ প্রমুখ প্রাচীন হিন্দু সম্রাট্‌গণের ন্যায় তাঁহারাও শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পালযুগেই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চক্রপাণি এবং প্রসিদ্ধ রামচরিত প্রণেতা সন্ধ্যাকরনন্দী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাংলায় নূতন শিল্পরীতির উদ্ভব হইয়াছিল। পালরাজগণের আনুকূল্যেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীস) প্রমুখ বাঙ্গালী প্রচারকেরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন।

সভ্যতা

সেনবংশ :—বিজয়সেন বঙ্গদেশে যে নূতন রাজবংশ স্থাপন করিলেন তাহা সেনবংশ নামে পরিচিত। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই বংশটি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হইতে বাংলায় আগমন করিয়াছিল। সামন্তসেন নামক এক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে ইঁহারা পশ্চিম বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন শূরবংশের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌড়ের পাল রাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি একে একে তীরভুক্তি (উত্তর বিহার), কামরূপ ও কলিঙ্গের রাজগণকে পরাভূত করেন এবং "বিজয়পুর" নামে নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র বল্লালসেন বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক। তিনি শূরবংশীয়া রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' তাঁহার রচিত দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বল্লালসেনের পরে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন রাজা হন। কাহারও মতে ১১১৯ খৃষ্টাব্দে যে লক্ষ্মণ সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল, লক্ষ্মণসেনই তাহার প্রবর্ত্তক। তিনি কাশীর রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বিজয়সেন

বল্লালসেন

কামরূপের রাজাও পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অবশেষে প্রভুত্বের চিহ্নস্বরূপ দক্ষিণ সমুদ্রতীরে তিনি একটি বিশাল জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মালিক ইখ্‌তীয়ার-উদ্দীন মহম্মদ খল্‌জী নদীয়া আক্রমণ করিলে রায় লখ্‌মনীয় বা লক্ষ্মণসেন (মতান্তরে তাঁহার পুত্র) পলায়ন করেন। কিন্তু নদীয়া হারাইবার সঙ্গেই তাঁহাদের প্রভুত্বের অবসান হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সেনবংশ পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন।

জয়দেব

মুসলমান আক্রমণ

ভোজ পরমার ও পৃথ্বীরাজ চৌহান :—প্রতিহার সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর যে সকল রাজপুত রাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, মালবের পরমার এবং আজমীর ও দিল্লীর চৌহানগণ তাহাদের মধ্যে সমধিক-প্রসিদ্ধ।

ধারা নামক স্থানে পরমার বংশের রাজধানী ছিল। এই বংশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ভোজরাজ (১০১৮-৫৫ খৃঃ)। ভোজ তুরুষ্ক আক্রমণকারীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণে কোঙ্কণ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। শকারি বিক্রমাদিত্যের পরে ভোজরাজের মত বিদ্যানুরাগী নৃপতি দেখা যায় নাই। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ, শাসননীতি, দর্শন, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও স্থাপত্য শিল্পে তাঁহার গভীর জ্ঞান সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি একটি সংস্কৃত শিক্ষায়তন স্থাপন করিয়াছিলেন। ভোজপুরের সুপ্রসিদ্ধ হ্রদ তাঁহার সময়েই খনিত

ধারার অধীশ্বর ভোজ

হইয়াছিল। চৌহান বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজের অতুল পরাক্রম, অসাধারণ বীরত্ব, একনিষ্ঠ প্রেম এবং কনৌজের গাহড়বালবংশোদ্ভব জয়চ্চন্দ্রের কন্যার সহিত পরিণয়ের অপূর্ব্ব কাহিনী তাঁহার সভাকবি চাঁদের কাব্যে অমর হইয়া আছে। যুদ্ধ-বিদ্যাতেও এই চৌহান বীরের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিকে পরাভূত করিয়া তিনি থানেশ্বরের নিকটে তরাইন্ নামক স্থানে ভারত-বিজয়লিপ্সু মুসলমান সেনানায়ক মুইজ্-উদ্দীন মহম্মদ ঘুরীকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন (১১৯১ খৃঃ)। কিন্তু মুইজ্-উদ্দীন একবারের পরাজয়ে হতোদ্যম হন নাই। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি তরাইনের রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। কিন্তু এবারে আর রাজপুতগণ মুসলমান অশ্বারোহীদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইহার পরে চৌহানগণ মধ্য ভারতে চলিয়া গেলেন এবং রন্থম্ভোরের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

তৃতীয় পৃথ্বীরাজ

তরাইনের যুদ্ধ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন হিন্দু-সাম্রাজ্যের অবসান

কল্যাণের চালুক্যগণ ঃ—উত্তর ভারত যখন অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত তখনও দক্ষিণাপথে সার্ব্বভৌম শাসন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আধুনিক নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ বা কল্যাণীর চালুক্যগণ তখনও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংহত করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা সীমান্তের আধিপত্য লইয়া চালুক্য এবং সুদূর দক্ষিণের চোলগণ ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৭ খৃঃ) চোলদিগকে পরাজিত করেন। তাঁহার সময়ে একটি নূতন সম্বৎ স্থাপিত হয়। বিক্রমাদিত্য বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। কবি বিহ্লন এবং স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্ বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহার পরে এই বংশের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। বিশাল চালুক্য সাম্রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত হইল। মহিসুরে দোরসমুদ্রের হোয়সলগণ, মহারাষ্ট্রে দেবগিরির যাদবগণ এবং তেলেগু রাজ্যে বরঙ্গলের কাকতীয়গণ প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিলেন।

চোল-চালুক্য সংঘর্ষ

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

চালুক্য প্রভুত্বের অবসান

সুদূর দক্ষিণে তাঞ্জোরের চোলগণের অভ্যুত্থান ঃ— তাঞ্জোরের চোলগণ কল্যাণের চালুক্যগণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই বংশের নৃপগণ প্রায় সমুদয় মাদ্রাজ প্রদেশ ও মহিসুর পর্য্যন্ত

প্রভুত্ব বিস্তার করেন। বিশাল নৌবাহিনীর সাহায্যে তাঁহারা সিংহল ও ভারত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপও জয় করিয়াছিলেন। প্রথম রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূল জয় করিয়া "গঙ্গই কোণ্ড" (গঙ্গাবিজয়ী) উপাধি ধারণ করেন।

উড়িষ্যা ঃ—দক্ষিণাপথের পূর্ব্ব উপকূলে চোলরাজগণের আধিপত্য বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই গঙ্গবংশোদ্ভব অনন্তবর্ম্মন্ চোড়গঙ্গ

চোড়গঙ্গ

(১০৭৮-১১৪৮ খৃঃ) গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও বদান্যতা সুপ্রসিদ্ধ। পুরীধামের ভুবনবিখ্যাত

জগন্নাথের মন্দির

জগন্নাথের মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁহার আদেশেই আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রারব্ধ কার্য্য সম্ভবতঃ তাঁহার প্রপৌত্রের সময়ে শেষ হয়।

গঙ্গবংশের শেষ যুগ

বাংলার সেনবংশ ও মুসলমান শাসকগণের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে চোড়-গঙ্গের বংশধরগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হিন্দুদিগের সামুদ্রিক অভিযান ও উপনিবেশ স্থাপন

প্রাচীন যুগের সামুদ্রিক অভিযান ও নবদেশ আবিষ্কার :— বহুকাল ধরিয়া সমুদ্রপথে ভারতীয় সভ্যতা ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব দূর দূরান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আদি বৈদিকযুগে আর্য্যগণ সাগরের পথে ব্যবসা ও বাণিজ্য করিতেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থগুলির রচনা কালে ভারতীয় বণিক্ ও পর্য্যটকগণ যে পশ্চিমে ব্যাবিলোন ও পূর্ব্বদিকে মলয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন স্থানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রামায়ণে সপ্তরাজ্যোপশোভিত যবদ্বীপ এবং সুবর্ণাকর-মণ্ডিত সুবর্ণদ্বীপ ও রূপ্যকদ্বীপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যবদ্বীপ ও সুবর্ণদ্বীপ বর্ত্তমান সময়ে জাভা ও সুমাত্রা নামে পরিচিত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে রূপ্যকদ্বীপ বলিতে জাভার অংশবিশেষ বুঝাইত। পুরাণ সাহিত্যে ভারতবর্ষের নববিভাগের মধ্যে সিংহল ও প্রাচ্য উপদ্বীপের 'কটাহ' নামক প্রদেশের নাম আছে। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রাচীন কালে ঐ সকল ভূখণ্ডের সহিত ভারতীয় হিন্দুগণ পরিচিত হইয়াছিলেন।

বাবেরু বা ব্যাবিলোন

যবদ্বীপ ও সুবর্ণদ্বীপ

সিংহল ও কটাহ

হিন্দু প্রভাব বিস্তার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা :— প্রয়াগের সুবিখ্যাত প্রশস্তিকার হরিষেণ লিখিয়া গিয়াছেন যে সিংহলপতি এবং অন্যান্য বহু দ্বীপবাসী রাজন্যবর্গ সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের অপ্রতিহত প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে গুপ্ত সম্রাট্গণের

সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব

আমলের বহু পূর্ব্বে তাম্রপর্ণী বা সিংহল এবং সুবর্ণভূমি বা এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত বিশাল জনপদে ভারতের ক্ষত্রশক্তি ও ধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম ও বাণিজ্য বিস্তার

খৃষ্টের জন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে রচিত কয়েকখানি ভারতীয় ও বিদেশী পুস্তকে সমুদ্রপথে রোমক ও চীন সাম্রাজ্য এবং মলয় উপকূল ও তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবাসীর বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। যবনভূতত্ত্ববিদ্ টলেমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে যবদ্বীপের সংস্কৃত নাম উল্লেখ করিয়া এতদ্দেশে হিন্দু প্রভাবের আভাস প্রদান করিয়াছেন। প্রায় এই সময়েই ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীন দেশের অন্তর্গত চম্পা ও কম্বুজ জনপদে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। যে সকল প্রধান প্রধান বন্দর হইতে বড় বড় জাহাজ ব্যাবিলোন, মিশর, মলয়, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি অঞ্চলে গমনাগমন করিত, তন্মধ্যে পশ্চিম ভারতের উপকূলস্থিত ভৃগুকচ্ছ, শূর্পারক ও মুরচীপত্তন এবং পূর্ব্বোপকূলস্থিত কাবেরীপত্তন, দন্তপুর বা পালূরু ও তাম্রলিপ্তি বা তমলুক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুরাজ্য স্থাপন

মলয় দ্বীপপুঞ্জের রাজবংশের সহিত মিত্রতা ও দ্বন্দ্ব :— নবম শতাব্দীতে বাংলার পালরাজগণ সুবর্ণদ্বীপ ও যবভূমি অর্থাৎ সুমাত্রা ও জাভার "শৈলেন্দ্র" নামক বিখ্যাত নৃপবংশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশ ও যবভূমি

একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতীয় চোলরাজগণের বিরাট নৌ-বাহিনী শৈলেন্দ্র বংশের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ভারতমহাসাগরের প্রান্তস্থিত বহু দ্বীপ ও উপদ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। এই বিজয়বাহিনী পূর্ব্ব উপদ্বীপের অন্তর্গত কডারম্ (কটাহ) এবং তক্কোলম ও সুমাত্রা দ্বীপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। চোলরাজ বংশের ন্যায় পাণ্ড্যদেশের নরপতিগণও

সমুদ্রপথে চোল রাজ্যবিস্তার

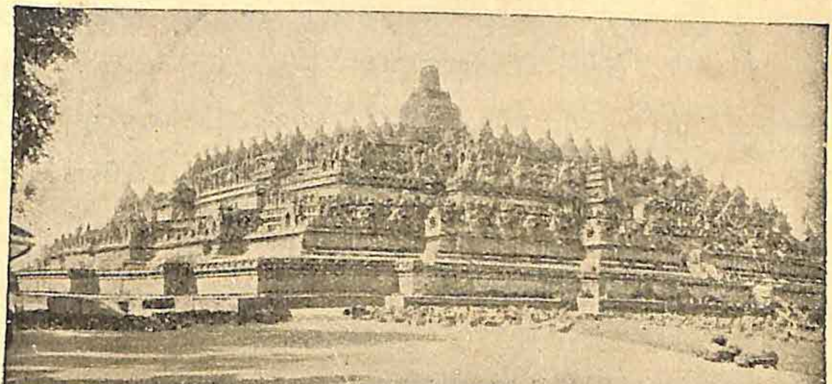
মলয় ও যবভূমির নৃপবৃন্দের সহিত মধ্যে মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন।

পাণ্ড্যদেশের বাণিজ্য

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাম্রপর্ণী নদীর মোহানার নিকটস্থ পাণ্ড্যদের কায়ল বন্দর প্রাচ্যের এক প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। এখান হইতে পণ্য বোঝাই করিয়া বহু বাণিজ্য-তরণী জগতের নানাদেশে যাতায়াত করিত।

বোরোবুদুর

হিন্দু উপনিবেশে ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন :—চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েনের সময় যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। বোরোবুদুরের বিশাল মন্দির ও তাহার ভগ্নাবশেষ শাক্যমুনি-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের স্মৃতি-চিহ্ন বহন করিয়া অদ্যাপি দর্শকগণের নয়নে তৃপ্তি জন্মাইতেছে। শাক্যমতাবলম্বিগণ শিল্পকলায়

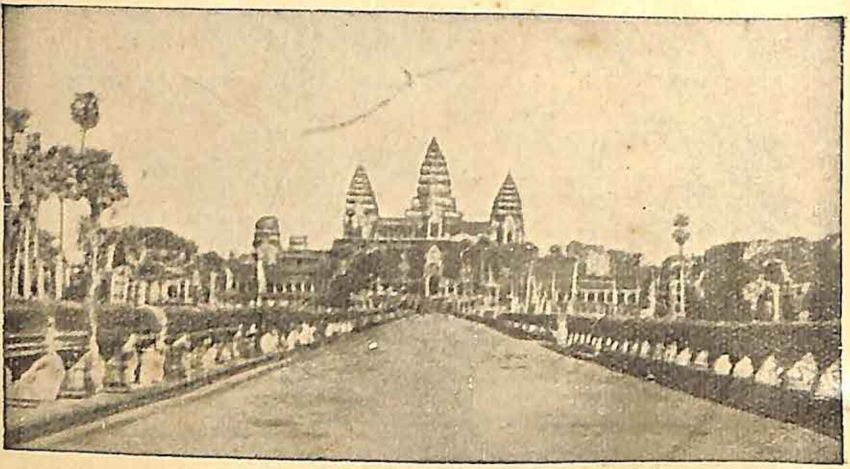


বোরোবুদুর

যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, মন্দিরের মূর্ত্তিগুলিই তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়। যবদ্বীপের উত্তরস্থিত মহাসাগরের পারে ফরাসী ইন্দো-

চীনের অন্তর্গত চম্পা ও কম্বুজ বা কাম্বোডিয়া প্রদেশেও হিন্দু সভ্যতার অনেক নিদর্শন এখনও পরিলক্ষিত হয়। কাম্বোডিয়ার অন্তর্গত অঙ্কোরবাতের বিশাল

অঙ্কোরবাত



অঙ্কোরবাত

মন্দির প্রাচ্য উপদ্বীপে হিন্দুধর্ম্মের অতীত কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর একখানি লিপিতে একটি মন্দিরে রামায়ণ, পুরাণ ও "অশেষ" মহাভারত পাঠের জন্য ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়।

উপনিবেশে ইতিহাস পুরাণচর্চ্চা

পঞ্চদশ অধ্যায়

গুপ্তযুগের পরবর্ত্তী হিন্দু সভ্যতা

জাতি

সমাজ :—গুপ্ত সাম্রাজ্য-পতনের পরে কয়েক শতাব্দী মধ্যেই হিন্দুর সামাজিক বিধানে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রভাব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিও পাইয়াছিল বটে, কিন্তু পুরাতন ক্ষত্রিয় সমাজ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। রাজপুতগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস রাজপুতগণেরই শৌর্য্য ও বীরত্বের ইতিহাস।

রাজপুতগণ

এই রাজপুতগণ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। ইঁহাদের মধ্যে চন্দেল্ল প্রভৃতি অনেক বংশের উদ্ভব হয়তো ভারতের অভ্যন্তরেই হইয়াছিল, আবার অনেকের দেহে হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির রক্তের সম্পর্ক ছিল। যে সকল বৈদেশিক জাতি হিন্দুদের সহিত মিশিয়া গিয়া নানাস্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়া রাজপুত নামে সম্মানিত হইতেন ; কিন্তু সাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত হীন জাতি বলিয়াই পরিগণিত হইত। এই যুগে স্মৃতি নিবন্ধকারগণ ও বল্লালসেন প্রমুখ নৃপবৃন্দ জাতি ও বর্ণের সামাজিক বিভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত বিধি প্রণয়ন করেন।

কৌলীন্য

বাংলায় কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া বল্লালসেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ নূতনভাবে সংগঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তখন বিবাহের নিয়ম পদ্ধতি এখনকার মতো দুর্লঙ্ঘ্য ও কঠোর হয় নাই। বিদেশী আগন্তুকগণের সহিত এদেশীয় লোকের বিবাহ

নিষিদ্ধ ছিল না। বেদপুরাণমার্গাবলম্বী হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বিবাহের বাধা ছিল না। সেই সময়কার উৎকীর্ণ লিপিতে এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের অনেক উদাহরণ উল্লিখিত আছে।

বিবাহ

সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অল্‌বীরুণী হিন্দুযুগের শেষভাগে গজনীর সুলতান মামুদের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বিবরণে দেখা যায়, বিদেশীয় আগন্তুকগণের প্রতি হিন্দুদের পূর্ব্বের মত উদার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছ বা অপবিত্র বলিয়া অভিহিত করিতেন। কেহ তাঁহাদের সহিত মিশিতে চাহিলে অথবা তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহিলেও তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতেন না। এই চিত্র একটু অতিরঞ্জিত বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুরা হয়ত তুরুস্কদিগকেই বিশেষভাবে শত্রু বলিয়া মনে করিতেন এবং এরূপ মনে করার কারণও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইবন হৌকল ও অল্ ইস্তখ্রীর বিবরণ অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, কয়েকজন হিন্দু রাজা মুসলমানদের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। গুজরাটের অন্তর্গত অন্‌হিলবারের একজন বাঘেলা-রাজা জনৈক মুসলমান নাবিককে তাঁহার রাজ্যমধ্যে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলেন এবং উহা রক্ষার জন্য বহু অর্থ প্রদান করেন। ভেনিস্ দেশীয় পর্য্যটক মার্কো পোলো বিদেশী ভ্রমণকারীদের প্রতি কায়লের পাণ্ড্যরাজার উদারতা ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্যই বহু বিদেশী বণিক্ ও পর্য্যটক পাণ্ড্যরাজ্যে আগমন করিতেন।

হিন্দু ও বিদেশীয়গণ

নারীর স্থান ঃ—নারী জাতি তখন সমাজে সাতিশয় সম্মান লাভ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজ্ঞী, সেনানায়িকা অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্রীরূপে কার্য্য করিয়াছেন। সেই সময়কার বিবরণে

দেখা যায়, তাঁহারা সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, প্রকাশ্যে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষেও তাঁহারা তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। সমাজে বাল্যবিবাহ ক্রমেই বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল এবং বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য বলিয়া গৃহীত হইত। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে হয় চিরবৈধব্য গ্রহণ করিতে হইত, না হয় অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া জীবনের সকল জ্বালা জুড়াইতে হইত।

ধর্ম্ম :—এই সময় নানাপ্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতেছিল এবং জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মও প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিল। সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কমিয়া গেলেও একেবারে লোপ হয় নাই। রাজা হর্ষ শেষ বয়সে এই ধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু যশোবর্ম্মন্ ও কনৌজের পরবর্ত্তী অন্যান্য রাজগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় মধ্যদেশ বা গঙ্গা-যমুনা বিধৌত প্রদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয়। বঙ্গদেশে পালগণের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেনদিগের রাজত্বকালে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ প্রভাব বিলীন হইয়া যায়। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদের আক্রমণের ফলে মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ শিখাটুকু নিবিয়া গেল।

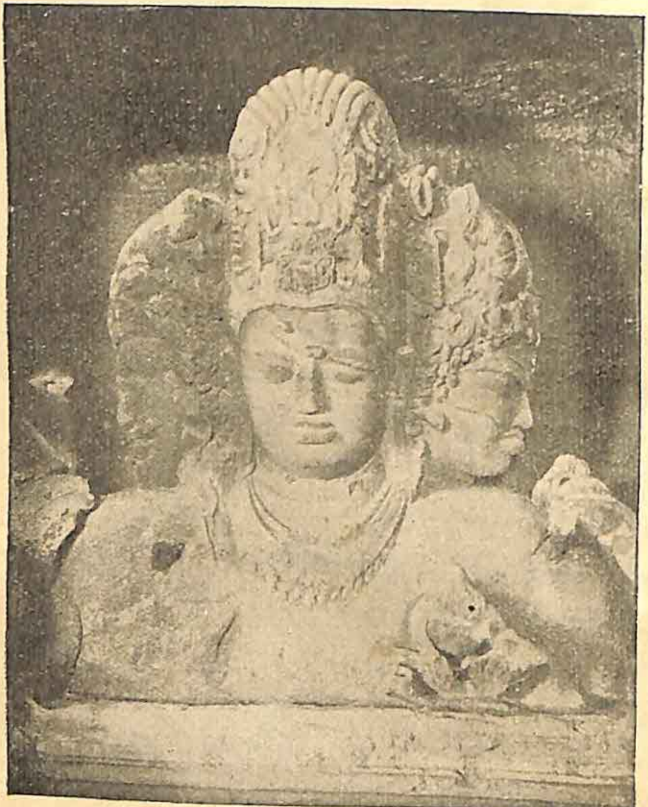
বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধান

এই যুগে কর্ণাট ও গুজরাট প্রদেশে জৈনধর্ম্মোপাসনা প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু মহিসুর রাজ্য ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে যখন রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং কর্ণাটরাজের মন্ত্রী বসব-প্রতিষ্ঠিত বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠিল, তখন আর জৈনধর্ম্মের প্রাধান্য রহিল না। তথাপি গুজরাটের রাজা ও অমাত্যগণের আনুকূল্যে পশ্চিম ভারতে এই ধর্ম্মের প্রতিপত্তি রক্ষিত হইল। গির্ণার, পলিতান ও আবু পর্ব্বত্যের সুরম্য জৈন মন্দিরগুলি জৈনগণের ধর্ম্মানুরাগ ও জিনভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন।

জৈনধর্ম্মের অবস্থা

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও বিস্তৃতিই এই যুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিশেষত্ব। এ সময়ে পুরাণ-কীর্ত্তিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ত্রিমূর্ত্তিধর ভগবানের উপাসনা লোকচিত্ত আকর্ষণ করে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা

হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তার



ত্রিমূর্ত্তি বা মহেশ্বরমূর্ত্তি

এবং শিব বা রুদ্র সংহারকর্ত্তারূপে পূজিত হইতেন। বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অবতারগণের উপাসনাও এই সময় দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ স্বয়ং ভূমণ্ডলে নর বা মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণীরূপে আবির্ভূত হন—এই ধর্ম্মবিশ্বাসই অবতারবাদের মূল ভিত্তি। স্বয়ং বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া দেববর্গে স্থান পাইলেন। বিষ্ণু, শিব ও পৌরাণিক যুগের অন্যান্য দেবতা ও অবতারগণের উদ্দেশে বহু সুন্দর দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা অপেক্ষা একনিষ্ঠভাবে বিষ্ণু, শিব, শক্তি (দুর্গা) অথবা সূর্য্যের ঐকান্তিক উপাসনা কল্যাণপ্রদ বলিয়া মনে করিতেন; অন্যান্য দেবদেবীকে একেবারে অবিশ্বাস না করিলেও তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজ ইষ্টদেবতার নিম্নে স্থান দিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থও স্বতন্ত্র ছিল। আগম, সংহিতা, তন্ত্র প্রভৃতি এই একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক সম্প্রদায়গুলির ধর্ম্মগ্রন্থ।

ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারক:—এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের এত প্রাধান্যের একটি কারণ শৈব ও বৈষ্ণব ভক্ত আচার্য্যগণের অভ্যুত্থান। মীমাংসকশ্রেষ্ঠ কুমারিল ভট্ট বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ও নিয়ম-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন।

কুমারিল

শঙ্করাচার্য্য:—ইহার পরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি মালবারের অন্তর্গত কালদি গ্রামের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্তের ভাষ্য রচনায় তিনি অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাচার্য্যরূপে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া এই মহাপুরুষ বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের সহিত যুক্তি তর্ক ও আলোচনা দ্বারা স্বীয় মতের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করেন। ভারতের

নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত বহু মঠ আজিও আচার্য্য শঙ্করের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে মহিশুরের শৃঙ্গেরী মঠই সর্ব্বপ্রধান। উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী, কাঠিয়াবাড়স্থিত দ্বারকা ও হিমালয়স্থিত বদরিকাশ্রমের শঙ্করমঠগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, বত্রিশ অথবা আটত্রিশ বৎসর বয়সে হিমালয়ের অন্তর্গত কেদারনাথে এই মহাপুরুষ দেহ ত্যাগ করেন। তিনি যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার মূলমন্ত্র ছিল ব্রহ্ম সত্য এবং অদ্বিতীয়, অর্থাৎ তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। তিনিই সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা। জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মায়াপ্রভাবেই পরব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে।



বিষ্ণু

রামানুজ:—কিন্তু মায়াবাদ সকল শ্রেণীর ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতে পারিল না, সুতরাং শীঘ্রই আর একজন ধর্ম্ম-প্রচারকের অভ্যুত্থান হইল। তিনি ভক্তিকেই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বা নারায়ণ তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা

ছিলেন। ভারতবর্ষের এই ভক্তিবাদ-প্রচারকের নাম রামানুজ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মাদ্রাজের নিকটে শ্রীপেরুম্বুদুরের এক ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গমই তাঁহার প্রধান বাসস্থান ছিল। কিছুকাল পরে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাকে হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের (১১০৬-৪১ খৃঃ) রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গমে তাঁহার মৃত্যু হয়। আলবার সংজ্ঞক বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই আচার্য্য রামানুজ ভক্তিধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ শ্রীবৈষ্ণব নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রীয় বিভাগ

শাসন-প্রণালী :—গুপ্ত রাজত্বকালে যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তৎপরবর্ত্তী যুগের শাসন-প্রণালীর সহিত তাহার মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই। গ্রামপতি বা মোড়ল গ্রাম শাসন করিতেন। কতকগুলি গ্রাম লইয়া বিষয় বা জিলা গঠিত হইত। বিষয়ের শাসনকর্ত্তা বিষয়পতি নামে অভিহিত হইতেন। কতকগুলি 'বিষয়' একত্রে 'ভুক্তি', 'দেশ' এবং কোন কোন অঞ্চলে 'মণ্ডল' আখ্যা লাভ করিত। সে যুগে সাধারণতঃ এইগুলিই সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল। ভুক্তির শাসককে সাধারণতঃ 'উপরিক' বলা হইত এবং দেশ বা মণ্ডলাধিপতির উপাধি ছিল মহাসামন্ত বা মহামণ্ডলেশ্বর। কেন্দ্রস্থিত রাজশক্তি দুর্ব্বল অথবা শিথিল হইয়া পড়িলে বিষয়পতি, উপরিক ও মহামণ্ডলেশ্বরগণ 'রাজা' উপাধি ধারণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। সীমান্তপ্রদেশগুলির শাসনভার অনেক সময় মহাসেনাপতি বা মহাদণ্ডনায়ক উপাধিযুক্ত যোদ্ধপুরুষগণের হস্তে ন্যস্ত করা হইত। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিলেন। সান্ধি-বিগ্রহিক অর্থাৎ সন্ধি স্থাপন, যুদ্ধ ঘোষণা প্রভৃতি বিষয়ে

পরামর্শদাতা, অক্ষপটলিক বা দলিল রক্ষক প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ রাজা ও শাসকগণের রাজ্যশাসনে সহায়তা করিতেন। জিলার কর্ম্মচারিগণ নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কায়স্থ অর্থাৎ প্রধান লেখক প্রমুখ স্থানীয় গণ্যমান্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্য লইতেন। দক্ষিণ ভারতে এই সময় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পদ্ধতি অতীব উৎকৃষ্ট ছিল। কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি "কূর্‌রম্" সংগঠিত হইত এবং প্রত্যেক "কূর্‌রম্" একটি মহাসভার সহায়তায় শাসনকার্য্য পরিচালন করিত।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

অর্থ-নৈতিক অবস্থা :—প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ প্রাচুর্য্য সম্পদে সমৃদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। উর্ব্বর জমির প্রচুর শস্যে লোক সকল সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিত। বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা দূর দেশের ধনসম্পদ্ এদেশে আসিত। ভারতের এই অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়াই বহিঃস্থিত অনুর্ব্বর ভূখণ্ডের জাতিসমূহ একে একে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজগণ সাধারণতঃ প্রজাদিগকে নিজ পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন, কিন্তু কেহ কেহ অত্যধিক করভারে প্রজাদিগকে প্রপীড়িত করিয়া রাজগৌরবে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টির ফলে দেশে অজন্মা হইত এবং তাহার ফলে রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কহ্লণ-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী ও দণ্ডী প্রণীত দশকুমারচরিত পুস্তকদ্বয়ে এই আকস্মিক দুর্ব্বিপাকের কাহিনী জলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকার নৈসর্গিক বিপৎপাতের নিবারণকল্পে হিন্দু সম্রাট্‌গণের এক একটি পূর্ত্ত বিভাগ ছিল। কহ্লণের পুস্তকে কাশ্মীর নরপতি অবন্তি-বর্ম্মার

ভারতের ঐশ্বর্য্য

দুর্ভিক্ষ

রাজত্ব সময়ে জলসেচন ও পয়ঃপ্রণালীর নির্ম্মাণের কথার উল্লেখ আছে। পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী সুয্যের চেষ্টাতেই এই সকল সদনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের চোল রাজগণও জলসেচনের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

জলসেচন

সাহিত্য ও বিজ্ঞান :—যাঁহারা ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে গুপ্তসাম্রাজ্যের যুগে সাহিত্য ও শিল্পে হিন্দু প্রতিভার চরম বিকাশ হইয়াছিল, কিন্তু অনেকে পরবর্ত্তী যুগকে অবনতির যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গুপ্তগণের পরবর্ত্তী কালেও সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনাদৃত হয় নাই। এই যুগেই ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণ মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া অমর হইয়াছেন। নাট্যকাব্যে ভবভূতির প্রতিভা কোন কোন বিষয়ে কবিগুরু কালিদাসের প্রতিভাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশীর ন্যায় কমনীয়তা ও মনোহারিত্ব না থাকিলেও ভবভূতির গ্রন্থের অশ্রু-করুণ অধ্যায়গুলি সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়। হর্ষ, মহেন্দ্রবর্ম্মন্, রাজশেখর, কৃষ্ণমিশ্র প্রভৃতি আরও ছোট বড় অনেক লেখক নাট্যকাব্য প্রণয়ন করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের কোকিল কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের সুমধুর পদাবলী রচনা করেন। ভর্তৃহরির গীতিকাব্যগুলিও গুপ্তোত্তর যুগের রচনা। তখন গদ্য লেখকেরও অভাব ছিল না। সুবন্ধু, বাণ ও দণ্ডী গদ্য সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 'পঞ্চতন্ত্রে'র অভিনব সংস্করণ এই যুগেই সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। পূর্ব্বে ঐতিহাসিক গ্রন্থের লেখক ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে একাধিক গ্রন্থকার সমসাময়িক ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে হর্ষচরিত প্রণেতা বাণ,

সংস্কৃত সাহিত্য

কাশ্মীরের রাজগণের কাহিনী সম্বলিত রাজতরঙ্গিণী রচয়িতা কহ্লণ, বিক্রমাঙ্কচরিত প্রণেতা কবি বিহ্লণ ও রামচরিত লেখক সন্ধ্যাকর নন্দীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশীয় ভাষাতেও বহু গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। লুইপাদ নামক একজন কবি প্রাচীন বাংলায় "চর্য্যা" নামক কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। "পৃথ্বীরাজ রাইসা" এর কবি চাঁদ বরদাই, ভগবদ্গীতার মরাঠা টীকাকার জ্ঞানেশ্বর, তমিল তিরুবাসহম্ রচয়িতা মাণিক্ক বসহর এবং কানাড়া মহাভারত প্রণেতা পম্পার নামও উল্লেখযোগ্য।

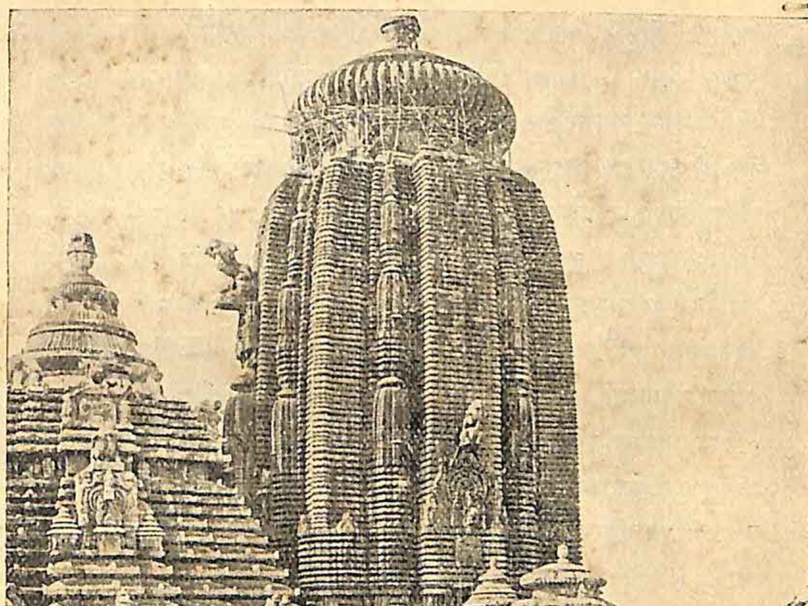
দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য

দার্শনিক ভাষ্যকার কুমারিল, শঙ্কর, বাচস্পতি মিশ্র ও রামানুজের প্রতিভা এই যুগেই বিকশিত হইয়াছিল। বাগ্‌ভট ও চক্রপাণি চিকিৎসাশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র গ্রন্থকার ভাস্করাচার্য্যের নাম চিরস্মরণীয়। 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' ব্যতীত আর কোন গ্রন্থই ভারতবর্ষে সিদ্ধান্ত শিরোমণির ন্যায় সমাদর লাভ করে নাই। চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর অভিলষিতার্থ চিন্তামণি বা মানসোল্লাস নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহাতে শাসন-প্রণালী, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, অলঙ্কার, কাব্য, ভৈষজ্য (ঔষধ), রসায়ন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্যবিদ্যা এবং অন্যান্য নানা বিষয়ক আলোচনা আছে। সোমেশ্বরের ন্যায় ধারেশ্বর ভোজরাজও বহু বিদ্যাবিশারদ ছিলেন।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক

শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যা :—গুপ্তগণের পরবর্ত্তী যুগে পল্লব রাজগণ সুদূর দক্ষিণ ভারতে পাষাণ নির্ম্মিত দেবমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মামল্লপুরমের প্রস্তর নির্ম্মিত বহু মন্দির পুলকেশীর দর্পহন্তা

স্থাপত্য বিদ্যা



লিঙ্গরাজের মন্দির, ভুবনেশ্বর

সিন্ধুদেশের আরব শাসনঃ—মুসলমান আমলে সিন্ধুর হিন্দু অধিবাসিগণের বিশেষ কোনই অসুবিধা হয় নাই। রাজার পরিবর্ত্তনে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় নাই। হিন্দুরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের ধর্ম্মাচরণ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। আরব পণ্ডিতগণের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু আরবেরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন নাই। তুর্কী জাতীয় মুসলমানেরাই গজনী ও কাবুলের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে উত্তরাপথের সমতল প্রান্তরে ইস্‌লামের বিজয় বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছিলেন। আরবদিগের মত তাঁহারা বিজিত শত্রুর প্রতি দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই।

গজনীরাজ্যঃ—সম্ভবতঃ ৯৬২ খৃষ্টাব্দে অল্‌প্তিগীন নামক একজন তুর্কী যোদ্ধা গজনীরাজ্য স্থাপন করেন। অল্‌প্তিগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা ও ক্রীতদাস সুবুক্তিগীন গজনীর রাজা হইলেন।

সুবুক্তিগীন ও জয়পালঃ—সেকালে বর্ত্তমান ভারতের রাজ্যসীমা একালের সীমান্ত প্রদেশের বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আধুনিক আফ্‌গানিস্থানের কতকাংশ এবং পঞ্জাব প্রদেশ একজন হিন্দু রাজার অধীনে শাসিত হইত। সিন্ধুতীরে উদভাণ্ডপুর বা বর্ত্তমান উন্দ নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন জয়পাল। গজনীতে একটি নূতন রাজ্য স্থাপিত হইলে জয়পাল নিজ রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার মুসলমান প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী হিন্দুরাজার প্রতি বিমুখ হইলেন। তাই সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্ত্তী একটি বিস্তৃত অংশ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে সন্ধি করিতে হইল। সুবুক্তিগীনের সেনাবাহিনী কখনও সিন্ধু পার হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য

সুবুক্তিগীনের প্রথম সাফল্য



মধ্যযুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ

পুত্র মামুদ এই যুদ্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ফলেই উত্তর কালে তাঁহার উত্তরাপথ অভিযান জয়যুক্ত হইয়াছিল।

স্থলতান মামুদ :—৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সুবুক্তিগীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মামুদ কিছুকাল পরে পিতৃরাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি সর্ব্বপ্রথম ভারত আক্রমণ করিলেন।



গজনীর মামুদ

মামুদের আক্রমণ-কাহিনী চিত্তাকর্ষক হইলেও তাহার প্রচলিত বিবরণ সম্পূর্ণনিরপেক্ষ নহে। তিনি কতবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সুযোগ পাইলেই তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেন, এবং এইভাবে উত্তর ভারতের বহু জনপদ তৎকর্ত্তৃক বহুবার উপদ্রুত হইয়াছে। আক্রান্ত প্রদেশের নগর ও পল্লী দগ্ধ ও লুণ্ঠন করিয়া

তিনি তথাকার ধন-সম্পদ্ সংগ্রহ করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতেন। সেকালে তাঁহার মত দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ভারতবর্ষে ছিল না। কিন্তু পঞ্জাবের কয়েকটি জিলা, উন্দের হিন্দুরাজ্য ও মূলতানের মুসলমান রাজ্য ব্যতীত আর কোন জনপদ তিনি স্থায়ীভাবে অধিকার করেন নাই। রাজ্য জয় করা অপেক্ষা লুণ্ঠনকার্য্য অনেক সহজ। মামুদ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে চাহেন নাই। এদেশের বিপুল ধন-সম্পদ্ হস্তগত করাই তাঁহার অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্ত্তীকালের মুসলমান বিজেতাদিগের তিনিই পথ-প্রদর্শক।

মামুদের ভারত আক্রমণের স্বরূপ

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর জনৈক মুসলমান লেখক বলেন, সুবুক্তিগীনের মৃত্যুর পরে মামুদ যখন গৃহ-বিবাদে বিব্রত, সেই সময় জয়পাল তাঁহার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে মামুদ তাঁহার হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হন। পেশোয়ারের নিকটে উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয় এবং রাজা জয়পাল পরাজিত হইয়া মামুদের হস্তে বন্দী হন। জয়পাল ক্ষতিপূরণস্বরূপ বহু অর্থ ও রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ইহার পর আর তাঁহার জীবন ধারণে স্পৃহা রহিল না। পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

পেশোয়ারের যুদ্ধ ও জয়পালের পরাভব

জয়পালের মৃত্যুতে যুদ্ধের অবসান হইল না। একজন মুসলমান লেখক বলেন, ইহার পরে জয়পালের পুত্র আনন্দপাল বুঝিয়াছিলেন যে গজনীর পরাক্রান্ত সুলতানের গতিরোধ করা তাঁহার একার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিবেশী হিন্দু নরপতিদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ

করিলেন। ১০০৮ খৃষ্টাব্দে উন্দের নিকটে সুলতান মামুদের সহিত সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ছিল। অবশেষে মামুদের দুর্দ্ধর্ষ সেনাদল হিন্দুবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ইহার পর মামুদ ভীমনগর আক্রমণ করেন এবং অগণিত ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রাচীন রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইয়া আনন্দপাল পূর্ব্বদিকে নন্দন নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এইখান হইতে তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল ও পৌত্র 'নিডর' ভীমপাল বহুদিন পর্য্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১০১৪ খৃষ্টাব্দে নন্দন দুর্গ মামুদ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১০২১-২২ খৃষ্টাব্দে ত্রিলোচনপাল নিহত হইলে 'নিডর' ভীমপাল রাজা হন। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে উন্দের রাজবংশ লুপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এই সময় গজনীর সুলতান এই হিন্দুরাজ্যটি সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্ব্বে ১০১০ খৃষ্টাব্দে মূলতান অধিকৃত হয়।

উন্দের যুদ্ধ

মামুদ কর্ত্তৃক উন্দ রাজ্য ও মূলতান অধিকার

মামুদ তাঁহার সময়কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ধর্ম্মোৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ করিত। মামুদের অভিযানকে তাহারা বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মসংগ্রাম বলিয়া মনে করিত। ওদিকে হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষ ঐক্য ছিল না। বিপদের সময়েও তাহারা বাদবিসম্বাদ ভুলিয়া একত্র হইতে পারে নাই। আনন্দ-পালকে অনেক সময়েই তাঁহার হিন্দু প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। বুলন্দশহর, কনৌজ ও কালিঞ্জরের রাজাদিগকেও মামুদের

হিন্দু পরাজয়ের কারণ ঐক্যের অভাব

আক্রমণে বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে কখনই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করেন নাই।

মামুদ ভারতের তীর্থস্থানগুলিকে ধনরত্নের ভাণ্ডার বলিয়া মনে করিতেন। ভীমনগর লুণ্ঠনের পরে ১০১৪ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বর ও ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মথুরা লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁহার সকল অভিযানের মধ্যে সোমনাথ আক্রমণই (১০২৬ খৃঃ) সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মামুদ এক সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী সহ রাজপুতানার মরুভূমির মধ্য দিয়া সোমনাথ অভিমুখে অগ্রসর হন। গুজরাটরাজ প্রথম ভীমদেব তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। ১০২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মুসলমানগণ সোমনাথে উপস্থিত হইলেন। প্রথম দিন মামুদের সৈন্যগণ দেবালয় অধিকার করিতে পারিল না; কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তাহারা সোমনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিল। হাজার হাজার হিন্দু উপাসক নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল এবং মন্দিরের শিবলিঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল।

সোমনাথ লুণ্ঠন

মামুদ এই মন্দির হইতে প্রায় দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া গিয়াছিলেন। পরবৎসর তিনি জাঠদিগকে দমন করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাই ভারতবর্ষে তাঁহার সর্ব্বশেষ অভিযান। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মামুদের বংশধরগণ তাঁহার ন্যায় সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পঞ্চনদের রাজ্যখণ্ড বহুদিন অধিকারে থাকিলেও তাঁহারা ভারতে মুসলমান শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। এদেশে মুস্‌লিম সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ঘুরের রাজবংশের এক বীর-পুরুষ। তাঁহার নাম শিহাব্‌উদ্দীন বা মুইজউদ্দীন মহম্মদ বিন্‌সাম।

সুলতান মামুদ যে কেবল বিজেতা হিসাবেই খুব বড় ছিলেন তাহা

নহে, তাঁহার শিক্ষানুরাগও স্মরণীয়। গজনী নগরীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

মামুদের শিক্ষানুরাগ

রাজধানীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তিনি বহু অর্থ প্রদান করেন। "শাহনামা" রচয়িতা ফারদৌসী তাঁহারই অন্যতম সভাকবি ছিলেন। কিন্তু ফারদৌসী অপেক্ষাও আবুরিহান বা আলুবীরুণীর নাম অধিক উল্লেখযোগ্য। এই মনীষী মামুদের সহিত ভারতে আগমন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও গণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এখনও ঐতিহাসিকগণ তাহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মহম্মদ ঘুরী :—পারস্যের পূর্ব্বদিকে সেকালে ঘুর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই রাজ্যটি প্রথমে গজনীর অধীনে ছিল, কিন্তু তথাকার নগণ্য রাজারা ধীরে ধীরে বল সঞ্চয় করিয়া একদিন

ঘুর রাজ্যের অভ্যুদয়

গজনীর প্রাধান্য অস্বীকার করিলেন। তাঁহাদের আক্রমণে মামুদের বংশধরগণ বিব্রত হইয়া গজনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহারা নিরাপদে থাকিতে পারিলেন না। সুলতান মামুদের বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঘুরের অধিনায়ক অবশেষে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

ঘুর-নায়ক শিহাব্উদ্দীন বা মুইজউদ্দীন মহম্মদ বিন্‌সাম, মহম্মদ ঘুরী নামেই অধিক পরিচিত। ভারতীয় অভিযান আরম্ভের সময়ে তিনি ঘুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি

গজনীর মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর তুলনা

তাঁহার ভ্রাতা সুলতান গিয়াসুদ্দীনের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং ঘুরের সৈন্যদল পরিচালন-ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। সেনাপতি

হিসাবে মহম্মদ ঘুরী সুলতান মামুদের সমকক্ষ ছিলেন না। সকল যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। সাহস ও শৌর্য্য দ্বারা সাফল্য লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি ছলনা ও কৌশল অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু অর্থাহরণই মামুদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আর মহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

মহম্মদের প্রথম সাফল্য

ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তিনি মূলতানের মুসলমান রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুজরাট আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গজনীর রাজবংশের শেষ সুলতানকে বন্দী করিয়া লাহোর দখল করিয়াছিলেন। লাহোর অধিকারের পর উত্তর ভারতে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন হিন্দুবীর তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজ আজমীর ও দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন।

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে বহু রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। উত্তর ভারতের অনেক প্রদেশেই রাজপুত রাজারা রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আজমীর ও দিল্লীর চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ এবং কাশী ও কনৌজের গাহড়বালরাজ জয়চ্চন্দ্র বা জয়চাঁদই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক কনৌজরাজকন্যা সংযুক্তা হরণের কাহিনী ভাট কবিগণ এখনও গাহিয়া থাকেন। এই ঘটনা হইতে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের পরম শত্রু হইলেন, মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময়ও তিনি তাঁহার এই অপমানের কথা ভুলিতে পারেন নাই।

তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ

পৃথ্বীরাজের সাহস বা শৌর্য্যের অভাব ছিল না। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে (থানেশ্বরের নিকটে) তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরীর সৈন্যদল পৃথ্বীরাজের নিকটে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু পর বৎসর ভাগ্যলক্ষ্মী রাজপুত রাজার প্রতি বিরূপ হইলেন। তরাইনের

দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়া নিহত হইলেন। ১১৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন অইবক দিল্লী অধিকার করিলেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কনৌজের জয়চাঁদ ইটাবা জিলার চন্দবার নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত হন। তিন বৎসর পরে কুতবুদ্দীন গুজরাটের দ্বিতীয় ভীমদেবকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজধানীতে প্রবেশ করেন। ইহার এক শত বৎসর পরে গুজরাট মুসলমানগণ কর্ত্তৃক স্থায়ীভাবে অধিকৃত হইয়াছিল। ১২০২ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন কালিঞ্জর অধিকার করেন। এইরূপে হিন্দুস্থানের এক বিস্তৃত অংশে মুসলমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ বিজয়

এদিকে মহম্মদের একজন অনুচরের প্রতাপে বিহার ও বঙ্গদেশ ঘুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। মহম্মদের সহিত যে সকল ভাগ্যন্বেষী সাহসী যুবক এদেশে আসিয়াছিলেন খলজী মালিক ইখতিয়ার-উদ্দীন মহম্মদ তাঁহাদের অন্যতম। দেখিতে কুৎসিত বলিয়া প্রথমে তিনি কোন উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অবশেষে তাঁহারই মত আর একজন ভাগ্যান্বেষী সেনাপতির সুনজরে পড়িয়া তাঁহার উন্নতির পথ মুক্ত হয়। বিহারের পালশক্তি এই সময়ে পতনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ইখতিয়ারউদ্দীন এই সুযোগে বিহার প্রদেশ অধিকার করেন, এবং বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেনকে নদীয়া হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার পরও পূর্ব্ববঙ্গে সেন বংশের রাজারা আরও অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে সিন্ধু দেশ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ইস্‌লামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল। কিন্তু উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মনে করিলে ভুল হইবে। এখন যেমন ভারতবর্ষের সকল স্থান বৃটিশ-শাসিত নহে, তেমনি সেকালেও

সমুদয় ভারতবর্ষ মুসলমানগণের শাসনাধীনে ছিল না। মুসলমান প্রভুত্ব সাধারণতঃ বড় বড় নগরী ও তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই হিন্দু সামন্ত কর্ত্তৃক শাসিত হইত। তাঁহারা দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতেন। কোনও প্রবল মুসলমান প্রতিবেশী আক্রমণের ভয় দেখাইলে বার্ষিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি অথবা প্রচুর উপঢৌকন দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন।

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু

মহম্মদ এতদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিনিধি স্বরূপ দেশ শাসন করিতেছিলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হইলে তিনিই গজনী, ঘুর ও দিল্লীর অধীশ্বর হন। কিন্তু সিংহাসনারোহণের তিন বৎসর পর কয়েকজন অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পরে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলেও ভারতবর্ষে মুসলমান প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল। কুতবুদ্দীন অইবক ভারতের মুসলমানগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া দিল্লীর প্রথম স্বাধীন স্থলতানরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

মধ্য যুগে ভারতবর্ষ

সপ্তদশ অধ্যায়

দাস রাজবংশ

কুত্‌বুদ্দীন অইবক :—মহম্মদ ঘুরীর পুত্রসন্তান ছিল না। তুর্কী ক্রীতদাসগণই ছিলেন মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাঁহার মৃত্যুর পরে ভারতীয় মুসলমান কর্ম্মচারীবর্গ কুত্‌বুদ্দীন অইবকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। কুত্‌বুদ্দীন ক্রীতদাসরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন। যখন তিনি ভারতের মুসলমান বিজিত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন, তখনও সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার দাসত্ব মোচন হয় নাই। এইজন্য, তিনজন স্থলতান ব্যতীত অন্য সকলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, প্রথম স্থলতানের পরিচয়ে এই বংশের নাম হইয়াছে দাস রাজবংশ।

দিল্লীশ্বর কুত্‌বুদ্দীন গজনীর শাসনকর্ত্তা তাজ-উদ্দীনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা হইবার পরে তাঁহাদের মধ্যে আর সদ্ভাব রহিল না। পঞ্জাবের প্রভুত্ব লইয়া তাঁহাদের বিরোধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে কেহই নিশ্চিতরূপে জয়ের দাবী করিতে পারিলেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ ও আফ্‌গানিস্থানের রাষ্ট্রীয় ঐক্য অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গেল। তারপর সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী পরে বাবর যখন আবার দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন, তখন এই ঐক্য পুনরায় স্থাপিত হইয়াছিল।

গজনীর সহিত যুদ্ধ

মাত্র চারি বৎসর শাসনের পরে ১২১০ খৃষ্টাব্দে একদিন লাহোরে চৌগন বা পোলো খেলিবার সময় কুত্‌বুদ্দীনের মৃত্যু হয়। তিনি যেমন সাহসী যোদ্ধা তেমনি দানশীল নরপতি ছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে দান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল 'লাখ্‌বকস্‌' বা লক্ষ দাতা। কিন্তু তাঁহার শাসনে কঠোরতার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ভারতবর্ষে তখন মুসলমান শাসনের শৈশবকাল। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ তখনও মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয় নাই। তাই বৈদেশিক শাসকগণ হিন্দুদিগের প্রতি মিত্রভাব অবলম্বন করা নিরাপদ মনে করিতেন না।

কুত্‌বুদ্দীনের চরিত্র

কুত্‌বুদ্দীনের মৃত্যুর পরে লাহোরের মুসলমান নায়কগণ তাড়াতাড়ি আরম শাহকে সিংহাসনে বসাইলেন। কুত্‌বুদ্দীনের সহিত আরম শাহের কি সম্পর্ক ছিল কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। সেই সঙ্কটকালে রাজ্য রক্ষা করিবার যোগ্যতা আরম শাহের ছিল না। সুতরাং দিল্লীর অভিজাত সম্প্রদায় ইল্‌তুৎমিসকে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলেন।

আরম

ইল্‌তুৎমিসঃ—কুত্‌বুদ্দীনের ন্যায় ইল্‌তুৎমিসও একজন তুর্কী ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বর কুত্‌বুদ্দীন তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রভুর অনুগ্রহ লাভে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। পরে অইবকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি সুলতানের জামাতা হইলেন। কুত্‌বুদ্দীনের মৃত্যুর পরে তিনিই প্রভুর রাজ্য আসন্ন বিনাশ ও বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

দিল্লীর প্রধানগণ যখন তাঁহাকে রাজা হইতে আহ্বান করিলেন, তখন অযোগ্য আরমকে পদচ্যুত করা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন হয়

নাই। কিন্তু তাঁহার অন্য প্রতিযোগীর অভাব ছিল না। তাজউদ্দীন ইলদিজ তাঁহার পূর্ব্ব বিদ্বেষ ও দাবী ভুলিতে পারেন নাই। কুতবুদ্দীনের আত্মীয় নাসিরুদ্দীন কবাচ সিন্ধুদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বাংলার খল্‌জী শাসনকর্ত্তৃগণও আর দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহিলেন না। এদিকে আরম শাহের অক্ষমতার সুযোগে হিন্দুগণ পূর্ব্বেই গোয়ালিয়র ও রণ্‌থম্ভোর অধিকার করিয়াছিলেন। চারিদিকে এতগুলি শত্রু একসঙ্গে দমন করা ইল্‌তুৎমিসের পক্ষে সহজ ছিল না। তথাপি ধীরে ধীরে তিনি মুসলমানরাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে পঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভাবে বিজিত হইল, রণ্‌থম্ভোর এবং গোয়ালিয়র অধিকৃত হইল এবং উজ্জয়িনী লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

উত্তরভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

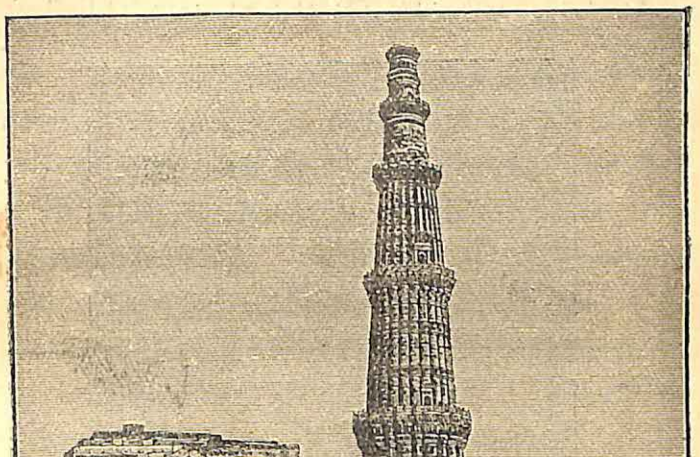
ইল্‌তুৎমিসের শাসনকালেই মোগলগণ তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ নায়ক চিঙ্গিস্ খাঁর নেতৃত্বে সর্ব্বপ্রথম সিন্ধুনদীর তীরদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পলাতক শত্রু খিবার রাজার সন্ধানে এদেশে আসিয়াছিলেন। এই পলাতক রাজা পঞ্জাবে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিস আশ্রয় দানে অসম্মত হওয়ায় খিবার রাজা পঞ্জাব হইতে পলায়ন করিলেন, তাঁহার শত্রুগণও এদেশ হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু মোগল আক্রমণে ইল্‌তুৎমিসের পরবর্ত্তী রাজারা বিশেষ বিব্রত হইয়াছিলেন।

চিঙ্গিস খাঁ

ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বের পরে ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে সাম্‌স্-উদ্দীন ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু হয়। তাঁহার সিংহাসনারোহণের সময় দিল্লীর মুসলমান রাজ্য বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহার পূর্ব্বশক্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইল্‌তুৎমিসই দাসরাজ বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ইল্‌তুৎমিসের সাফল্য

নরপতি। তাঁহাকে ভারতে মুসলমান প্রভুত্বের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষা ও ললিতকলার তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠ-

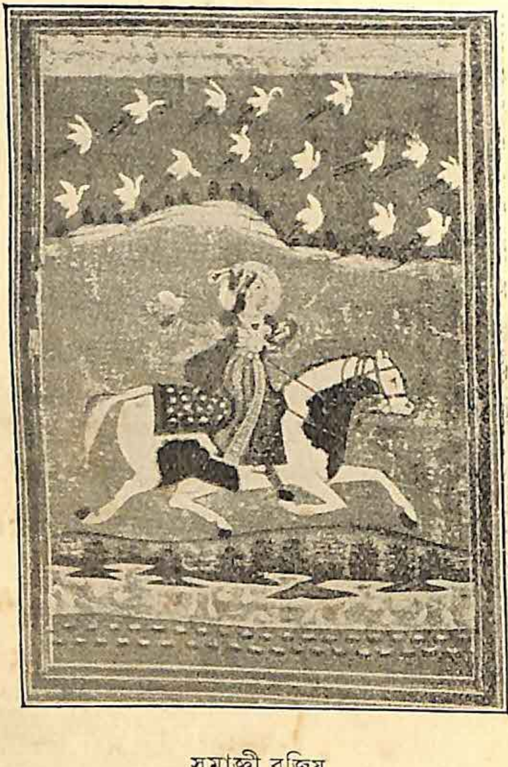


কুতবমিনার

পোষাক ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লী ইস্‌লাম সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার উদ্যোগেই দিল্লীর কুতবমিনারের

নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। খাজা কুতবুদ্দীন নামক সেকালের একজন প্রসিদ্ধ সাধুর নামানুসারে এই স্তম্ভের নামকরণ হইয়াছে।

রজিয় ঃ—ইল্‌তুৎমিসের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার পর তাঁহার কন্যা



সম্রাজ্ঞী রজিয়

রজিয় রাজ্য লাভ করেন। পুত্রদের অযোগ্যতার কথা তিনি জানিতেন। কিন্তু সুলতানের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার শেষ ইচ্ছা পালন না করিয়া তাঁহার পুত্র রুকন্‌উদ্দীন ফিরুজকে রাজত্ব দিলেন। তাঁহার কু-শাসনে রাজ্যের চারিদিকে

রুকন্‌উদ্দীন ফিরুজ

বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। দিল্লীর ওমরাহগণ রুকন্উদ্দীন ও তাঁহার মাতাকে বন্দী করিয়া স্থলতানা রজিয়র হস্তে শাসনভার অর্পণ করিলেন। পুরুষ হইলে স্থলতানা রজিয় বোধ হয় তাঁহার পিতার ন্যায় দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন। কিন্তু সেকালের মুসলমান সেনাপতিরা নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত আপমানের বিষয় মনে করিতেন। স্থতরাং পুরুষোচিত গুণাবলীর পরিচয় দিয়াও রজিয় সামন্ত ও কর্ম্মচারিগণের অসন্তোষ দূর করিতে পারিলেন না। রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। স্থলতানা অকুতোভয়ে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ভাতিন্দার শাসনকর্ত্তা অলতুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। রজিয় তাঁহাকে বিবাহ করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে স্বামীসহ তিনি শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। রজিয় ব্যতীত অন্য কোনও মহিলা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই।

রজিয়র সিংহাসনে আরোহণ

নাসিরউদ্দীন মামুদ :—রজিয়র পরে দুইজন অযোগ্য স্থলতান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের আমলে দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি ও অরাজকতা দেখা দিল। শেষে ইল্তুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদ দিল্লীর রাজা হইলেন।

নাসিরউদ্দান ছিলেন শান্ত শিষ্ট নিরীহ লোক। স্থতরাং তাঁহার আমলেও অশান্তি ও অরাজকতার খুবই সম্ভাবনা ছিল। ভাগ্যক্রমে তিনি একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী পাইয়াছিলেন। এই মন্ত্রীই গিয়াসউদ্দীন বল্বন্ নামে পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বল্বনের কঠোর শাসনে রাজ্যে শান্তি ও স্থশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই

নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্ব

নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বের এত সুখ্যাতি হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে স্থলতান নাসিরউদ্দীন কোরাণ নকল করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি একাধিকবার বিবাহ করেন নাই এবং পত্নীর গৃহকার্য্যের জন্য কোন পরিচারিকাও নিযুক্ত করেন নাই। এই প্রবাদগুলি সত্য কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন্‌ ঃ—স্থলতান গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন্‌ প্রথম জীবনে ইল্‌তুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুর পর তাঁহার চল্লিশজন ক্রীতদাস রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। ইহাদের দুরভিসন্ধির ফলেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হইয়াছিল। বল্‌বন্‌ নিজেও এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন ও বিদেশী আক্রমণ হইতে সীমান্ত রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন।

নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালে সীমান্ত রক্ষার জন্য তিনি তাঁহার আত্মীয় শের খাঁ স্থঙ্করকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যোগ্যতার সহিত পঞ্জাবে মোগলদিগের গতি রোধ করিতে থাকিলেও ইহার পরে স্থলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের প্রতি পঞ্জাব রক্ষার ভার অর্পণ করা হয়।

মেওয়াট অর্থাৎ আলোয়ার অঞ্চলের রাজপুতগণ দিল্লীর সন্নিকটে বাস করিলেও কখনই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। তাহাদের উপদ্রবে দিল্লীর অধিবাসিগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বল্‌বন্‌ বুঝিলেন, ইহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে দেশের কল্যাণ নাই। স্থতরাং তিনি অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে তাহাদের দেশ ধ্বংস করিলেন। ইহার ফলে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত নিরীহ পল্লীবাসীদিগকে আর অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল।

বল্‌বনের আমলে বাংলাদেশ

বল্‌বনের আমলে বাংলার শাসনকর্ত্তা তুঘ্‌রিল খাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সুলতানের সেনাদল দুই দুইবার বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজিত হইবার পর বল্‌বন্ স্বয়ং তুঘ্‌রিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তখন বিদ্রোহী নায়ক ভীত হইয়া জাজনগরের জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। সেইখানে একদিন দিল্লীর একজন সাহসী সেনানায়কের অতর্কিত আক্রমণে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। বল্‌বন্ বিদ্রোহীদিগের আত্মীয় স্বজনগণকেও নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। তারপর বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ ভাবে শান্তি স্থাপন করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁ এই সময় বাংলার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন।

রাজপুত্র মহম্মদের মৃত্যু

১২৮৫ খৃষ্টাব্দে মোগলদের সহিত যুদ্ধে বল্‌বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ নিহত হয়েন। আশী বৎসরের বৃদ্ধ বল্‌বনের জীবন সায়াহ্নে এই পুত্রশোক সহ্য হইল না। দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

বল্‌বনের চরিত্র

কঠোর ও নির্দ্দয় হইলেও বল্‌বন্ ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবৎসল নরপতি ছিলেন। বিচার ও দণ্ড-বিধানের সময়ে তিনি অপরাধীর ধনসম্পদ্ অথবা পদমর্য্যাদার কথা বিবেচনা করিতেন না। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ওমরাহ-গণও তাঁহার নিকট বিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার শাসনকালে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। রাজমর্য্যাদা ও রাজসভার শিষ্টাচার তিনি জীবনে কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। মোগলগণ যখন মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিতেছিলেন তখন মুসলমান-দেশের জ্ঞানী, গুণী ও সিংহাসনচ্যুত রাজগণ তাঁহার সভায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার সময়ে দিল্লী নগরী মুস্‌লিম সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আমীর

খুসরু বল্‌বনের সভাকবি ছিলেন। বল্‌বনের যেরূপ পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী ছিল, তাহার দ্বারা ইচ্ছা করিলে তিনি বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে পারিতেন, কিন্তু রাজ্যবৃদ্ধি অপেক্ষা রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানই তিনি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন।

কৈকোবাদ :—বল্‌বনের মৃত্যুর পরে নাসিরউদ্দীন মামুদ বুঘরার পুত্র মুইজ্‌উদ্দীন কৈকোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার বিলাস লিপ্সার ফলে বল্‌বনের আমলের সুশাসন ও শৃঙ্খলা লুপ্ত হইল। পরিশেষে খল্‌জীগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের নয়ক জালালউদ্দীন ফিরুজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে দাসবংশের শেষ হইল এবং কিছুকালের জন্য ভারতে তুর্কী প্রাধান্য লোপ পাইল।

দাস রাজবংশের বিলোপ

অষ্টাদশ অধ্যায়

খল্‌জী রাজগণ

জালালউদ্দীন ফিরুজ :—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্টান্‌লি লেনপুলের মতে খল্‌জীগণ জাতিতে তুর্কী ছিলেন, কিন্তু আফগানিস্থানে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে আফগান স্বভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত তুর্কীদের সদ্ভাব ছিল না। তাঁহাদের রাজত্বকালেই দক্ষিণাপথে ইস্‌লাম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

নূতন বংশের পরিচয়

অদৃষ্টচক্রে জালালউদ্দীন ফিরুজ যখন বল্‌বনের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর। শান্তিরক্ষার জন্য তিনি যথোচিত কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। দস্যু তস্কর-দিগকেও তিনি শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। সুতরাং রাজশক্তি সর্ব্বত্রই খর্ব্ব হইতে লাগিল। দেশে অশান্তি না থাকিলে জালালউদ্দীন হয় তো একজন সুশাসকরূপে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেকালের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে ধর্ম্মনীতির কোনও স্থান ছিল না।

নূতন শাসকের অক্ষমতা

জালালউদ্দীন মোগল আক্রমণকারীদিগকে ভারতে আসিয়া শান্তিতে বসবাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান জালালউদ্দীনের অপমৃত্যু হয়।

নূতন মুসলমান

আলাউদ্দীন খল্‌জী :—নূতন সম্রাট্ আলাউদ্দীন অল্প বয়স হইতেই পিতৃব্যের আদর যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। জালাল-উদ্দীন ফিরুজ এই পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি আলাউদ্দীনকে কোরা এবং অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কোরা হইতেই আলাউদ্দীন দক্ষিণাপথের দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখনও বিন্ধ্য পর্ব্বতের পরবর্ত্তী স্থানসমূহের সহিত মুসলমান সৈনিকদিগের পরিচয় ছিল না। কেবল সেখানকার অগণিত ধনরত্ন ও অর্থসম্পদের কাহিনী তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাই তিনি একদল সাহসী সৈন্য লইয়া দক্ষিণ বিজয়ে যাত্রা করিলেন এবং ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ মহারাষ্ট্রের অন্তঃপাতী দেবগিরি নামক

দেবগিরি অভিযান

স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি আলাউদ্দীনকে বহু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। এইভাবে বিপুল ধনলাভের সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে বৃদ্ধ জালালউদ্দীন ভাবিলেন, ইহার অধিকাংশই তাঁহার প্রাপ্য হইবে। কিন্তু আলাউদ্দীন বহু কষ্টে যে সম্পদ্ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার কণামাত্রও অপরকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বৃদ্ধ রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজসভায় তাঁহার অনেক শত্রু আছে, সুতরাং তিনি সেখানে উপস্থিত হইতে সাহস পাইতেছেন না। জালালউদ্দীন তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং অরক্ষিত ভাবে জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া আততায়ার হস্তে নিহত হইলেন।

জালালউদ্দীনের হত্যা

আলাউদ্দীন সসৈন্যে মহাসমারোহে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার শত্রুগণের মধ্যে ঐক্য ছিল না, সুতরাং তাহারা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

জালালউদ্দীন ও আলাউদ্দীন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির সুলতান ছিলেন। কুটিল, নির্ম্মম আলাউদ্দীনের কার্য্যসিদ্ধি কালে ন্যায় অন্যায় বিচার বোধ থাকিত না, তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষারও সীমা ছিল না। তিনি কোন কাজই সম্পূর্ণরূপে শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। আলাউদ্দীন বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১২৯৬-১৩১৬ খৃঃ)। এই সময়ে সমগ্র দেশ তাঁহার অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত মোগলগণ যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, আলাউদ্দীন তাহাদের সকলকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। একদিনে ১৫ হইতে ৩০ হাজার মোগল বিদ্রোহী নিহত হইয়াছিল।

আলাউদ্দীনের চরিত্র

এই নিষ্ঠুর সুলতানই আবার একটি নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও পৃথিবী বিজয়ের কল্পনা পোষণ করিতেন। কিন্তু শেষে এই সকল অদ্ভুত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলি ধ্বংসের আয়োজন করিলেন।

দুরাকাঙ্ক্ষা

তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর নানারূপ অশান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। মোগলেরা দুই বার ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সিংহাসনলুব্ধ আত্মীয়গণ আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া রাজ্যলাভের অভিপ্রায়ে তিনবার বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু আলাউদ্দীন দৃঢ়তার সহিত এই সকল বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। তারপর বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল ধনসম্পদের আতিশয্য, মদ্যপান ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিবাহ দ্বারা ঐক্য স্থাপনের ফলেই রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও অনাচার বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতরাং মদ্যপান নিষিদ্ধ হইল। সুলতান নিজের পানপাত্রগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সুলতানের অনুমতি ব্যতীত মিলিত হইতে পারিতেন না। সুলতানের সম্মতি ব্যতীত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হইল। অতি তুচ্ছ বিষয়ের খবরও তিনি গুপ্তচরের সাহায্যে সংগ্রহ করিতেন। রাজ্যমধ্যে কেহ যাহাতে ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া না উঠিতে পারে সেজন্য সাধারণের উপর দুর্ব্বহ করভার চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দমন নীতি

হতভাগ্য হিন্দুগণই এই অত্যাচারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপদ্রুত হইতে লাগিল। সৈন্য বিভাগের ব্যয় কমাইবার জন্য সুলতান প্রত্যেক জিনিষের একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়াছিলেন। চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার নিজের

হিন্দুদের দুর্দ্দশা

ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন। এই সকল স্বেচ্ছাচারমূলক পদ্ধতি সফল হইয়াছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু যতদিন আলাউদ্দীনের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন দেশে সুখ ও সমৃদ্ধির চিহ্নমাত্র ছিল না, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

আলাউদ্দীন দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি স্বয়ং সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সেনাপতিদিগের মধ্যেও সামরিক প্রতিভার অভাব ছিল না। ইহাদের মধ্যে জাফর খাঁ, নসরৎ খাঁ, মালিক কাফুর, খাজা হাজি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুজরাট বিজয়

গুজরাট জয় করিবার জন্য ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁর নেতৃত্বে একদল সাহসী সৈন্য প্রেরণ করেন। গুজরাটরাজ দ্বিতীয় কর্ণদেবের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না। মুসলমান সৈন্যদল গুজরাটের প্রসিদ্ধ বন্দরগুলি হইতে রাশি রাশি ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করিল। রাণী কমলাদেবী তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। পরে তিনি আলাউদ্দীনের প্রিয়তমা মহিষী হইয়াছিলেন। অপর বন্দীদের মধ্যে খোজা মালিক কাফুরের নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তরকালে তিনি আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কমলাদেবী

মালিক কাফুর

রণথম্ভোর বিজয়

গুজরাট অনায়াসে বিজিত হইলেও রণথম্ভোর জয় করা খুব সহজ হয় নাই। কুতব ও ইলতুৎমিস এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুত বীরগণ ইহা পুনরায় অধিকার করেন এবং এই সময়ে বীর হামির দেব রণথম্ভোরের রাজা ছিলেন। আলাউদ্দীনের কয়েকজন বিদ্রোহী কর্ম্মচারীকে আশ্রয় দানের ফলে সুলতান তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

কিন্তু রাজপুতদিগের বীরত্বে প্রথমবার মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল। ইহার পরে হামির দেব নিহত হইলে ১৩০১ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন কর্তৃক রণথম্ভোর অধিকৃত হয়। সুলতান স্বয়ং দ্বিতীয়-বারের অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। কথিত আছে যে মেবাররাজ রাণা রতনসিংহের মহিষী পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুতগণ অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিতেন। রাণী পদ্মিনী আলাউদ্দীনের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। চিতোর অধিকৃত হইলে সুলতান তাঁহার পুত্র খিজির খাঁকে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে হামিরের নেতৃত্বে রাজ-পুতগণ পুনরায় এই রাজ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার পর চিতোর আবার মেবারের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল।

চিতোর ও পদ্মিনী

উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণাপথেই আলাউদ্দীনের বাহিনী অধিকতর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে একদল দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য লইয়া মালিক কাফুর দেব-গিরিতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাজিত করিয়া কর দিতে বাধ্য করিলেন। ইহার এক বৎসর পরে কাফুর বরঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেবকেও করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দোর-সমুদ্রের হোয়সলরাজ তৃতীয় বীর বল্লাল তাঁহার নিকট পরাজিত হন। পাণ্ড্যগণও মুসলমান সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিল না। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে কাফুর বিজয়-গৌরবে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হইয়া রামেশ্বরমে একটি মসজিদ

দেবগিরি আক্রমণ

বরঙ্গল

দোরসমুদ্রের হোয়সল

নির্ম্মাণ করাইলেন। এইরূপে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর সেতু পর্য্যন্ত আলাউদ্দীনের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। রামচন্দ্রদেবের পুত্র একবার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাফূরের হস্তে মরাঠা-বীর পরাজিত ও নিহত হইলেন।

বিদ্রোহ দমন

প্রায় সমগ্র ভারত জয় করিয়া আলাউদ্দীন গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে সুখ ছিল না। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাফূরের চক্রান্তে স্ত্রী এবং পুত্রগণের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। অত্যাচারী সুলতান বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার পরম আদরের খোজার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া রহিলেন। অনেকেই সন্দেহ করেন যে কাফূরের চক্রান্তেই আলাউদ্দীনের অপমৃত্যু হইয়াছিল।

আলাউদ্দীনের শেষ জীবন

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফূরই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন। রাজপরিবারের নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে অনেকেই ইতিপূর্ব্বে তাঁহার চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন। পরলোকগত সুলতানের এক নাবালক পুত্রের নামে কাফূর রাজ্য শাসন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পঁয়ত্রিশ দিন পরেই কাফূরকে হত্যা করিয়া আলাউদ্দীনের পুত্র কুতবউদ্দান মুবারক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

কাফূরের হত্যা

কুতবউদ্দীন মুবারক :—অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে নূতন সুলতানের আমলে দিল্লীর পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে। রামচন্দ্রদেবের জামাতা হরপালদেব দেবগিরিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে সুলতান কঠোরতার সহিত তাঁহাকে দমন করিলেন। কিন্তু ইহার পরেই একজন হীনবংশজাত

দেবগিরি অভিযান

গুজরাটীর হস্তে রাজ্যের ভার ছাড়িয়া দিয়া যুবক সুলতান বিলাসে গা ঢালিয়া দিলেন। সুলতানের প্রীতিভাজন খুস্রু প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত করার অভিপ্রায়ে নির্লজ্জভাবে তাঁহার পাপাসক্তিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে প্রভুকে হত্যা করিয়া খুস্রু নিজেই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে খল্‌জী বংশের অবসান হইল এবং মহা-পরাক্রান্ত আলাউদ্দীনের স্থলে একজন নীচ-বংশীয় অন্ত্যজ দিল্লীর রাজা হইলেন। নূতন সুলতান নাসিরউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া তাঁহার হীনবংশজাত বন্ধুদিগের মধ্যে উচ্চ উপাধি ও পদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজি মালিক তুঘ্‌লুক্ সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে খুস্রু পরাজিত হইলেন এবং বিজয়ী সেনাপতির আদেশে তাঁহার শিরচ্ছেদ হইল। ইহার পর সেনাপতিদিগের সম্মতিক্রমে গাজি মালিক দিল্লীর রাজা হইলেন। ইবন বতুতার মতে নূতন রাজা করোণিয়া তুর্কী। মার্কো পোলো বলেন যে করোণিয়ারা মিশ্রজাতি অর্থাৎ তুর্কী পিতার ও ভারতীয় মাতার সন্তান। অন্যান্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে গাজি মালিকের পরিবারের সহিত সম্ভ্রান্ত জাঠগণের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল ; সুতরাং এই নূতন রাজবংশকে বিদেশী মনে করা সঙ্গত হইবে না।

খুস্রুর সিংহাসন অধিকার

করোণিয়া তুর্কী

ঊনবিংশ অধ্যায়

তুঘ্‌লুক্‌বংশীয় রাজগণ

গিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লুক্‌ শাহ ঃ—গাজি মালিক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লুক্‌ শাহ নাম ধারণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকগণের আমলে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল তিনি তাহার দূরীকরণে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল, দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। তাঁহার অনুগ্রহে করভারের লাঘব হইল, কৃষির উন্নতি সাধিত হইল এবং ডাক বিভাগের নূতন ব্যবস্থায় সাধারণের অনেক সুবিধা হইল।

প্রথম তুঘ্‌লুক্‌ শাহের সাফল্য

দিল্লীর অব্যবস্থার সুযোগে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের হিন্দু রাজগণ হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিলেন। সুলতান তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ফকরউদ্দীন মহম্মদ জৌনাকে বরঙ্গলের কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র জৌনার হস্তে বন্দী হইলেন। ওদিকে বাংলার অধিকার লইয়া বল্‌বনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। সেকালে এই দেশটিতে বাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই ছিল। সম্রাট্‌ সেখানে গিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া বাংলায় দিল্লীর প্রভুত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুলতান যখন দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন, তখন পিতার অভ্যর্থনার জন্য জৌনা একটি

বাংলা

কাষ্ঠমণ্ডপ তৈয়ার করিয়াছিলেন। মণ্ডপটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ায় গিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লুক্‌ শাহের মৃত্যু হয়। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবন বতুতা মনে করেন যে সম্রাট্‌কে হত্যা করিবার জন্যই এই কাষ্ঠমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল (১৩২৫ খৃঃ)।

সম্রাটের মৃত্যু

মহম্মদ বিন তুঘ্‌লুক্‌ ঃ—পিতার মৃত্যুর পর জৌনা "মহম্মদ শাহ" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতিহাসে তিনি "পাগলা রাজা" নামে পরিচিত। তিনি একদিকে যেমন অসাধারণ প্রতিভা, অকৃত্রিম বিদ্যানুরাগ, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই নিষ্ঠুরতা, অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য তাঁহার সকল সাধু চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। একাধারে এরূপ বিপরীত গুণের সমাবেশ বাস্তবিকই বিরল। মরক্কোর মুসলমান পর্য্যটক ইবন বতুতা মহম্মদের শাসন সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সম্রাট্‌ তাঁহাকে দিল্লীর প্রধান কাজির পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি সুলতানের চরিত্র সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে দেখা যায়, এই রাজা যেমন দানশীল তেমনি নির্ম্মম ছিলেন। প্রায়ই দেখা যাইত যে তাঁহার দ্বারে হয় কোনও দরিদ্র ধনলাভ করিতেছে না হয় কোন হতভাগ্য প্রাণ হারাইতেছে। একদিকে যেমন তাঁহার উদারতা ও সৎসাহসের অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল, তেমনি তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। তিনি অতিশয় বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ এবং সুবিচারক ছিলেন। তথাপি তাঁহার ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁহার রাজ্যজয়ের দুর্জ্জয় নেশায় বহু লোকক্ষয় এবং

নূতন রাজার চরিত্রের অপূর্ব্ব অসামঞ্জস্য

অর্থের অপচয় হইয়াছে এবং তাঁহার অর্থনৈতিক সংস্কার একটি বিরাট ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। যদিও বিদ্রোহ দমন ও অশান্তি নিবারণে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

মহম্মদের ব্যর্থতা

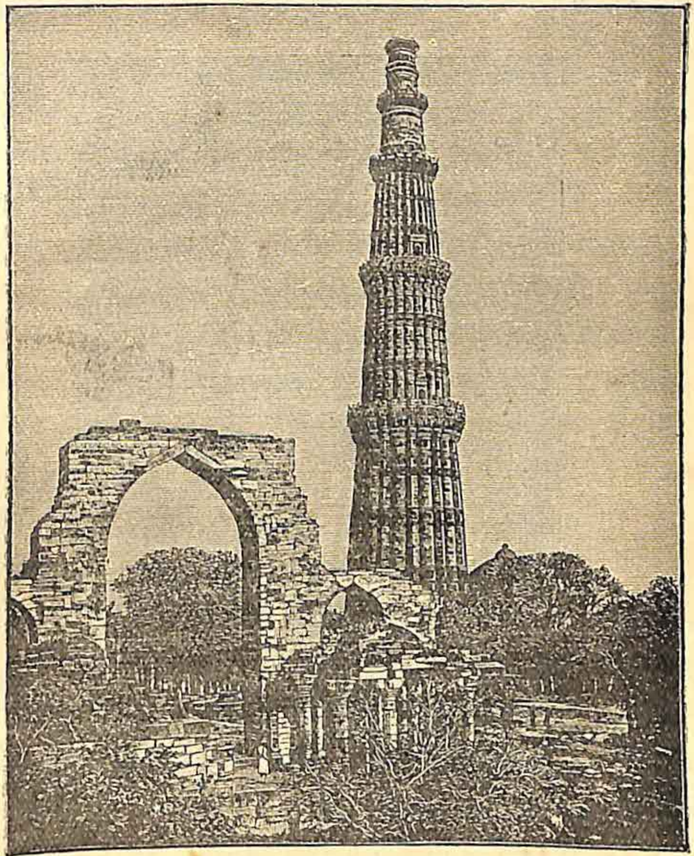
তুঘ্‌লুক্-পুত্র মহম্মদ যে সকল কাজ করিতে চাহিতেন, কল্পনায় তাহা সুসাধ্য বলিয়া মনে হইলেও কাজে তাহা কখনও সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। উদ্ধত প্রকৃতি বলিয়া তিনি কাহারও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। অকপট, সরল সমালোচনা তাঁহার ভাল লাগিত না। জনসাধারণের মতামতের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না এবং তাঁহার শাসন-পদ্ধতি পছন্দ করিত না বলিয়া তিনি প্রজাদিগের প্রতি রুষ্ট হইতেন। কেহ কেহ বলেন, যে গোঁড়া মুসলমানগণ তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না বলিয়াই মহম্মদের এত অপযশ। কিন্তু বিদেশী পর্য্যটক ইবন বতুতা যে মহম্মদের অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। তিনিও সম্রাটের বহু অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জোর করিয়া যে কাহারও উপকার করা চলে না, মহম্মদ তাহা বুঝিতেন না। হয়তো মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে এই অজ্ঞতাই তাঁহার ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ।

মহম্মদের কর্ম্মপদ্ধতি ও মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা

শাসনভার হাতে লইয়া তিনি করবৃদ্ধি করিলেন। ফলে প্রজারা কৃষিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। সে সময় কৃষিক্ষেত্রের অভাব ছিল না, সুতরাং বেশি রাজস্ব চাহিলেই কৃষকেরা অন্যত্র চলিয়া যাইত। মহম্মদ মনে করিলেন যে বলপ্রয়োগে এই সকল অবাধ্য প্রজাকে বশীভূত করিবেন। যে কোনও প্রকার অন্যায় নিবারণে বলপ্রয়োগই

অতিরিক্ত করভার

নরপতি। তাঁহাকে ভারতে মুসলমান প্রভুত্বের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষা ও ললিতকলার তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠ-

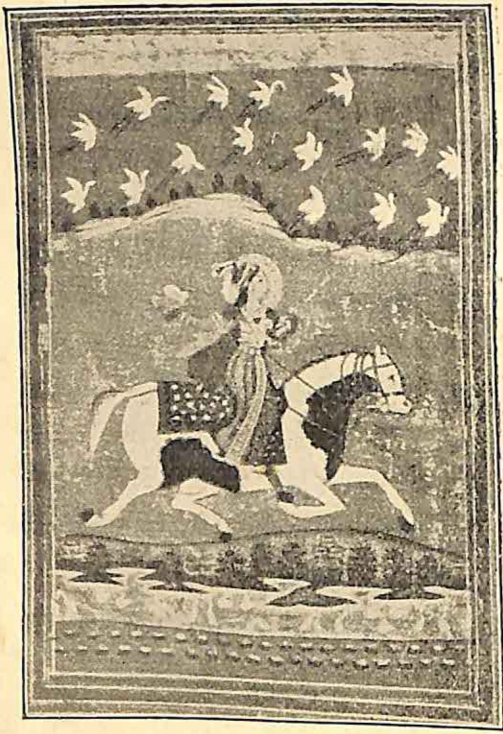


কুতবমিনার

পোষক ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লী ইস্‌লাম সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার উদ্যোগেই দিল্লীর কুতবমিনারের

নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। খাজা কুত্‌বুদ্দীন নামক সেকালের একজন প্রসিদ্ধ সাধুর নামানুসারে এই স্তম্ভের নামকরণ হইয়াছে।

রজিয়ঃ—ইল্‌তুৎমিসের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার পর তাঁহার কন্যা



সম্রাজ্ঞী রজিয়

রজিয় রাজ্য লাভ করেন। পুত্রদের অযোগ্যতার কথা তিনি জানিতেন। কিন্তু সুলতানের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার শেষ ইচ্ছা পালন না করিয়া তাঁহার পুত্র রুকন্‌উদ্দীন ফিরুজকে রাজত্ব দিলেন। তাঁহার কু-শাসনে রাজ্যের চারিদিকে

রুকন্‌উদ্দীন ফিরুজ

বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। দিল্লীর ওমরাহগণ রুকন্‌উদ্দীন ও তাঁহার মাতাকে বন্দী করিয়া সুলতানা রজিয়র হস্তে শাসনভার অর্পণ করিলেন। পুরুষ হইলে সুলতানা রজিয় বোধ হয় তাঁহার পিতার ন্যায় দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন। কিন্তু সেকালের মুসলমান সেনাপতিরা নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত আপমানের বিষয় মনে করিতেন। সুতরাং পুরুষোচিত গুণাবলীর পরিচয় দিয়াও রজিয় সামন্ত ও কর্ম্মচারিগণের অসন্তোষ দূর করিতে পারিলেন না। রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। সুলতানা অকুতোভয়ে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ভাতিন্দার শাসনকর্ত্তা অলতুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। রজিয় তাঁহাকে বিবাহ করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে স্বামীসহ তিনি শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। রজিয় ব্যতীত অন্য কোনও মহিলা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই।

রজিয়র সিংহাসনে আরোহণ

নাসিরউদ্দীন মামুদ ঃ—রজিয়র পরে দুইজন অযোগ্য সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের আমলে দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি ও অরাজকতা দেখা দিল। শেষে ইল্‌তুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদ দিল্লীর রাজা হইলেন।

নাসিরউদ্দান ছিলেন শান্ত শিষ্ট নিরীহ লোক। সুতরাং তাঁহার আমলেও অশান্তি ও অরাজকতার খুবই সম্ভাবনা ছিল। ভাগ্যক্রমে তিনি একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী পাইয়াছিলেন। এই মন্ত্রীই গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন্ নামে পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বল্‌বনের কঠোর শাসনে রাজ্যে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই

নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্ব

নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বের এত সুখ্যাতি হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে সুলতান নাসিরউদ্দীন কোরাণ নকল করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি একাধিকবার বিবাহ করেন নাই এবং পত্নীর গৃহকার্য্যের জন্য কোন পরিচারিকাও নিযুক্ত করেন নাই। এই প্রবাদগুলি সত্য কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন্ :—সুলতান গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন্ প্রথম জীবনে ইল্‌তুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুর পর তাঁহার চল্লিশজন ক্রীতদাস রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। ইহাদের দুরভিসন্ধির ফলেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হইয়াছিল। বল্‌বন্ নিজেও এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন ও বিদেশী আক্রমণ হইতে সীমান্ত রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন।

নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালে সীমান্ত রক্ষার জন্য তিনি তাঁহার আত্মীয় শের খাঁ সুঙ্করকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যোগ্যতার সহিত পঞ্জাবে মোগলদিগের গতি রোধ করিতে থাকিলেও ইহার পরে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের প্রতি পঞ্জাব রক্ষার ভার অর্পণ করা হয়।

মেওয়াট অর্থাৎ আলোয়ার অঞ্চলের রাজপুতগণ দিল্লীর সন্নিকটে বাস করিলেও কখনই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। তাহাদের উপদ্রবে দিল্লীর অধিবাসিগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বল্‌বন্ বুঝিলেন, ইহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে দেশের কল্যাণ নাই। সুতরাং তিনি অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে তাহাদের দেশ ধ্বংস করিলেন। ইহার ফলে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত নিরীহ পল্লীবাসীদিগকে আর অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল।

বল্‌বনের আমলে বাংলার শাসনকর্ত্তা তুঘ্‌রিল খাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সুলতানের সেনাদল দুই দুইবার বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজিত হইবার পর বল্‌বন্ স্বয়ং তুঘ্‌রিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তখন বিদ্রোহী নায়ক ভীত হইয়া জাজনগরের জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। সেইখানে একদিন দিল্লীর একজন সাহসী সেনানায়কের অতর্কিত আক্রমণে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। বল্‌বন্ বিদ্রোহীদিগের আত্মীয় স্বজনগণকেও নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। তারপর বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ ভাবে শান্তি স্থাপন করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁ এই সময় বাংলার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন।

বল্‌বনের আমলে বাংলাদেশ

১২৮৫ খৃষ্টাব্দে মোগলদের সহিত যুদ্ধে বল্‌বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ নিহত হয়েন। আশী বৎসরের বৃদ্ধ বল্‌বনের জীবন সায়াহ্নে এই পুত্রশোক সহ্য হইল না। দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

রাজপুত্র মহম্মদের মৃত্যু

কঠোর ও নির্দ্দয় হইলেও বল্‌বন্ ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবৎসল নরপতি ছিলেন। বিচার ও দণ্ড-বিধানের সময়ে তিনি অপরাধীর ধনসম্পদ্ অথবা পদমর্য্যাদার কথা বিবেচনা করিতেন না। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ওমরাহগণও তাঁহার নিকট বিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার শাসনকালে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। রাজমর্য্যাদা ও রাজসভার শিষ্টাচার তিনি জীবনে কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। মোগলগণ যখন মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিতেছিলেন তখন মুসলমানদেশের জ্ঞানী, গুণী ও সিংহাসনচ্যুত রাজগণ তাঁহার সভায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার সময়ে দিল্লী নগরী মুস্‌লিম সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আমীর

বল্‌বনের চরিত্র

খুসরু বল্‌বনের সভাকবি ছিলেন। বল্‌বনের যেরূপ পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী ছিল, তাহার দ্বারা ইচ্ছা করিলে তিনি বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে পারিতেন, কিন্তু রাজ্যবৃদ্ধি অপেক্ষা রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানই তিনি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন।

কৈকোবাদ ঃ—বল্‌বনের মৃত্যুর পরে নাসিরউদ্দীন মামুদ বুঘরার পুত্র মুইজ্‌উদ্দীন কৈকোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার বিলাস লিপ্সার ফলে বল্‌বনের আমলের সুশাসন ও শৃঙ্খলা লুপ্ত হইল। পরিশেষে খল্‌জীগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের নয়ক জালালউদ্দীন ফিরুজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে দাসবংশের শেষ হইল এবং কিছুকালের জন্য ভারতে তুর্কী প্রাধান্য লোপ পাইল।

দাস রাজবংশের বিলোপ

অষ্টাদশ অধ্যায়

খল্‌জী রাজগণ

জালালউদ্দীন ফিরুজ ঃ—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্টান্‌লি লেনপুলের মতে খল্‌জীগণ জাতিতে তুর্কী ছিলেন, কিন্তু আফগানিস্থানে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে আফগান স্বভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত তুর্কীদের সদ্ভাব ছিল না। তাঁহাদের রাজত্বকালেই দক্ষিণাপথে ইস্‌লাম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

নূতন বংশের পরিচয়

অদৃষ্টচক্রে জালালউদ্দীন ফিরুজ যখন বল্‌বনের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর। শান্তিরক্ষার জন্য তিনি যথোচিত কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। দস্যু তস্কর-দিগকেও তিনি শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। সুতরাং রাজশক্তি সর্ব্বত্রই খর্ব্ব হইতে লাগিল। দেশে অশান্তি না থাকিলে জালালউদ্দীন হয় তো একজন সুশাসকরূপে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেকালের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে ধর্ম্মনীতির কোনও স্থান ছিল না।

নূতন শাসকের অক্ষমতা

জালালউদ্দীন মোগল আক্রমণকারীদিগকে ভারতে আসিয়া শান্তিতে বসবাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান জালালউদ্দীনের অপমৃত্যু হয়।

নূতন মুসলমান

আলাউদ্দীন খল্‌জীঃ—নূতন সম্রাট্ আলাউদ্দীন অল্প বয়স হইতেই পিতৃব্যের আদর যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। জালাল-উদ্দীন ফিরুজ এই পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি আলাউদ্দীনকে কোরা এবং অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কোরা হইতেই আলাউদ্দীন দক্ষিণাপথের দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখনও বিন্ধ্য পর্ব্বতের পরবর্ত্তী স্থানসমূহের সহিত মুসলমান সৈনিকদিগের পরিচয় ছিল না। কেবল সেখানকার অগণিত ধনরত্ন ও অর্থসম্পদের কাহিনী তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাই তিনি একদল সাহসী সৈন্য লইয়া দক্ষিণ বিজয়ে যাত্রা করিলেন এবং ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ মহারাষ্ট্রের অন্তঃপাতী দেবগিরি নামক

দেবগিরি অভিযান

স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি আলাউদ্দীনকে বহু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। এইভাবে বিপুল ধনলাভের সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে বৃদ্ধ জালালউদ্দীন ভাবিলেন, ইহার অধিকাংশই তাঁহার প্রাপ্য হইবে। কিন্তু আলাউদ্দীন বহু কষ্টে যে সম্পদ্ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার কণামাত্রও অপরকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বৃদ্ধ রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজসভায় তাঁহার অনেক শত্রু আছে, সুতরাং তিনি সেখানে উপস্থিত হইতে সাহস পাইতেছেন না। জালালউদ্দীন তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং অরক্ষিত ভাবে জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। আলাউদ্দীন সসৈন্যে মহাসমারোহে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার শত্রুগণের মধ্যে ঐক্য ছিল না, সুতরাং তাহারা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

জালালউদ্দীনের হত্যা

জালালউদ্দীন ও আলাউদ্দীন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির সুলতান ছিলেন। কুটিল, নির্ম্মম আলাউদ্দীনের কার্য্যসিদ্ধি কালে ন্যায় অন্যায় বিচার বোধ থাকিত না, তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষারও সীমা ছিল না। তিনি কোন কাজই সম্পূর্ণরূপে শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। আলাউদ্দীন বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১২৯৬-১৩১৬ খৃঃ)। এই সময়ে সমগ্র দেশ তাঁহার অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত মোগলগণ যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, আলাউদ্দীন তাহাদের সকলকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। একদিনে ১৫ হইতে ৩০ হাজার মোগল বিদ্রোহী নিহত হইয়াছিল।

আলাউদ্দীনের চরিত্র

এই নিষ্ঠুর সুলতানই আবার একটি নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও পৃথিবী বিজয়ের কল্পনা পোষণ করিতেন। কিন্তু শেষে এই সকল অদ্ভুত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলি ধ্বংসের আয়োজন করিলেন।

দুরাকাঙ্ক্ষা

তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর নানারূপ অশান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। মোগলেরা দুই বার ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সিংহাসনলুব্ধ আত্মীয়গণ আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া রাজ্যলাভের অভিপ্রায়ে তিনবার বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু আলাউদ্দীন দৃঢ়তার সহিত এই সকল বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। তারপর বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল ধনসম্পদের আতিশয্য, মদ্যপান ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিবাহ দ্বারা ঐক্য স্থাপনের ফলেই রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও অনাচার বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতরাং মদ্যপান নিষিদ্ধ হইল। সুলতান নিজের পানপাত্রগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সুলতানের অনুমতি ব্যতীত মিলিত হইতে পারিতেন না। সুলতানের সম্মতি ব্যতীত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হইল। অতি তুচ্ছ বিষয়ের খবরও তিনি গুপ্তচরের সাহায্যে সংগ্রহ করিতেন। রাজ্যমধ্যে কেহ যাহাতে ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া না উঠিতে পারে সেজন্য সাধারণের উপর দুর্ব্বহ করভার চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দমন নীতি

হতভাগ্য হিন্দুগণই এই অত্যাচারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপদ্রুত হইতে লাগিল। সৈন্য বিভাগের ব্যয় কমাইবার জন্য সুলতান প্রত্যেক জিনিষের একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়াছিলেন। চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার নিজের

হিন্দুদের দুর্দ্দশা

ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন। এই সকল স্বেচ্ছাচারমূলক পদ্ধতি সফল হইয়াছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু যতদিন আলাউদ্দীনের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন দেশে সুখ ও সমৃদ্ধির চিহ্নমাত্র ছিল না, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

আলাউদ্দীন দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি স্বয়ং সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সেনাপতিদিগের মধ্যেও সামরিক প্রতিভার অভাব ছিল না। ইহাদের মধ্যে জাফর খাঁ, নসরৎ খাঁ, মালিক কাফুর, খাজা হাজি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুজরাট বিজয়

গুজরাট জয় করিবার জন্য ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁর নেতৃত্বে একদল সাহসী সৈন্য প্রেরণ করেন। গুজরাটরাজ দ্বিতীয় কর্ণদেবের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না। মুসলমান সৈন্যদল গুজরাটের প্রসিদ্ধ বন্দরগুলি হইতে রাশি রাশি ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করিল। রাণী কমলাদেবী তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। পরে তিনি আলাউদ্দীনের প্রিয়তমা মহিষী হইয়াছিলেন। অপর বন্দীদের মধ্যে খোজা মালিক কাফুরের নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তরকালে তিনি আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কমলাদেবী

মালিক কাফুর

রণথম্ভোর বিজয়

গুজরাট অনায়াসে বিজিত হইলেও রণথম্ভোর জয় করা খুব সহজ হয় নাই। কুতব ও ইল্‌তুৎমিস এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুত বীরগণ ইহা পুনরায় অধিকার করেন এবং এই সময়ে বীর হামির দেব রণথম্ভোরের রাজা ছিলেন। আলাউদ্দীনের কয়েকজন বিদ্রোহী কর্ম্মচারীকে আশ্রয় দানের ফলে সুলতান তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

কিন্তু রাজপুতদিগের বীরত্বে প্রথমবার মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল। ইহার পরে হামির দেব নিহত হইলে ১৩০১ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন কর্তৃক রণথম্ভোর অধিকৃত হয়। সুলতান স্বয়ং দ্বিতীয়বারের অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চিতোর ও পদ্মিনী

১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। কথিত আছে যে মেবাররাজ রাণা রতনসিংহের মহিষী পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুতগণ অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিতেন। রাণী পদ্মিনী আলাউদ্দীনের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। চিতোর অধিকৃত হইলে সুলতান তাঁহার পুত্র খিজির খাঁকে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে হামিরের নেতৃত্বে রাজপুতগণ পুনরায় এই রাজ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার পর চিতোর আবার মেবারের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল।

দেবগিরি আক্রমণ

উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণাপথেই আলাউদ্দীনের বাহিনী অধিকতর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে একদল দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য লইয়া মালিক কাফুর দেবগিরিতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাজিত করিয়া কর দিতে বাধ্য করিলেন। ইহার এক বৎসর

বরঙ্গল

পরে কাফুর বরঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্রদেবকেও করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দোরসমুদ্রের হোয়সলরাজ তৃতীয় বীর বল্লাল তাঁহার নিকট পরাজিত হন।

দোরসমুদ্রের হোয়সল

পাণ্ড্যগণও মুসলমান সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিল না। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে কাফুর বিজয়-গৌরবে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হইয়া রামেশ্বরমে একটি মস্‌জিদ

নির্ম্মাণ করাইলেন। এইরূপে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর সেতু পর্য্যন্ত আলাউদ্দীনের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। রামচন্দ্রদেবের পুত্র একবার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাফুরের হস্তে মরাঠা-বীর পরাজিত ও নিহত হইলেন।

বিদ্রোহ দমন

প্রায় সমগ্র ভারত জয় করিয়া আলাউদ্দীন গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে সুখ ছিল না। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাফুরের চক্রান্তে স্ত্রী এবং পুত্রগণের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। অত্যাচারী সুলতান বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার পরম আদরের খোজার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া রহিলেন। অনেকেই সন্দেহ করেন যে কাফুরের চক্রান্তেই আলাউদ্দীনের অপমৃত্যু হইয়াছিল।

আলাউদ্দীনের শেষ জীবন

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফুরই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন। রাজপরিবারের নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে অনেকেই ইতিপূর্ব্বে তাঁহার চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন। পরলোকগত সুলতানের এক নাবালক পুত্রের নামে কাফুর রাজ্য শাসন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পঁয়ত্রিশ দিন পরেই কাফুরকে হত্যা করিয়া আলাউদ্দীনের পুত্র কুতবউদ্দান মুবারক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

কাফুরের হত্যা

কুতবউদ্দীন মুবারক :—অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে নূতন সুলতানের আমলে দিল্লীর পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে। রামচন্দ্রদেবের জামাতা হরপালদেব দেবগিরিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে সুলতান কঠোরতার সহিত তাঁহাকে দমন করিলেন। কিন্তু ইহার পরেই একজন হীনবংশজাত

দেবগিরি অভিযান

গুজরাটীর হস্তে রাজ্যের ভার ছাড়িয়া দিয়া যুবক সুলতান বিলাসে গা ঢালিয়া দিলেন। সুলতানের প্রীতিভাজন খুস্রু প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত করার অভিপ্রায়ে নির্লজ্জভাবে তাঁহার পাপাসক্তিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে প্রভুকে হত্যা করিয়া খুস্রু নিজেই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে খল্‌জী বংশের অবসান হইল এবং মহা-পরাক্রান্ত আলাউদ্দীনের স্থলে একজন নীচ-বংশীয় অন্ত্যজ দিল্লীর রাজা হইলেন। নূতন সুলতান নাসিরউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া তাঁহার হীনবংশজাত বন্ধুদিগের মধ্যে উচ্চ উপাধি ও পদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্ত্তা গাজি মালিক তুঘ্‌লুক্ সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে খুস্রু পরাজিত হইলেন এবং বিজয়ী সেনাপতির আদেশে তাঁহার শিরচ্ছেদ হইল। ইহার পর সেনাপতিদিগের সম্মতিক্রমে গাজি মালিক দিল্লীর রাজা হইলেন। ইবন বতুতার মতে নূতন রাজা করোণিয়া তুর্কী। মার্কো পোলো বলেন যে করোণিয়ারা মিশ্রজাতি অর্থাৎ তুর্কী পিতার ও ভারতীয় মাতার সন্তান। অন্যান্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে গাজি মালিকের পরিবারের সহিত সম্ভ্রান্ত জাঠগণের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল ; সুতরাং এই নূতন রাজবংশকে বিদেশী মনে করা সঙ্গত হইবে না।

খুস্রুর সিংহাসন অধিকার

করোণিয়া তুর্কী

ঊনবিংশ অধ্যায়

তুঘ্‌লুক্‌বংশীয় রাজগণ

গিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লুক্‌ শাহ:—গাজি মালিক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লুক্‌ শাহ নাম ধারণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকগণের আমলে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল তিনি তাহার দূরীকরণে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল, দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। তাঁহার অনুগ্রহে করভারের লাঘব হইল, কৃষির উন্নতি সাধিত হইল এবং ডাক বিভাগের নূতন ব্যবস্থায় সাধারণের অনেক সুবিধা হইল।

প্রথম তুঘ্‌লুক্‌ শাহের সাফল্য

দিল্লীর অব্যবস্থার সুযোগে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের হিন্দু রাজগণ হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিলেন। সুলতান তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ফক্করউদ্দীন মহম্মদ জৌনাকে বরঙ্গলের কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র জৌনার হস্তে বন্দী হইলেন। ওদিকে বাংলার অধিকার লইয়া বল্‌বনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। সেকালে এই দেশটিতে বাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই ছিল। সম্রাট্‌ সেখানে গিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া বাংলায় দিল্লীর প্রভুত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুলতান যখন দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন, তখন পিতার অভ্যর্থনার জন্য জৌনা একটি

বাংলা

কাষ্ঠমণ্ডপ তৈয়ার করিয়াছিলেন। মণ্ডপটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ায় গিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লুক্‌ শাহের মৃত্যু হয়। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবন বতুতা মনে করেন যে সম্রাট্‌কে হত্যা করিবার জন্যই এই কাষ্ঠমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল (১৩২৫ খৃঃ)।

সম্রাটের মৃত্যু

মহম্মদ বিন তুঘ্‌লুক্‌ :—পিতার মৃত্যুর পর জৌনা "মহম্মদ শাহ" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতিহাসে তিনি "পাগলা রাজা" নামে পরিচিত। তিনি একদিকে যেমন অসাধারণ প্রতিভা, অকৃত্রিম বিদ্যানুরাগ, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই নিষ্ঠুরতা, অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য তাঁহার সকল সাধু চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। একাধারে এরূপ বিপরীত গুণের সমাবেশ বাস্তবিকই বিরল। মরক্কোর মুসলমান পর্য্যটক ইবন বতুতা মহম্মদের শাসন সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সম্রাট্‌ তাঁহাকে দিল্লীর প্রধান কাজির পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি সুলতানের চরিত্র সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে দেখা যায়, এই রাজা যেমন দানশীল তেমনি নির্ম্মম ছিলেন। প্রায়ই দেখা যাইত যে তাঁহার দ্বারে হয় কোনও দরিদ্র ধনলাভ করিতেছে না হয় কোন হতভাগ্য প্রাণ হারাইতেছে। একদিকে যেমন তাঁহার উদারতা ও সৎসাহসের অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল, তেমনি তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। তিনি অতিশয় বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ এবং সুবিচারক ছিলেন। তথাপি তাঁহার ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁহার রাজ্যজয়ের দুর্জ্জয় নেশায় বহু লোকক্ষয় এবং

নূতন রাজার চরিত্রের অপূর্ব্ব অসামঞ্জস্য

অর্থের অপচয় হইয়াছে এবং তাঁহার অর্থনৈতিক সংস্কার একটি বিরাট ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। যদিও বিদ্রোহ দমন ও অশান্তি নিবারণে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

মহম্মদের ব্যর্থতা

তুঘ্‌লুক্‌-পুত্র মহম্মদ যে সকল কাজ করিতে চাহিতেন, কল্পনায় তাহা সুসাধ্য বলিয়া মনে হইলেও কাজে তাহা কখনও সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। উদ্ধত প্রকৃতি বলিয়া তিনি কাহারও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। অকপট, সরল সমালোচনা তাঁহার ভাল লাগিত না। জনসাধারণের মতামতের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না এবং তাঁহার শাসন-পদ্ধতি পছন্দ করিত না বলিয়া তিনি প্রজাদিগের প্রতি রুষ্ট হইতেন। কেহ কেহ বলেন, যে গোঁড়া মুসলমানগণ তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না বলিয়াই মহম্মদের এত অপযশ। কিন্তু বিদেশী পর্য্যটক ইবন বতুতা যে মহম্মদের অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। তিনিও সম্রাটের বহু অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জোর করিয়া যে কাহারও উপকার করা চলে না, মহম্মদ তাহা বুঝিতেন না। হয়তো মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে এই অজ্ঞতাই তাঁহার ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ।

মহম্মদের কর্ম্মপদ্ধতি ও মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা

শাসনভার হাতে লইয়া তিনি করবৃদ্ধি করিলেন। ফলে প্রজারা কৃষিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। সে সময় কৃষিক্ষেত্রের অভাব ছিল না, সুতরাং বেশি রাজস্ব চাহিলেই কৃষকেরা অন্যত্র চলিয়া যাইত। মহম্মদ মনে করিলেন যে বলপ্রয়োগে এই সকল অবাধ্য প্রজাকে বশীভূত করিবেন। যে কোনও প্রকার অন্যায় নিবারণে বলপ্রয়োগই

অতিরিক্ত করভার

যে সর্ব্বোত্তম প্রতিকার সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তাই দরিদ্র কৃষকদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচারের জন্য তিনি সৈন্যদল ছাড়িয়া দিতেন এবং তাহারা বন্যজন্তুর ন্যায় এই সকল অসহায় কৃষকদিগকে হত্যা করিত। সম্রাটের এই নির্ম্মম প্রতিহিংসানীতির ফলে রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর স্থান সমূহ রাজসৈন্য ও প্রজাদের সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইল।

রাজধানী পরিবর্ত্তন

মহম্মদ দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি দিল্লীর অধিবাসিগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে তাঁহার সিদ্ধান্ত একেবারে অসমীচীন হয় নাই। নববিজিত দাক্ষিণাত্য প্রদেশের প্রতি তখন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পুরাতন রাজধানীর লোকদিগকে নূতন রাজধানীতে যাইতে বাধ্য করা সঙ্গত হয় নাই। দুই দুইবার রাজধানী পরিবর্ত্তনের চেষ্টা সম্রাটের অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচায়ক।

বিশ্ববিজয় স্বপ্ন

আলাউদ্দীন খলজীর ন্যায় মহম্মদও দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেন। খোরাসান এবং ইরাক জয়ের আশায় তিনি এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ অভাবে তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

নিম্ন হিমালয় অভিযান

সুলতান তিব্বত এবং চীন জয়ের মত উদ্ভট পরিকল্পনা কখনও করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। হিমালয় বা হিমাচলের নিম্নভাগে একদল দুর্দ্দান্ত লোককে আক্রমণ করাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুলতানের সেনাবাহিনীর বহু ক্ষতি হইলেও এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়

নাই। আক্রান্ত প্রদেশের অসভ্য অধিবাসীরা সম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মহম্মদ সুবর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে তাম্রমুদ্রা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে রাজকোষের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। চীন দেশে ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই কাগজের নোট প্রচলিত হইয়াছিল। স্নুতরাং মহম্মদ যখন কাগজের নোটের পরিবর্ত্তে তামার নোট প্রচলনের সঙ্কল্প করিলেন অর্থনীতির দিক্ দিয়া তাঁহার কোন ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দেশের তৎকালীন অবস্থা এই প্রকার সংস্কারের উপযোগী ছিল না এবং সাধারণ লোকও ইহার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ নূতন মুদ্রা যাহাতে জাল না হইতে পারে তৎসম্পর্কে সুলতান কোনও সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। স্নুতরাং বহুল পরিমাণে তাম্রমুদ্রা জাল হইতে লাগিল। প্রত্যেক কর্ম্মকারই তাহার নিজ কারখানায় তাম্রমুদ্রা তৈয়ার করিতে লাগিল এবং সেই সকল মুদ্রাতেই রাজকোষ ভরিয়া গেল। ইহাদের প্রকৃত মূল্য এত কম ছিল যে সেগুলি পাথরের টুক্‌রা এবং খোলাম কুচির অধিক দামে বিকাইত না। সুলতান ভুল বুঝিতে পারিয়া এই নীতি প্রত্যাহার করিলেন। রাজকোষে যত জাল মুদ্রা আনা হইয়াছিল তিনি তাহার প্রত্যেকটির জন্য প্রকৃত মুদ্রার মূল্য দিয়াছিলেন। ইহাতে সরকারী তহবিলের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা সামান্য নহে।

তাম্রমুদ্রা

মহম্মদের এক একটি অদ্ভুত সঙ্কল্পে সাধারণের দুঃখ দুর্গতি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। লোকের অসন্তোষের সীমা রহিল না এবং এই সকল অশান্তি এবং অসন্তোষ দুঃসহ হওয়ায় চারিদিকে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। সুলতান প্রথমে এই সকল বিদ্রোহ সহজেই দমন

করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যে নির্ম্মম দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন তাহা ভয়াবহ। রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহার পিসতুত ভাই বহাউদ্দীন গুরসাস্প্ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার চামড়া তুলিয়া লওয়া হইল। ভাতের সহিত তাঁহার মাংস সিদ্ধ করিয়া তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং অবশিষ্ট অংশ কতকগুলি হাতীকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার চামড়ার মধ্যে খড় ভরিয়া উহা রাজ্যের বিভিন্ন শহরে দেখান হয়। সিন্ধুদেশের বিদ্রোহী মালিক বহরাম আইবার অনুচরদিগের জীবন্ত অবস্থায় চামড়া তুলিয়া লওয়া হয়, কিন্তু এই সকল নৃশংস অত্যাচারেও সম্রাটের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। পুরাতন জনপ্রিয় শাসকবর্গের স্থলে তিনি যতই নীচ বংশোদ্ভব অনুগৃহীত লোকদিগকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন ততই নূতন গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইতে লাগিল। জালালুদ্দীন আহশান শা মা'বারে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু সম্রাটের পীড়া হওয়ায় বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা হয় নাই। শত-নায়ক বা আমীরান-ই-সদাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের ফলে রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে হিন্দুগণ আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন। বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান কর্ম্মচারিগণও দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করিলেন। বাংলার শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং গুজরাটে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। একই সময় চারিদিকের বিদ্রোহ দমনের সাধ্য মহম্মদের ছিল না। এক জায়গায় বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আর এক দিক্ হইতে বিদ্রোহের সংবাদ আসিতে লাগিল। তিনি যখনই নূতন বিদ্রোহ

বিদ্রোহ

মা'বার রাজ্য (মদুরা)

বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা

দমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন তখনই অন্য স্থানের বিদ্রোহিগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিত। এইরূপে বিব্রত ও বিপন্ন হইয়া সুলতান যখন গুজরাট এবং সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন করিতেছিলেন, সেই সময় ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক বুদাউনী লিখিয়াছেন, "এইরূপে রাজা তাঁহার প্রজাপুঞ্জের হস্ত হইতে এবং প্রজাপুঞ্জও তাঁহাদের সুলতানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।"

ফিরুজ বিন রজব (অর্থাৎ রজবের পুত্র) :—মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সৈন্যদল নায়কের অভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে মৃত সুলতানের পিতৃব্যপুত্র ফিরুজকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। ফিরুজ অতিশয় শান্ত ও দয়ালু নরপতি ছিলেন। যে সকল প্রদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল সেগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সামরিক অভিযানগুলিও তেমন সফল হয় নাই। তিনি সিন্ধুর বিদ্রোহীদিগকে দমন এবং নগরকোট অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাংলায় দিল্লীর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সেখানে একটি স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নূতন সুলতানকে তাঁহার স্বাধীনতা একরূপ মানিয়া লইয়াই ফিরিতে হইল।

বাংলার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান

হিন্দু রাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও ফিরুজ অত্যন্ত হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। এতদিন ব্রাহ্মণদিগকে জিজিয়া কর দিতে হয় নাই। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে এই কর দিতে বাধ্য করিলেন। তাঁহার আমলে হিন্দুদিগের প্রকাশ্য ধর্ম্মাচরণে বাধা দেওয়া হইত এবং একজন ব্রাহ্মণকে এই অপরাধে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হইয়াছিল। ফিরুজের রাজত্বকালে কেবল হিন্দুগণই উৎপীড়িত হইয়াছিল তাহা নহে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের

ফিরুজের অনুদারতা

মুসলমানগণও তাঁহার কঠোরতা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। যাহাদিগকে তিনি ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদিগকেই অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।

ফিরুজের শাসন সংস্কার

এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও ফিরুজ যে একজন দয়ালু রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি অনেক অন্যায় ও অসঙ্গত শুল্ক ও কর তুলিয়া দিয়াছিলেন। অপরাধীদের অঙ্গচ্ছেদ প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের শাসনকালে অপরাধীর পা, নাক, কাণ প্রভৃতি কাটিয়া দেওয়া হইত; চক্ষু উপড়াইয়া দেওয়া, গলার মধ্যে জলন্ত সীসা ঢালা, মুগুর দিয়া হাত পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া, জীবন্ত অবস্থায় শরীর দগ্ধ করা, হাত, পা ও বুকের মধ্য দিয়া লৌহ শলাকা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিরা কাটা, করাত দিয়া দেহ ছিন্ন করা এবং এইরূপ আরও অনেক প্রকার নৃশংস দণ্ডদানের ব্যবস্থা ছিল। মহা দয়ালু আল্লা তাঁহার দয়া লাভের জন্য মুসলমানদিগের অসঙ্গত হত্যা নিবারণ করিতে এবং লোকের প্রতি নৃশংস অত্যাচার বন্ধ করিতে তাঁহার এই দাস আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।" তিনি অনেকগুলি মস্‌জিদ ও বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অসহায় রোগীদের সাহায্যকল্পে উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তিনি চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য অনেকগুলি খাল খনন করা হইয়াছিল। দিল্লীর প্রান্তস্থিত কতকগুলি স্থান শহরের অন্তর্ভূত করিয়া বহু উদ্যান সংযোগে রাজধানীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

নগর নির্ম্মাণ

দিল্লীর প্রভুত্ব পূর্ব্বের ন্যায় সুদূর প্রসারিত না থাকিলেও সমগ্র দেশ কৃষি-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

ফিরুজের শেষ জীবন সুখের হয় নাই। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে তাঁহার

শাসন ক্ষমতাও হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রভুত্বলোলুপ পুত্র ও পৌত্রদিগকে দমন করা সাধ্যাতীত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের সহিত আপোষ করিয়াই তাঁহাকে রাজপদ রক্ষা করিতে হইল। কিন্তু তাঁহারা সহজে শান্ত হন নাই। দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন ফিরুজের মৃত্যু হয়, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার এক পৌত্র শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। ফিরুজের মৃত্যুর সঙ্গেই তুঘ্‌লুক্ বংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হইল। অনেকে আকবরের সহিত ফিরুজের তুলনা করিয়া থাকেন।

ফিরুজের পরবর্ত্তী শাসকগণ ঃ—ফিরুজের পরে তুঘ্‌লুক্ বংশের যে কয়জন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেই অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য। দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী অল্প কতটুকু স্থানে তাঁহারা প্রভুত্ব করিতেন; কিন্তু সেখানেও কেহ একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। ফিরুজের উত্তরাধিকারিগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা অমাত্যগণের খেলার সামগ্রী ছিলেন। প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীন আত্মকলহে লিপ্ত হইতেন এবং রাজকোষের অর্থ নষ্ট করিতেন। দিল্লীর রাজক্ষমতা যখন এইরূপে খর্ব্ব হইয়া পড়িল, তখন বাহিরের এক প্রবল শত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত হইল।

পুতুল রাজা

তৈমুর ঃ—সমরকন্দের অধিপতি আমীর তৈমুর ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লী তখন মুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও তিনি হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ধনলালসাতেই ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানেরা একত্রে এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন;

কিন্তু তাঁহারা শোচনীয়রূপে পরাজিত হইলেন। মানুষের জন্য তৈমুরের বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না। দিল্লীর নিকটে পৌঁছিলে তিনি এক লক্ষ বন্দীকে অবলীলাক্রমে হত্যা করিলেন।

দিল্লী লুণ্ঠন

তারপর লুণ্ঠন ও নরহত্যার নৃশংস লীলায় দিল্লী নগরী শ্মশানে পরিণত হইল। মনুষ্যরক্তে রাজপথ রঞ্জিত করিয়া যখন তৈমুর দেশে ফিরিয়া গেলেন "তখন দিল্লীতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হইল। ধ্বংসের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এইবারে শেষ হইল। তৈমুর যাহাদিগকে হত্যা করিতে পারেন নাই, মহামারী তাহাদিগকে ধ্বংস করিল। আর কেহই বাকী রহিল না। পূর্ণ দুই মাস কাল দিল্লীর আকাশে একটি পাখী পর্য্যন্ত উড়িতে দেখা যায় নাই।" এই ভয়ানক বিপৎপাতে তুঘ্‌লুক্‌ বংশের ক্ষমতা লুপ্ত হইল। সুতরাং দিল্লীর শাসনভার শীঘ্রই অপরের হস্তে চলিয়া গেল।

তৈমুর ভারত আক্রমণ করিলে তুঘ্‌লুক্‌ বংশের শেষ রাজা মামুদ প্রাণভয়ে গুজরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ একজন প্রাদেশিক শাসক পলাতক সুলতানকে দীর্ঘকাল আশ্রয় দিতে সাহস পাইলেন না। অবশেষে সুলতান মালবরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার পুরাতন রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তখন দিল্লীর অবস্থা আরও শোচনীয়। রাজ্যের পূর্ব্বগৌরব আর ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল না। তেইশ বৎসরকাল নামে মাত্র রাজা থাকিয়া ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে মামুদ শাহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সহিত তুঘ্‌লুক্‌ বংশের অবসান হইল।

বিংশ অধ্যায়

সৈয়দ ও লোদী রাজবংশ

সৈয়দ বংশ ঃ—মামুদ শাহের মৃত্যুর পরে দৌলত খাঁ লোদী কিছুকাল দিল্লী শাসন করিয়াছিলেন। ইনি মামুদের রাজসভার একজন অমাত্য ছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই মূলতানের শাসনকর্ত্তা খিজ্র খাঁ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করিলেন। খিজ্র খাঁ হজরত মহম্মদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আরবের অধিবাসী হইলেও মহম্মদের বংশধর ছিলেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খিজ্র খাঁ নিজে কখনও রাজোপাধি ধারণ করেন নাই। তৈমুর ও তাঁহার পুত্রের নামেই তিনি শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। বঙ্গদেশ, জৌনপুর, মালব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশ একে একে দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণে একটি প্রবল হিন্দু রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। যে সাম্রাজ্য একদিন হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা এখন দিল্লী ও তৎসন্নিহিত কয়েকটি জিলায় সীমাবদ্ধ হইল। দিল্লীর সুলতান বলিতে এই সময় এই সঙ্কীর্ণ স্থানের অধিপতিকেই বুঝাইত। সৈয়দ বংশের চারিজন রাজা ৩৭ বৎসরকাল দিল্লী শাসন করিয়াছিলেন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে শেষ রাজা আলাউদ্দীন, বহলুল লোদীকে পূর্ব্বপুরুষের সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন। বহলুলই দিল্লীর প্রথম আফগান বা পাঠান রাজা।

খিজ্র খাঁ

হিন্দু জাগরণ

সৈয়দবংশের পতন

লোদী রাজগণ :—বহলুল লোদীর উচ্চাভিলাষের অন্ত ছিল না। অতিশয় হীন অবস্থা হইতে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময় দিল্লীর পূর্ব্বগৌরব না থাকিলেও একজন আফগান সেনাপতির পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে এই অধিকার অর্জ্জন করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। জৌনপুর আক্রমণ করিয়া তিনি তথাকার রাজাকে পরাভূত করিয়াছিলেন। শাসক ও সেনাপতি হিসাবে তিনি তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিল্লীশ্বর হইতে অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শাসনকার্য্যে তাঁহার নিকট আত্মীয় এবং জ্ঞাতি বন্ধুগণ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বহলুল লোদী

সিকন্দর লোদী :—১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বহলুলের তৃতীয় পুত্র নিজাম খাঁ সুলতান সিকন্দর শাহ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। লোদী বংশে যে তিনজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সিকন্দর শাহই সর্ব্বপ্রধান। জৌনপুর বিজয়ের পরে তিনি বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। প্রাদেশিক শাসকগণের ঔদ্ধত্য তিনি ক্ষমা করিতেন না। জমিদারগণ তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার করিতে সাহস পাইতেন না। সিকন্দরের সুশাসনের ফলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইল। তাঁহার নিকট কাহারও অবিচারের আশঙ্কা ছিল না। অতি দরিদ্র ব্যক্তিও সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অভিযোগ জানাইতে পারিত। কিন্তু এই সকল সদগুণ সত্ত্বেও সিকন্দর শাহ অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং তাহাদের প্রতি অতিশয় কঠোর ব্যবহার করিতেন। হিন্দুদের স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মাচরণের সাধ্য ছিল না। তীর্থস্থানগুলিতে

পরাক্রমশালী শাসক

হিন্দুর ধর্ম্মাচরণে অসহিষ্ণুতা

ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে মথুরার প্রাচীন দেবমন্দির বিনষ্ট হইয়াছিল।

ইব্রাহিম লোদী :—১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন সুলতান যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না ; কিন্তু বুদ্ধি ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব তাঁহাকে সকলের নিকট অপ্রিয় করিয়া তুলিল। তাঁহার অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় ওমরাহগণ রুষ্ট হইলেন, এবং রাজ্যের নানা স্থানে আবার বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। অবশেষে বিহারে দরিয়া খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং লাহোরের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদী ইব্রাহিমকে সমুচিত শিক্ষা দানের ইচ্ছায় কাবুলের রাজা বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। পাণিপথের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদী নিহত হইলেন। এইরূপে লোদী বংশের অবসান, এবং দিল্লীতে পুনরায় তুর্কী বংশের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। বাবর কখনও মোগল বলিয়া পরিচয় দেন নাই। তিনি এক বিখ্যাত রাজবংশের সন্তান। তাঁহার মাতা মোঙ্গল চিঙ্গিস খানের বংশের কন্যা হইলেও তাঁহার পিতা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরের বংশধর। বাবরের পিতৃকুল তুর্কীবংশোদ্ভব, তথাপি ভারতের ইতিহাসে তাঁহার বংশধরেরা মোগল বলিয়া পরিচিত।

সর্ব্বত্র অসন্তোষ

পাণিপথের যুদ্ধ

একবিংশ অধ্যায়

স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ

দিল্লী সাম্রাজ্যের পতন ঃ—দিল্লীর মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন গৌরব এই সময় একেবারে লোপ পাইয়াছিল। প্রথম তুঘ্লুক্ শাহের পুত্র মহম্মদের সময়ে রাজ্যের যে অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল তৈমুরের আক্রমণে তাহা সম্পূর্ণ হইল। বহলুল ও সিকন্দর সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গ বা দক্ষিণের প্রবল স্বাধীন রাজ্যগুলি জয় করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ছিল। অবশেষে তৈমুরের বংশধরগণ আসিয়া পুনরায় এই সকল প্রদেশে দিল্লীর আধিপত্য স্থাপন করেন। সুতরাং এইখানে এই সকল স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দিল্লীর মুসলমান সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন

বঙ্গদেশ ঃ—সেনবংশের অধঃপতনের পর বাংলায় মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ প্রায়ই স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতেন। এই দেশের সম্পদ্ স্বভাবতঃই তাঁহাদিগকে বিদ্রোহে প্রলুব্ধ করিত। সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে অবস্থিত থাকায় দিল্লীর সুলতানগণের পক্ষে অতদূর হইতে আসিয়া বাংলার বিদ্রোহীদিগকে দমন করা সহজ ছিল না। এই কারণেই ইল্‌তুৎমিস ও বল্‌বন্‌কে বাংলার বিদ্রোহ দমনে এত বেগ পাইতে হইয়াছিল। বল্‌বনের বংশধরগণ দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবেই বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। অবশেষে গিয়াসউদ্দীন

বল্‌বনের বংশধরগণ

তুঘ্‌লুক্ শাহ (১) পুনরায় এই প্রদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। স্বীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তুঘ্‌লুক শাহের পুত্র মহম্মদ বঙ্গদেশকে তিনভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক অংশে একজন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে সুলতানের উদ্দেশ্য সফল হইল না। ১৩৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ফখ্‌রউদ্দীন মুবারক শাহ সোণারগাঁওএ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এদিকে পশ্চিম বঙ্গে আলাউদ্দীন আলী শাহ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। অবশেষে সাম্‌সুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমগ্র প্রদেশটি করায়ত্ত করেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ সত্তর বৎসরকাল (১৩৪৫-১৪১৪ খৃঃ) বাংলা শাসন করেন। তাঁহার সময় দিল্লীর সুলতান ফিরুজ বিন রজব স্বয়ং বঙ্গদেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সাম্‌সুউদ্দীন ইক্‌ডালার মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ফিরুজ শাহ সে বৎসর বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। সাম্‌সুউদ্দীনের পুত্র সিকন্দরের শাসনকালে সুলতান ফিরুজ আর একবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু সেবারেও তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই। সিকন্দরের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম সম্ভবতঃ এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। অমর কবি হাফিজের অনুরাগী বলিয়া তিনি ইতিহাসে সুপরিচিত। ১৪১০ খৃষ্টাব্দে ভাতুড়িয়া ও দিনাজপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা গণেশ প্রবল হইয়া উঠিলেন। মুসলমান লেখকগণের মতে রাজা গণেশ স্বাধীন নরপতিরূপে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যদু তৎপরে রাজা হন। কিন্তু তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দীন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়কার প্রচলিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজা

বঙ্গ বিভাগ

ফিরুজের ব্যর্থতা

গিয়াসউদ্দীন আজম

গণেশের সময়ের একটি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে রাজা গণেশ হয়তো নিজে রাজোপাধি ধারণ করেন নাই। কোনও মুসলমানকে নামে মাত্র রাজা রাখিয়া হয়তো তিনি রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কেহ বলেন দনুজমর্দ্দনদেব নামে যিনি বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তিনিই রাজা গণেশ। দনুজমর্দ্দনের কাহিনী রহস্যাবৃত। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। অথচ সুদূর পাণ্ডুয়া, সুবর্ণগ্রাম ও চট্টগ্রামের টাঁকশালে প্রস্তুত তাঁহার নামাঙ্কিত অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা গণেশ ১৪১৪ খৃঃ

দনুজমর্দ্দন ১৪১৭-১৮ খৃঃ

রাজা গণেশের বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ইহার পরে ইলিয়াসশাহী বংশের হস্তে রাজক্ষমতা আবার ফিরিয়া আসে। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে একজন হাবসী খোজা তদানীন্তন রাজাকে হত্যা করিয়া বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিলেন। হাবসীদিগের অত্যাচারে চারিদিকে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা প্রবল হইয়া উঠে। অবশেষে ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সকলে মিলিয়া সৈয়দ হোসনকে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। হোসেন শাহ্ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও সুবিবেচক ছিলেন। বাংলার শাসকগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নরপতি। তিনি প্রাসাদরক্ষী সেনাদলের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং হাবসীদিগকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। উড়িষ্যার প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তারের পরে তিনি কোচবিহারের অন্তর্গত কামতাপুর আক্রমণ করেন। তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা গিয়াসউদ্দীন মামুদ, শের খাঁ স্থর কর্ত্তৃক

আবিসিনিয়ার শাসকগণ

হোসেন শাহ

বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহ পাঠান রাজা দায়ুদকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করেন।

জৌনপুর :—ফিরুজ-বিন রজব জৌনপুর নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে খাজা জাহান নামে দিল্লীর এক ওমরাহ জৌনপুরে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ শর্কী বংশ নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পরে বহলুল লোদী এই বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করিয়া জৌনপুর অধিকার করেন। শর্কী রাজগণ শিক্ষা ও শিল্পানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন

জৌনপুরের স্থাপত্যশিল্প

মালব :—আলাউদ্দীন খল্‌জীর আমলে মালব রাজ্য প্রথম দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তারপর দিল্লীর সুলতানদিগের ক্ষমতা যখন হ্রাস হইতে লাগিল, তখন অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় মালবের শাসনকর্ত্তা দিল্‌ওয়ার খাঁ ঘুরীও স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঘুরীবংশের এক অত্যাচারী ও অপদার্থ রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার মন্ত্রী মামুদ খাঁ মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মামুদ প্রাচীন খল্‌জী রাজগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ছিলেন না অথবা তাঁহার সাহস এবং রণ-নৈপুণ্যেরও অভাব ছিল না। গুজরাট, দিল্লী ও দক্ষিণাপথের মুসলমান নৃপতি এবং মেবারের রাণা কুম্ভের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র দ্বিতীয় মামুদের রাজত্বকালে বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দুগণ নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে

দিল্‌ওয়ার খাঁ ঘুরী

খল্‌জী সুলতানগণ

গুজরাটের বাহাদুর শাহ মালব দেশ জয় করেন। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতিগণ পাঠান রাজা বজ বাহাদুরকে পরাজিত করিয়া মালব মোগল রাজ্যের অন্তর্ভূত করেন।

আকবরের জয়

গুজরাট ঃ—গুজরাটের ধনসম্পদের খ্যাতি অন্যান্য প্রদেশের ঈর্ষার উদ্রেক করিত। এই দেশের উর্ব্বর জমি ও সমৃদ্ধিশালী বন্দরগুলির রাজস্ব হইতে যথেষ্ট অর্থাগম হইত। মালবের ন্যায় এই রাজ্যটিও প্রথমে আলাউদ্দীন খল্‌জী কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তারপর অনেক কাল ইহা দিল্লীর সুলতানের অধীনেই শাসিত হইতেছিল। ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁর আমলে গুজরাট আবার স্বাধীন হয়। জাফর খাঁ জাতিতে রাজপুত ছিলেন, কিন্তু বাল্যকালেই তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর জাফর মজফ্‌ফর শাহ উপাধি ধারণ করেন। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজা আহম্মদ শাহ আহম্মদাবাদ নগর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন মামুদ বেগরা। তাঁহার সময় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। তুর্কীগণের সহিত তিনিও তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। মামুদের গুণের অবধি ছিল না। তাঁহার শৌর্য্য যেমন স্মরণীয় ছিল, তেমনি ভোজন-শক্তিও অসাধারণ ছিল। 'এক বাটি মধু, এক বাটি মাখন এবং একশত হইতে দেড়শতটি কলা দিয়া তিনি তাঁহার প্রাতরাশ সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার দৈনিক খাদ্যের ওজন ছিল দশ হইতে প্রায় পনর সের এবং শয়নের পূর্ব্বে বিছানার দুই দিকে এক সের বা

জাফর খাঁ মজফ্‌ফর শাহ

আহম্মদ শাহ

মামুদ বেগরা

পর্ত্তুগীজদের সহিত সংগ্রাম

তাহার কিছু বেশি ভাত রাখিয়া দিতেন। ঘুম হইতে জাগিয়া যাহাতে খাদ্যের অভাব না হয় সেইজন্যই এইরূপ ব্যবস্থা হইত।' মামুদ বেগরার পৌত্র বাহাদুর শাহ মালব বিজয় করিয়া মেবারের রাজপুত রাণাকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইল। ইহার কিছু পরেই বাহাদুরের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে চারিদিকে রাজদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিল (১৫৩৭ খৃঃ) এবং নানাদলের কলহ বিরোধের সুযোগে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আকবর গুজরাট রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন।

বাহাদুর শাহ

বাহমনী রাজ্য ঃ—প্রাদেশিক মুসলমান নরপতিদিগের মধ্যে বহমনী রাজগণই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তুঘ্‌লুক্ শাহের পুত্র মহম্মদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষিণাপথের যে সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন হাসান নামক একজন সেনানায়ক। স্বাধীন হইবার পর তিনি আলাউদ্দীন বহমন শাহ উপাধি ধারণ করেন। তিনি পারস্য-বীর বহমনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। এইজন্য তৎপ্রতিষ্ঠিত বংশ বহমনী বংশ নামে পরিচিত হইল। হাসান দিল্লীর এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন এবং এই হিন্দু প্রভুর জন্যই তিনি রাজপদে উন্নীত হইয়াছিলেন বলিয়া যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা সম্ভবতঃ সত্য নহে। হাসান ক্ষিপ্রতার সহিত রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই পশ্চিমে কোঙ্কণ হইতে পূর্ব্বে বরঙ্গল ও উত্তরে বেরার হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইল। এ সময়ে কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড লইয়া বহমনী রাজগণের সহিত তাঁহাদের হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়নগরের রাজাদিগের প্রায় সর্ব্বদাই কলহ বিরোধ লাগিয়া থাকিত। আলাউদ্দীন

আলাউদ্দীন বহমন শাহ

বহমন শাহ গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যটিকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। মৃত্যুকালে আলাউদ্দীন তাঁহার বংশধরগণের জন্য যে রাজ্য রাখিয়া গেলেন তাহা যেমন বিশাল তেমনই পরাক্রান্ত। বহমনী রাজবংশের ইতিহাস আত্ম-কলহ, নরহত্যা ও ষড়্‌যন্ত্রের বিবরণে কলঙ্কিত।

রক্তরঞ্জিত ইতিহাস

বহমনী রাজগণের অনেকেই হিংস্র ও নৃশংস প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। বিজয়নগরের সহিত সংগ্রামে তাঁহারা অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নরনারী নির্ব্বিশেষে, বয়সের কথা বিবেচনা না করিয়া তাঁহারা নির্ম্মমভাবে বিজয়নগরের প্রজাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের ঘরেও শান্তি ছিল না। রাজপ্রাসাদে ষড়্‌যন্ত্র ও গুপ্ত চক্রান্ত লাগিয়াই থাকিত। এই বংশের চৌদ্দজন রাজার মধ্যে অন্ততঃ চারিজন ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। দুইজনের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং দুইজনের অতিরিক্ত মদ্যপানে মৃত্যু হইয়াছিল।

অষ্টম নরপতি ফিরুজ শাহ শাসনদক্ষতার জন্য সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দুইবার তিনি বিজয়নগরের বাহিনী পরাজিত করেন।

ফিরুজ শাহ বহমনী

তৃতীয়বারের যুদ্ধে ফিরুজ শাহেরই পরাজয় হইল। এই পরাজয়ের পরে তিনি আর অধিককাল জীবিত থাকেন নাই। ফিরুজ শাহের মৃত্যুতে বিজয়নগর ও বহমনী রাজাদিগের শত্রুতা লোপ পাইল না।

আহম্মদ শাহ

আহম্মদ শাহ আবার হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিলেন। বরঙ্গল জয় করিয়া তিনি গুলবর্গা হইতে বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। আহম্মদের পৌত্র হুমায়ুন ছিলেন নিষ্ঠুরতার জীবন্ত প্রতীক।

বহমনী রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকগণ অতঃপর দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মুসলমান ও তাঁহাদের হাব্‌সী

সহযোগিগণ আরব, তুর্কী, ইরাণী ও মোগল প্রভৃতি বৈদেশিক অভিজাত দিগের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন। এই সংঘর্ষ আবার ধর্ম্মগত পার্থক্যে আরও জটিল হইয়া উঠিল। দক্ষিণাপথের মুসলমানদের অনেকেই 'সুন্নী' এবং তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদলের অধিকাংশই 'শিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

রাজনৈতিক বিরোধ

খাজা মামুদ গওয়ান নামক এক ব্যক্তি ক্রমাগত তিনজন রাজার মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বে রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল এবং তিনিও রাজা ও প্রজার প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। খাজা মামুদ চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি 'শিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত বিদেশীদলের নেতা বলিয়া বিরুদ্ধদলের বিরাগভাজন হ'ন। তাঁহার শত্রুগণের কৌশলে মদ্যপায়ী সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহের আদেশে মামুদ গওয়ানের প্রাণদণ্ড হয়। এই হত্যার পরে বহমনী রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। ১৫২৬-২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যটি নামে মাত্র টিকিয়া রহিল। কিন্তু বহমনী সুলতানগণ প্রকৃতপক্ষে কাশিম বারিদ ও তাঁহার পুত্র আমীর আলীর ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া রহিলেন।

মামুদ গওয়ান

বহমনী রাজ্য বিভাগ :—বহমনী সুলতানদিগের বিশাল রাজ্য আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বেরার ও বিদর এই পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হইল। ইহাদের মধ্যে বেরার সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন হয়। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে (কাহারও মতে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে) ফতুল্লা ইমাদ শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বেরারে ইমাদ শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। বিজাপুরের আদিল শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহ ১৪৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে মালিক আহম্মদ মামুদ বহমনীকে পরাজিত করিয়া আহম্মদনগরের

পঞ্চসুলতান

নিজামশাহী রাজ্য স্থাপন করেন। ১৫১২ অথবা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে কুলীকুত্‌বশাহের নেতৃত্বে গোলকুণ্ডা স্বাধীনতা লাভ করে। বহমনী রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ আমীর বারীদ বহুকাল শাসন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৫২৬-২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি স্ব নামে রাজত্ব করেন নাই। এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল না। ইঁহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতেন, আবার বিজয়নগরের হিন্দু রাজার সহিতও ইঁহাদিগের প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বেরার আহম্মদনগর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং ১৬১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান বিদর রাজ্য গ্রাস করেন। সম্রাট্ আকবরের আক্রমণে আহম্মদনগরের অবনতি হইলেও শাহজাহানের পূর্ব্বে এই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। দক্ষিণাপথের অপর দুটি রাজ্য ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্য্যন্ত টিকিয়াছিল।

তিন রাজ্যে পরিণতি

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রুশ দেশীয় পর্য্যটক নিকিতিন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে বহমনী রাজত্বে সাধারণ লোকের অবস্থা কিরূপ ছিল, জানা যায়। দেশের আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল। ধন-সম্পদের অভাব না থাকিলেও সকলের আর্থিক অবস্থা সমান ছিল না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বিলাস-ব্যসনের অবধি ছিল না; কিন্তু কৃষকেরা অতি দুঃখে দিন যাপন করিত। বহমনী রাজ্যে চাষ আবাদের অবস্থা ভালই ছিল। দস্যু তস্করের উপদ্রব ছিল না। বহমনী রাজগণ কৃষির উন্নতি সাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সাধ্যমত শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা করিতেন।

বহমনী রাজ্যের অবস্থা

বিজয়নগর ঃ—বিজয়নগরের প্রাচীন ইতিহাস বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হইয়া আছে। কথিত আছে, দক্ষিণে মুসলমানগণ যখন প্রবল

হইয়া উঠিতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে দমনের জন্য সঙ্গম নামক এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন করেন (১৩৩৬ খৃঃ)। ইহাদের মধ্যে হরিহর এবং বুক্কের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। মাধব বিদ্যারণ্য নামে সেকালের জনৈক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ সুধী এই কার্য্যে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে হোয়সল-রাজ তৃতীয় বল্লাল কর্ত্তৃক বিজয়নগর কিম্বা তৎসন্নিহিত আণেগুণ্ডি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাঁহার আত্মীয় সঙ্গম-পুত্র প্রথম হরিহর এই স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কাহার কাহার মতে হরিহর কম্পিলরাজ্যের অমাত্য ছিলেন।

পূর্ব্ব ইতিহাস

যাদব বংশ

বিজয়নগরের প্রথম রাজবংশ যাদব পরিবারের শাখা বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এই বংশ সাধারণতঃ সঙ্গমবংশ নামে পরিচিত। ১৩৭৪ সালে বিজয়নগর-পতি বুক্ক চীনে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হরিহর মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। বহমনী রাজ্যের ন্যায় বিজয়নগরের ইতিহাসও যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনীতে কণ্টকিত। প্রথম দেবরায় ফিরুজ শাহ বহমনীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ফিরুজ শাহ হিন্দু রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া নির্ম্মমভাবে দেশ বিধ্বস্ত করেন। দ্বিতীয় দেবরায় যুদ্ধজয়ের জন্য মুসলমান অশ্বারোহী নিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ সুবিধা হয় নাই।

বুক্ক ও হরিহর

প্রথম ও দ্বিতীয় দেবরায়
মুসলমান সৈন্য নিয়োগ

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে সঙ্গমবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগিরির প্রবল পরাক্রান্ত শাসনকর্ত্তা নরসিংহ শালুব সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু এই বংশের রাজারা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ১৫০৫ সালে শালুববংশের অবসান

নরসিংহ শালুব

হইল। পর্তুগীজগণ নরসিংহের নামানুসারে বিজয়নগরকে "নর-সিংগা" রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। নরস নায়ক বিজয়নগরের তৃতীয় বা তুলুব রাজবংশ স্থাপন করেন। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কৃষ্ণদেব রায় সাহসী, উদার ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ও সদাশয়তা সুবিদিত। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের ইস্‌মাইল আদিল শাহের নিকট হইতে তিনি রায়চুরের দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। বিজাপুরের রাজধানী তখন হিন্দু সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি গুলবর্গা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন এবং উড়িষ্যার হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রায় বিশ বৎসর কাল সগৌরবে রাজত্ব করার পরে ১৫২৯ বা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণ শাস্ত্রী সত্যই বলিয়াছেন, 'দক্ষিণ ভারতের যে সকল নরপতি ভারতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন কৃষ্ণ রায় তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।'

তুলুব বংশ
কৃষ্ণ রায়



কৃষ্ণদেব রায় ও তাঁহার মহিষীদ্বয়

কৃষ্ণ রায়ের পরে অচ্যুত রায় ও সদাশিব রায় রাজা হইয়াছিলেন। সদাশিবের কোনও ক্ষমতা ছিল না। মন্ত্রী রাম রাজাই রাজ্য পরিচালনা করিতেন। ১৫৫৮ সালে রাম রাজা বিজাপুর রাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া আহম্মদনগরের সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করেন। উদ্ধত হিন্দু মন্ত্রী পরাজিত সুলতানের প্রতি এমন অশিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে বেরার ব্যতীত দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অন্য মুসলমান সুলতানগণ সমবেতভাবে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তলিকোটের যুদ্ধে (প্রকৃতপক্ষে রাক্ষস তঙ্গড়ীতে) হিন্দুদের বিশাল বাহিনী পরাজিত হইল এবং রাম রাজার শিরচ্ছেদ করা হইল (১৫৬৫ খৃঃ)। বিজয়ী মুসলমানগণ তখন হিন্দু রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া তথাকার বিরাট হর্ম্ম্যরাজি ও সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি ধ্বংস করিলেন।

রাম রাজা

তলিকোট

রাম রাজার ভ্রাতা ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে পেনুগোণ্ডায় আরবীডু বংশ স্থাপন করেন। ইহাই বিজয়নগরের চতুর্থ রাজবংশ। ইহার পরে চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু সামন্ত রাজগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং বিজয়নগরের পূর্ব্ব গৌরব একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল।

আরবীডু বংশ

বিদেশী পর্য্যটকগণ বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্ ও রাজগৌরব সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। ইটালীয় পর্য্যটক নিকোলো কন্টি ১৪২০ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ প্রথম দেবরায়ের শাসনকালে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে বিজয়নগরের পরিধি ৬০ মাইল বিস্তৃত ছিল এবং রাজধানীতে অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ প্রায় নব্বই

বিজয়নগরের অবস্থা

হাজার যোদ্ধা ছিল। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে আব্দুর রজ্জক ভারতবর্ষে আগমন করেন। বিজয়নগরের ধনৈশ্বর্য্য দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর পর্ত্তুগীজ লেখক পাএস বলেন যে এই নগর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ পুরী।

আব্দুর রজ্জক

বিজয়নগরের রাজগণ শিক্ষা ও শিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বেদের টীকাকার সায়ন ও তাঁহার ভ্রাতা মাধব এই রাজ্যের প্রথম রাজাদের অধীনে কাজ করিতেন। কৃষ্ণ রায়ের সভাকবি "মনুচরিত্র" রচয়িতা পেদ্দন তেলগু লেখকদের মধ্যে আজিও একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সম্মানিত হইয়া থাকেন। যদিও সেই বিশাল বিজয়নগর আজ ধ্বংস-স্তূপে পরিণত, তথাপি তাহার ভগ্নাবশেষ হইতেও স্থাপত্য কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশের চিত্রকর ও শিল্পিগণ যে এককালে গৌরবের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শিক্ষা ও শিল্পানুরাগ

বিজয়নগরের রাজগণ কেবল যে দক্ষিণাপথে বহমনী রাজ্যের গতিরোধ করিয়াছেন তাহাই নহে, প্রধানতঃ তাঁহাদের জন্যই বহমনী রাজারা উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। গুলবর্গা ও বিদরের যুদ্ধপ্রিয় নরপতিগণ যদি বিজয়নগর আক্রমণেই সকল শক্তি ক্ষয় না করিতেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে উত্তরে মুস্‌লিম রাজ্যগুলি জয় করা মোটেই কঠিন হইত না; তাহা হইলে ভারতের ইতিহাসও বোধ হয় অন্যরূপে লিখিত হইত।

বহমনী রাজ্যের প্রভাব প্রতিরোধ

উড়িষ্যা ঃ—মহাবীর অনন্তবর্ম্মণ চোড় গঙ্গ উড়িষ্যাকে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৪৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার শাসনদণ্ড কপিলেন্দ্রের হস্তগত হয়। কপিলেন্দ্র গঙ্গা হইতে কাবেরী

অনন্তবর্ম্মণ ও কপিলেন্দ্র

পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিজয়-বাহিনী বহমনী রাজ্যের অন্তর্গত বিদরের নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার পরে পুরুষোত্তম ও প্রতাপরুদ্র যথাক্রমে সিংহাসন অধিকার করেন। শেষোক্ত নরপতি চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গদেশ হইতে মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধীনে শাসিত হইত। কিন্তু বিজয়-নগরের কৃষ্ণদেব রায় এবং গোলকুণ্ডার কুতবশাহী বংশের অভ্যুত্থানে এই রাজ্যের প্রভাব খর্ব্ব হইল। আনুমানিক ১৫৪১-৪২ অব্দে কপিলেন্দ্র বংশের পতন এবং এক নবীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। ইঁহারাও আবার মুকুন্দ হরিচন্দন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন (১৫৫৯-৬৮ খৃঃ)। আকবর এই পরাক্রান্ত রাজার সখ্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার কররানী সুলতানগণ ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা জয় করিয়া এই রাজ্যটি বাংলার অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন।

মোগলযুগের প্রাক্কালে রাজনৈতিক অবস্থাঃ—উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে দিল্লী সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণাপথে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের একটা প্রবল চেষ্টা হইয়াছিল। উত্তর ভারতে মেবারের রাণা কুম্ভ ও সঙ্গ রাজপুত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বাসনা পোষণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই যুগের সকল মুসলমান রাজাই বিদেশী ছিলেন না। গুজরাট, আহম্মদনগর ও বেরারের মুসলমান রাজারা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষেরই লোক। অবশেষে বাবরের আক্রমণে ভারতবাসিগণের স্বদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা বিফল হয় এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষ

তুর্কী-আফ্‌গান স্থলতানগণের শাসন ঃ—দিল্লীর স্থলতানগণ অপ্রতিহত ক্ষমতায় রাজ্য শাসন করিতেন। কোরাণের বিধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেও তাঁহারা কার্য্যতঃ কাহারো অনুশাসন মানিয়া চলিতেন না। কোরাণের নিষেধ সত্ত্বেও আলাউদ্দীন পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্থির করিয়া দিয়া ব্যবসায়ীদিগকে সেই মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং মুসলমান যোদ্ধাদিগকে বঞ্চিত করিয়া যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তুঘ্‌লুক্ শাহের পুত্র মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্মগুরু খলিফার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেও অনেক স্থলতানই এই প্রকার আনুষ্ঠানিক আচারের ধার ধারিতেন না। স্থতরাং তুর্কী-আফ্‌গান শাসিত ভারতীয় প্রদেশগুলি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল এবং তুর্কী-আফ্‌গান বংশীয় রাজারা তাঁহাদের নিজ ইচ্ছামত রাজ্য শাসন করিতেন। যিনি রাজা, তিনিই সৈন্য পরিচালক, আবার তিনিই বিচারক ছিলেন। তাঁহার দ্বারাই দেশের আইন কানুন নিয়ন্ত্রিত হইত এবং তিনিই কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রিগণকে সাধারণ ভৃত্যের ন্যায় যে কোনও সময়ে পদচ্যুত করা যাইত। প্রাদেশিক শাসকগণেরও সেই অবস্থা। স্থলতানের প্রভুত্ব প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সেনাবাহিনীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। স্থতরাং দুর্গ ও সেনা-নিবাসগুলির নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেই তাঁহাদের ক্ষমতা সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকিত।

শাসনে স্বেচ্ছাচার

অন্যত্র হিন্দু সামন্তগণই দিল্লীর স্থলতানের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া বিনা বাধায় শাসন করিতেন। হিন্দু রাজারা মুসলমান বিজেতাগণকে কর দিতেন।

হিন্দু শাসকগণ

সময় মত সম্রাটের নিকট রাজস্ব ও মাঝে মাঝে উপঢৌকন পৌছিলেই তাঁহারা নীরব থাকিতেন। রাজার পরিবর্ত্তনে গ্রাম্যজীবনে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না। হিন্দু ও মুসলমান রাজার শাসনে সাধারণ লোক ও কৃষকদের অবস্থার কোন ব্যত্যয় ঘটিত না। তবে মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদিগকে সাধারণতঃ জিজিয়া কর দিতে হইত। যাঁহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অবশ্য শাসক সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার অধিকার পাইতেন।

গ্রাম্য জীবন

দুই সভ্যতার সংঘর্ষের ফল ঃ—ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত তুর্কী-আফ্‌গান বিজেতাদিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। গ্রীক, শক ও হূণগণ এদেশে আসিয়া ভারতবাসীদের সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। ভাবে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। তুর্কী-আফ্‌গান বংশীয় মুসলমানগণ ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সামাজিক আচার সম্বন্ধীয় যে অবদান লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, হিন্দুদের সামাজিক বিধান হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরিয়া যদি দুইটি সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করে, তবে তাঁহারা আপনাদের অজ্ঞাতসারেও পরস্পরের ভাব অনুকরণ করিয়া থাকে। মুসলমানগণ অমুসলমানদিগকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষা দিবার পক্ষপাতী। ভারতবর্ষেও অনেক হিন্দুকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল। আবার মুসলমান রাজা ও সেনাপতিরা কখনও কখনও হিন্দু নারীর পাণিগ্রহণ করিতেন। হিন্দুরাও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পর তাঁহাদের

তুর্কী-আফ্‌গান আক্রমণকারীদের বৈশিষ্ট্য

হিন্দু মুসলমানের মিলন ও সদ্ভাব

পূর্ব্ব আত্মীয়দের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতেন না। নূতন দীক্ষিত মুসলমানগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। রজবের পুত্র ফিরুজ শাহ তৎকালীন মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত অভিনব ধর্ম্মমত ও সামাজিক পরিবর্ত্তন দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল সামাজিক আচার ও ধর্ম্মমতের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বাসের ফলে দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল এবং তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের পরস্পরের স্বার্থ অভিন্ন। কিন্তু মিলনের সেই সন্ধিক্ষণে বাবরের আক্রমণে সব ওলট-পালট হইয়া গেল।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজে ইস্‌লাম প্রভাবঃ—হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইস্‌লামের সংস্পর্শের ফল দুইটি বিভিন্ন দিকে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা কঠোরতর ভাবে দেখা দিল। অন্যদিকে হিন্দুদের ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অধিকতর উদারতা ও সাম্যভাব পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। মুসলমান আচার যাহাতে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ না করিতে পারে তজ্জন্য হিন্দু শাস্ত্র ও নিবন্ধকারগণ স্মৃতি গ্রন্থে অনেক কঠোর অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিলেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থকারের মধ্যে রঘুনন্দনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর পক্ষে উদার মতাবলম্বী হিন্দুগণ অনেক কু-সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। উদারমতবাদী সাধু সন্ন্যাসিগণ সাধারণ লোকের নিকট হিন্দুধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রভৃতি খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রচারকের মধ্যে অনৈক্য থাকিলেও ধর্ম্ম সমন্বয়ের মূল নীতি সম্পর্কে ইঁহাদের মধ্যে মত-বিরোধ ছিল না। মোক্ষের পথে মানুষের জাতি অথবা বর্ণ যে বাধা জন্মাইতে

দুই রকমের প্রতিক্রিয়া

রঘুনন্দন

পারে না ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। ভগবান্ মানুষের কার্য্যাকার্য্যের বিচারই করিয়া থাকেন, জ'তি কুলের বিচার করেন না। তাঁহার নিকট উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অথবা অবজ্ঞাত হীন জাতির মধ্যে প্রভেদ নাই। কেবলমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাসই যে মোক্ষের উপায় একথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন।

রামানন্দ

ধর্ম্ম প্রচার ঃ—এই সকল উদার প্রচারকের মধ্যে রামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ রামের উপাসক ছিলেন এবং হিন্দী ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। উত্তর ভারতে তীর্থ পর্য্যটনকালে জাতিনির্ব্বিশেষে তিনি সকলকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার বারজন প্রধান শিষ্য বা চেলার মধ্যে একজন নাপিত, একজন মুচি এবং একজন জোলা।

বল্লভাচার্য্য

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক বল্লভাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসারের সকল ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিতেন।

চৈতন্য

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক চৈতন্যের প্রভাব এই সময়ে বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে চৈতন্য সংসার ত্যাগ করেন। তিনি চারিদিকে প্রেম ও বৈরাগ্যের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। পদমর্য্যাদা অথবা অর্থ-সম্পদের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার একজন মুসলমান শিষ্য ছিল। চৈতন্যের সম্প্রদায়ের বহু বৈষ্ণব জাতিভেদ একেবারেই মানেন না। অথচ ইঁহারা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই। চৈতন্যের শিক্ষায় হিন্দুধর্ম্মে এক নবজাগরণ পরিলক্ষিত হইল।

একনাথ

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মগুরু একনাথ সেকালের একজন কবি ও প্রতিভাশালী মনীষী ছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি কখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, অথচ তখনকার প্রচলিত অনেক সমাজ-বিধি অগ্রাহ্য করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। মহার প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির সহিত তিনি অবাধে মেলামেশা ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

অব্রাহ্মণ ধর্ম্মোপাসক

এ যুগের প্রসিদ্ধ সাধুদিগের মধ্যে সকলে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। যে কবীরের নাম হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন, তাঁহার জন্ম হইয়াছিল মুসলমান জোলার ঘরে। নামদেব দরজীর সন্তান। শিখধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক ছিলেন ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ী। কবীর হিন্দু অথবা মুসলমানদিগের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জাতিভেদ প্রথা কখনও স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিতেন, "সকল ধর্ম্মই এক, আল্লা ও রামে প্রভেদ নাই।"

কবীর

কবীরের বাণী যেমন মধুর তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, 'মহাপুরুষদিগকে তাঁহাদের জাতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা বৃথা। নাপিত যে সেও পরমেশ্বরের উপাসক, রজকিনী, তন্তুবায় এমন কি রাইদাসও ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছে। ঋষি স্বপাচ ত জাতিতে মুচি, তিনি কি ভগবানকে ডাকেন নাই? হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সকলে একই লক্ষ্যে পৌঁছিতে চাহিতেছে। সেখানে বর্ণে বর্ণে প্রভেদ নাই, মানুষের সহিত মানুষের ভেদ নাই।'

নানক

শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নানক হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত। তাঁহার ভক্ত শিষ্যদিগের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিলেন।



গুরু নানক

দেশীয় সাহিত্যের উন্নতিঃ—গোঁড়া হিন্দুগণ সংস্কৃতেই তাঁহাদের শাস্ত্র-গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারকগণ প্রায় সকল স্থানেই প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য বই লিখিতেন ; সুতরাং যে ভাষা জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য, সেই ভাষাতেই তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা স্বাভাবিক। রামানন্দ ও কবীর হিন্দী সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, একনাথের লেখনী প্রভাবে মরাঠি ভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছে। গুরু নানক ও তাঁহার শিষ্যবর্গের রচনায় পঞ্জাবী ভাষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। গুরুমুখী লিপির উদ্ভবও তাঁহাদের কল্যাণেই হইয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে চৈতন্যদেবের সময়ে এক নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে।

ধর্ম্মোপদেষ্টাদের দান

তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের গীতিকাব্য বাংলার নিরক্ষর পল্লী কৃষক হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী হইলেও তিনি বাংলার প্রচীন কবি রূপেই সমধিক পরিচিত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

সেকালের নরপতিগণের অকুণ্ঠ দান ও ঐকান্তিক আগ্রহের ফলেই এই সকল কবির সাহিত্য সাধনা সার্থক হইয়াছিল। বিদ্যাপতি একজন হিন্দুরাজার সভাকবি ছিলেন। কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণকে বাঙ্গালীর বাইবেল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌড়-রাজের আনুকূল্যে কৃত্তিবাস এই অমূল্য গ্রন্থখানি রচনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে হুসেন শাহের সুশাসন ও প্রজারঞ্জনের উল্লেখ আছে। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের আদেশে বঙ্গভাষায় মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল।

শাসকদের উৎসাহ দান

কৃত্তিবাস

পার্সি সাহিত্য ঃ—দিল্লীর সুলতানেরা মুসলমান লেখকদিগকে পারস্য ভাষাতে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করিতেন। এদেশের মুসলমান-দিগের মধ্যে যাহারা পার্সি ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে আমীর খস্রুর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। গিয়াসউদ্দীন বল্‌বনের আনুকূল্যে তাঁহার কবি প্রতিভার স্ফুরণ হয়। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি সভাকবি হইয়াছিলেন। বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া পরিণত বয়সে আমীর খুস্‌রু পরলোকগমন করেন। হিন্দুগণ সাহিত্যের যে শাখা বিশেষভাবে অবহেলা করিয়াছিলেন, মুসলমান লেখকগণ কিন্তু তাহাতেই বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। এযুগে হিন্দুদের লিখিত কোনও খাঁটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ দেখা যায় না, কিন্তু মুসলমান লেখকগণ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তুর্কী স্থলতানগণের আমলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দীন বরণী। ইনি তুঘ্‌লুক্ শাহের পুত্র মহম্মদ ও রজবের পুত্র ফিরুজ শাহের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার লিখিত তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল।

আমীর খুস্‌রু

জিয়া-উদ্দীন বরণী

উর্দ্দু সাহিত্যের প্রবর্ত্তন ঃ—বিদ্যোৎসাহী মুসলমান পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষার অনুশীলন করিতেন, আবার রাজদরবারে প্রতিপত্তি লাভের জন্য অনেক হিন্দু পার্সি ভাষা শিখিতেন। এতদ্ব্যতীত অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত লোকেদের স্থবিধার জন্য একটি মিশ্রভাষার প্রচলন হইয়াছিল। এই ভাষার নাম উর্দ্দু বা শিবিরের ভাষা। আজকাল যেমন বড় বড় শহর বা ব্যবসায় কেন্দ্রে বিভিন্ন জাতির মনোভাব প্রকাশের জন্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেকালে বড় বড় শহরে

মিশ্রভাষা

ও বাজারে সম্ভবতঃ এই মিশ্র ভাষা ব্যবহৃত হইত। উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম হিন্দী ব্যাকরণের অনুরূপ, কিন্তু এই ভাষায় পার্সি ও আরবী শব্দের বাহুল্য দেখা যায়।

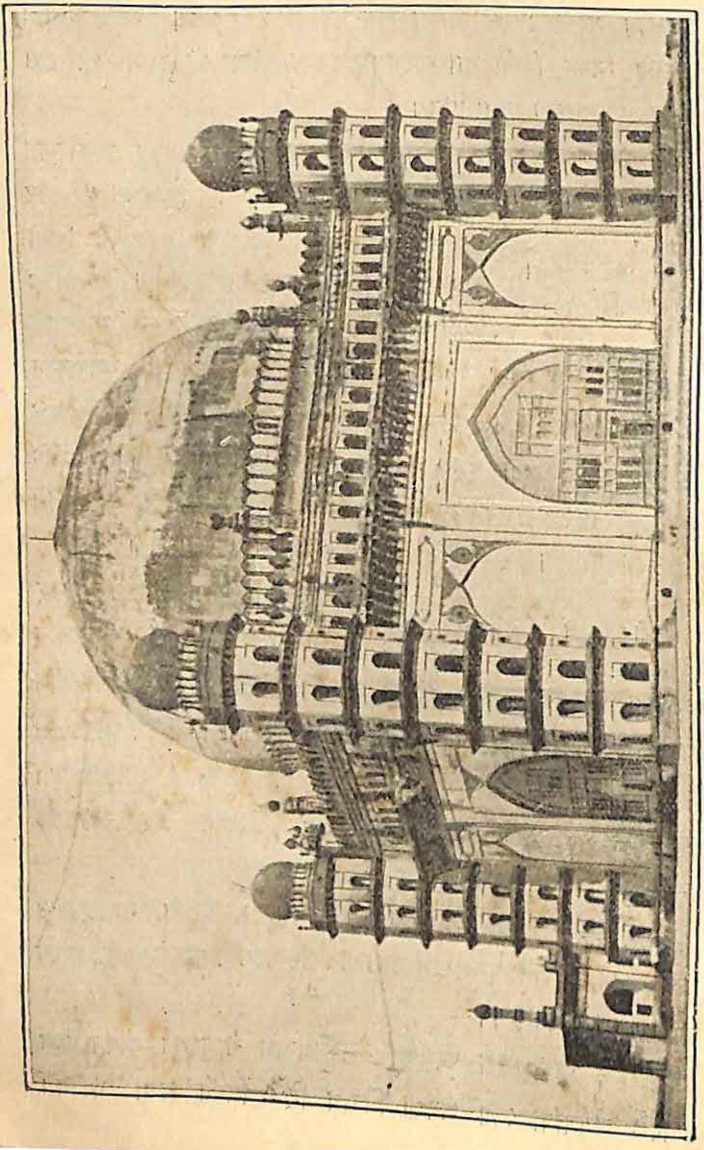
ভারতীয় মুস্লিম স্থাপত্য :—উর্দ্দু সাহিত্যের ন্যায় সেকালের স্থাপত্য-শিল্পও দুই সভ্যতার সংযোগের ফল। মুসলমানগণ প্রাসাদ ও ভজনালয় নির্ম্মাণের জন্য ভারতীয় শিল্পী ও স্থপতি নিয়োগ করিতেন। প্রথমতঃ মস্‌জিদ নির্ম্মাণে হিন্দু ও জৈন মন্দিরের উপাদান ব্যবহার করা হইত এবং কখনও কখনও মুসলমান উপাসকগণের প্রয়োজন অনুসারে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া মন্দিরকেই মস্‌জিদে পরিণত করা হইত। এইরূপে বিভিন্ন প্রদেশে এক একটি বিভিন্ন রচনা-রীতির উদ্ভব হইল। দিল্লীতে মুসলমান আদর্শই অনেকটা অব্যাহত রহিয়াছে। জৌনপুর ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে স্থানীয় পদ্ধতিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বাংলায় গৃহ নির্ম্মাণের যে প্রণালী প্রচলিত ছিল মুসলমান বিজেতাগণ তাহারই অনুসরণ করেন এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত তক্ষণ শিল্পের প্রভাব এখানকার মস্‌জিদেও পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম ভারতেও মুসলমানেরা গুজরাটী স্থাপত্য রীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির ও মস্‌জিদ এই রীতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ ভারতীয় অথবা সম্পূর্ণ মুসলমান নহে

স্থানীয় আদর্শ

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্ম্মান্দোলনে হিন্দু এবং মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অনেক সুফল ফলিয়াছিল।

সাধারণ লোকের অবস্থা :—মুসলমান শাসনের প্রথম তিন শতাব্দীতে জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল নির্ণয় করা কঠিন।



বিজাপুরের গোল গম্বুজ

ভারতবর্ষ তখন ধনসম্পদের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহা দ্বারা সাধারণ লোকের কিরূপ আয় ছিল, বুঝা যায় না। ইবন বতুতা বলেন, তিনি বাংলায় দ্রব্য-সামগ্রী যত সস্তা দেখিয়াছিলেন, তেমন আর কোথায়ও দেখেন নাই। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর একখানি পর্ত্তুগীজ চিঠিতে দেখা যায়, এই প্রদেশের সাধারণ গৃহস্থদের তেমন টাকা পয়সা ছিল না। সুতরাং দ্রব্য-সামগ্রী সস্তা হইলেও সাধারণ লোকের তাহাতে কি পরিমাণ সুবিধা হইত বলা কঠিন। সম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যে হয়তো ঐশ্বর্য্যের অবধি ছিল না, কিন্তু সেকালের দরিদ্রেরা বোধ হয় একালের দরিদ্রদিগের মতই নিঃস্ব ছিল। এখনকার হিসাবে সেকালের লোকের অভাব অত্যন্ত কম ছিল। নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র দেশেই উৎপন্ন হইত এবং সুদূর পল্লীবাসীদের সংসারযাত্রায় সম্ভবতঃ শান্তির অভাব ছিল না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকের দুর্গতির শেষ থাকিত না। কারণ, সে সময়ে বাহির হইতে সাহায্য পাওয়ার কোনও সহজ উপায় ছিল না।

সস্তা জিনিসপত্র

টাকার অভাব

অল্প অভাব

স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের উপরেই শহরের লোকের ভাগ্য নির্ভর করিত। কিন্তু শাসনতন্ত্র বিশেষ সুব্যবস্থিত না থাকায় পল্লীগ্রামগুলি কার্য্যতঃ তাঁহাদের শাসনের বাহিরেই ছিল। তাই গ্রামবাসিগণ সাধারণতঃ স্বাধীনভাবেই জীবন যাপন করিত। সুলতানের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ, রাজধানীর দ্বন্দ্ব অথবা বিরোধ-বিগ্রহ সাধারণতঃ তাহাদিগকে স্পর্শ করিত না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বাবর, হুমায়ুন ও শের শাহ

বাবর ঃ—বাবরের জীবন-কাহিনী বৈচিত্র্যময়। যখন তাঁহার বয়স মাত্র এগারো বৎসর, তখন তিনি ফারঘানা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৈমুরের বংশধরেরা তখন সমরখন্দের সিংহাসনের জন্য জ্ঞাতি-কলহে ব্যাপৃত ছিলেন। বাবরও আগ্রহের সহিত এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সমরখন্দ শাসনের স্বপ্ন এই বালকের মনও অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার স্বপ্নলোকের এই সিংহাসনে তিনি সত্য সত্যই দুইবার আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনবারই এই সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। দুই দুই বারই তিনি সমরখন্দ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন এবং ফারঘানার পৈতৃক সিংহাসনও তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে। গৃহহীন অবস্থায় তিনি দীর্ঘকাল আশ্রয় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাই তাঁহাকে

পুর্ব্ব পরিচয়



বাবর

সাফল্যের পথে লইয়া গিয়াছিল। একদিন এক গ্রাম্য সর্দ্দারের অতিথি হইলে তাঁহার একশত এগারো বৎসরের অতি বৃদ্ধা মাতার নিকট বাবর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ তৈমুরের ভারতীয় অভিযানের কাহিনী শ্রবণ করেন। এই কাহিনী শুনিয়া তাঁহার মনেও হিন্দুস্থান আক্রমণের বাসনা প্রবল হইয়া উঠে।

ভারতীয় অভিযানঃ—পঞ্জাবের দৌলত খাঁ লোদী প্রমুখ পরাক্রান্ত সর্দ্দারগণ যখন বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণে আহ্বান করিলেন, তিনি সাগ্রহে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মেবারের পরাক্রান্ত নরপতি সঙ্গও সম্ভবতঃ এই সময়ে তাঁহার নিকট চিঠি-পত্র লিখিতেছিলেন। বাবরের ন্যায় দুঃসাহসী বীরের পক্ষে এরূপ প্রলোভন পরিত্যাগ করা অসম্ভব। তাই ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোর অধিকার করিলেন। দৌলত খাঁ লোদী শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে তৈমুরের মত ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় বাবরের নাই। তখন তিনি বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইহাতে বাবরের সঙ্কল্প সাধনের কিছু বিলম্ব হইল, কিন্তু ভারত বিজয়ের অভিলাষ তিনি পরিত্যাগ করিলেন না। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার বিপুল বিক্রমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। দৌলত খাঁকে দমন করিতে তাঁহার আয়াস পাইতে হয় নাই। তারপর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের বিখ্যাত রণক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সুলতান ইব্রাহিমের যুদ্ধ হয়। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিমের পরাজয় ও মৃত্যু হইলে বিজয় গৌরবে বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন।

দৌলত খাঁ লোদীর আহ্বান

রাণা সঙ্গ

বাবরের বিরুদ্ধে দৌলত খাঁর যুদ্ধ

মেবারপতি রাণা সঙ্গের সহিত সংগ্রামঃ—কিন্তু তখনও

বাবরের কাজ শেষ হয় নাই। এদেশে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব ছিল না। রাজপুতবীর রাণা সঙ্গ দিল্লী, মালব ও গুজরাটের মুসলমান নরপতিদিগের সহিত যুদ্ধে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া বাবরের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন। খানুয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রাজপুত সৈন্য বাবরের হস্তে বিধ্বস্ত হইল এবং তিনি চান্দেরির দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, পূর্ব্ব ভারতে আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। রাজপুতদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি বিহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং পাটনার অনতিদূরে গোগ্রা নদীর তীরে আফগান সৈন্যদিগকে পরাজিত করিলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়।

রাজপুত জাতিসঙ্ঘ

খানুয়া বা কাণ্ওয়ার যুদ্ধ ১৫২৭ খৃঃ

গোগ্রার যুদ্ধ

বাবরের চরিত্র :—বাবর বহুগুণসম্পন্ন ও বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গীত ও অন্যান্য বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতার অভাব ছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তিনি প্রাণ দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার মাতামহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। পরাজয়ে অথবা আকস্মিক বিপদে তিনি কখনও বিচলিত হন নাই। সকল ব্যাপারেই এই নিরুদ্বিগ্ন ভাব এবং দুঃসাহসিক কর্ম্মপ্রিয়তা সম্ভবতঃ তাঁহার পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত। 'মঙ্গোলের শক্তি, তুর্কীর সাহস ও কর্ম্মক্ষমতা লইয়া তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তাঁহার সাম্রাজ্য সংগঠনের প্রতিভা ছিল না। তথাপি তাঁহার পৌত্র আকবর যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনিই তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন।'

বিভিন্নমুখী প্রতিভা

বাবর সম্পর্কে লেনপুলের অভিমত

দয়ালু স্নেহশীল বাবর বন্ধুদের প্রতি অতিশয় উদার ছিলেন। তাঁহার ক্ষমাশীলতা ও ভৃত্যদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সৈনিক হিসাবে তিনি যদি তেমন খ্যাতিলাভ করিতে নাও পারিতেন তথাপি সাহিত্যিকরূপে তাঁহার প্রতিভা চিরকাল সমাদৃত হইত। তিনি পার্সি ও তুর্কি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা যেমন সরল তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'র যে অসম্পূর্ণ অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত।

বাবরের জীবন-স্মৃতি

হুমায়ুন ঃ—বাবর নববিজিত হিন্দুস্থানে শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত যাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন, স্বার্থসাধনই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। হুমায়ুন যখন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহাকে নানারূপ অসুবিধায় পড়িতে হইল। একান্ত প্রয়োজনের সময়েও তিনি তাঁহার ভ্রাতৃগণের সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। এদিকে আফ্‌গান শক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে ধ্বংস হয় নাই। পূর্ব্বদিকে শের খাঁ প্রবল হইয়া উঠিলেন, পশ্চিমে গুজরাটের বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন। জয় পরাজয় বিশেষ ভাবে নবীন বাদশাহের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপরেই নির্ভর করিতেছিল। হুমায়ুনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। তাঁহার বংশের অন্যান্য নরপতির ন্যায় তিনিও একজন সাহসী সেনাপতি ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু বাবরের ন্যায় অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, অথবা তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। এই জন্য শের শাহের নেতৃত্বে পাঠানেরা হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার

হুমায়ুনের নানা অসুবিধা

আফ্‌গান শক্তির পুনরভ্যুত্থান

হুমায়ুনের ব্যক্তিত্ব

করিতে পারিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয়ের প্রতি অবিবেচকের ন্যায় উদারতা দেখাইয়া তিনি ভয়ানক ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই কতকগুলি জাগীর পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মধ্যম ভ্রাতা কামরাণ কাবুল ও কান্দাহার শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি হুমায়ুনকে ভয় দেখাইয়া পঞ্জাব আদায় করিয়া লয়েন।

কামরাণ



হুমায়ুন

হুমায়ুন প্রথমে অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি বাহাদুর শাহকে মালব হইতে বিতাড়িত করিয়া ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে গুজরাট রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। বহু দুর্গ দখল করিয়া হুমায়ুন বীর বিক্রমে সমুদ্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই সময় পূর্ব্বাঞ্চলে সাংঘাতিক গোলযোগের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল। গুজরাট এবং মালব সম্পূর্ণভাবে তাঁহার হস্তচ্যুত হইল।

শের শাহ ঃ—যে দুর্দ্ধর্ষ আফ্‌গান বীর পূর্ব্বাঞ্চলে বিদ্রোহীদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ফরিদ। কিন্তু তিনি শের খাঁ স্থর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টায় খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা হাসান সাসারামের জাগীরদার ছিলেন। ফরিদকে তিনি তেমন ভালবাসিতেন

পূর্ব্ব পরিচয়

না। পনর বৎসর বয়সে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ফরিদ একদিন গৃহত্যাগ করিয়া জৌনপুর চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি শীঘ্রই পারস্য ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে ফরিদের পিতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং যোগ্য পুত্রের হস্তে জাগীর পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিলেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ফরিদকে পুনরায় পিতার জাগীর ছাড়িয়া আগ্রায় যাইতে হইল। পরে পিতার মৃত্যু হইলে সম্রাটের এক ফরমানের বলে তিনি পিতৃ জাগীর অধিকার করেন। ইহার কিছুকাল পরে ফরিদ বিহারের লোহানী বংশীয় স্বাধীন নরপতির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এইখানে ব্যাঘ্র শিকারে বীরত্ব দেখাইয়া তিনি শের খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার প্রভুর সহকারী পদে নিযুক্ত হন এবং তাঁহার নাবালক পুত্রের শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন।

জৌনপুরে শিক্ষা

জাগীর পরিচালনা

অতি দ্রুত উন্নতি

কিন্তু ভাগ্যচক্র আবার ঘুরিয়া গেল। শত্রুপক্ষের ষড়্যন্ত্রে শের খাঁ আবার পিতৃ জাগীর হইতে বঞ্চিত হইলেন। এবার তিনি বাবরের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় সাসারাম পরগণা লাভ করিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই তিনি বাবরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া আবার লোহানীদিগের চাকুরী গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল পরে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব নাবালক ছাত্রের অভিভাবক স্বরূপ তিনিই কার্য্যতঃ বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া বসিলেন। ইহার মধ্যে এক সময় তিনি চূণার দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এইখানে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি হুমায়ুন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। বুদ্ধিমান

বাবরের সহিত সম্বন্ধ

বিহার শাসন

শের সময় বুঝিয়া আনুগত্য স্বীকার করিলে হুমায়ুন আগ্রায় ফিরিয়া যান।

নামে লোহানী রাজার কর্ম্মচারী হইলেও শের খাঁ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিহারের অধীশ্বর হইলেন। অতঃপর বঙ্গদেশের মুসলমান রাজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁহার গৌরব ও খ্যাতি বাড়িয়া গেল। কিন্তু তখনও হুমায়ুনের প্রাধান্য অগ্রাহ্য করিবার শক্তি তাঁহার হয় নাই। সুতরাং তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিলেন। অবশেষে হুমায়ুন যখন বাহাদুর শাহের সহিত সুদীর্ঘ সংগ্রামে বিব্রত ছিলেন তখন শের খাঁ বাংলা আক্রমণ করিলেন এবং সহসা অপ্রত্যাশিত পথে রাজধানীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

বঙ্গদেশ আক্রমণ

বাংলার রাজা মামুদ শাহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। তাই আকস্মিক আক্রমণে নিরুপায় হইয়া বহু অর্থদানে তিনি শের খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু শের খাঁ সহজে ভুলিবার লোক ছিলেন না। মামুদ শাহের দুর্ব্বলতা টের পাইয়া তাঁহার লোভ আরও বাড়িয়া গেল। বাহাদুর শাহের পতনের পরে অনেক সুপ্রসিদ্ধ পাঠান-বীর তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্থায়ীভাবে অধিকারের অভিপ্রায়ে পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। এদিকে হুমায়ুন গুজরাট ও মালব দেশ পরিত্যাগ (১৫৩৬ খৃঃ) করার পরে এই পাঠান সর্দ্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা না করিয়া আগ্রায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন। শের খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে হুমায়ুনের যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না। তখনও যদি তিনি সোজাসুজি গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে হয়ত শের খাঁকে দমন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি চূণার অবরোধ

হুমায়ুনের কালক্ষেপ

চূণার অবরোধ

করিলেন। সেই অবকাশে শের বাংলার রাজধানী দখল করিয়া ফেলিলেন। শের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রোটাস্ দুর্গও জয় করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই তাঁহার পরিজনদিগকে ধনসম্পদসহ পাঠাইয়াছিলেন।

রোটাস্ দুর্গ অধিকার

অবশেষে হুমায়ুন যখন বঙ্গদেশে উপস্থিত হন শের তখন বিহারে যাইয়া হুমায়ুনের রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্তের কতকগুলি স্থান আক্রমণ করিলেন। এদিকে গৌড় অধিকারের আনন্দে হুমায়ুন আলস্যে সময় কাটাইতে লাগিলেন। যখন শের খাঁর আক্রমণ কাহিনী তাঁহার নিকটে পৌছিল তখন তিনি আগ্রা যাত্রা করিলেন। কিন্তু বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে তিনি শের খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

চৌসা

ইহার পরেই শের খাঁ শের শাহ উপাধি ধারণপূর্ব্বক আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য হুমায়ুন পর বৎসর আর একবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু এবারেও বিলগ্রামের যুদ্ধে পাঠানরাজের নিকট পরাভূত হইলেন। এই যুদ্ধ সাধারণতঃ কনৌজের যুদ্ধ নামে অভিহিত।

বিলগ্রাম

এই সঙ্কটকালে হুমায়ুন যদি তাঁহার ভ্রাতাদিগের সাহায্য পাইতেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহার এত বিপদ হইত না। হুমায়ুন লাহোরে যাইয়া ভ্রাতা কামরাণকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু কামরাণ ভ্রাতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পঞ্জাব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন এবং ঐ প্রদেশ শের শাহের অধিকারভুক্ত হইল। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে শের মালব জয় করেন এবং ইহার পরেই রায়সিনের পুরণমলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। নিরাপদে যাইতে দিবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া রায়সিনের সৈন্যদল দুর্গ ত্যাগ করে। তখন

শের শাহ অসহায় রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিলেন। রাজপুত-বীরগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে হত্যা করেন এবং নিজেরাও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

অতঃপর আফগান সাম্রাজ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শের শাহের একজন কর্ম্মচারী একে একে সিন্ধু ও মূলতান অধিকার করিয়া লইলেন। সম্রাট্ নিজে মারবারের রাজপুতরাজ মালদেবের রাজ্য আক্রমণ করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

রাজপুতগণ চিরদিনই সাহসী যোদ্ধা, সুতরাং শের শাহকে এক সময় বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধি ও চতুরতায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। একখানি জাল চিঠি দ্বারা মালদেবকে প্রতারণা করিয়া অবশেষে তিনি জয়ী হইলেন। ফলে আজমীর হইতে আবু পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান সহজেই অধিকৃত হইল। শের শাহ তখন কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। এইখানে বারুদের আগুনে পুড়িয়া শের শাহের মৃত্যু হয় (১৫৪৫ খৃঃ)। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠান অভ্যুত্থানের সকল আশা শূন্যে বিলীন হইল।

মারবারের যুদ্ধ

শের শাহের মৃত্যু

শের শাহের রাজ্য শাসন ঃ—শের শাহ শুধু একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন না, সুশাসক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের জমি জরিপ করিয়াছিলেন এবং ভূমিরাজস্বের হার নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে প্রজাদের অধিকার ও দেয় কর সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং কবুলিয়ত ও পাট্টা লইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কৃষকদিগকে

জমির পরিমাণ ও কর নির্দ্ধারণ

মোট ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব দিতে হইত, শের শাহ নিজে যেমন ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন তেমনি স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকেও কোন প্রকার অত্যাচার করিতে দিতেন না। তাঁহার সময়ে মুদ্রানীতির সংস্কার হইয়াছিল এবং বিভিন্ন শহরের সহিত রাস্তার যোগাযোগ করিয়া তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

সুবিচার

মুদ্রানীতির সংস্কার

বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ চলিয়া গিয়াছে উহা তাঁহারই একটি স্মরণীয় কীর্ত্তি। তিনি ডাকবিভাগের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদিও তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তথাপি শাসনতন্ত্রের সকল বিভাগই সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। পুলিশ বিভাগের নিয়মাবলী সংস্কার করিয়া তিনি গ্রাম্য মোড়লের প্রতি পল্লীগ্রামে শান্তিরক্ষার ভার দিয়াছিলেন। সৈন্যবিভাগে শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রতারণা নিবারণের জন্য আলাউদ্দীন সিপাহীদিগের ঘোড়ার দাগ দিয়া দিবার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। নিজে অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান হইলেও তিনি হিন্দু প্রজার প্রতি অত্যাচার বা অবিচার করেন নাই। ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামে জনৈক হিন্দু তাঁহার সৈন্যদলে সেনানায়কের পদ লাভ করিয়াছিলেন। শের শাহের স্থাপত্যশিল্পানুরাগও কম ছিল না। সাসারামে তাঁহার সমাধি-সৌধ আজিও সেকালের স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় দিতেছে। শের শাহ

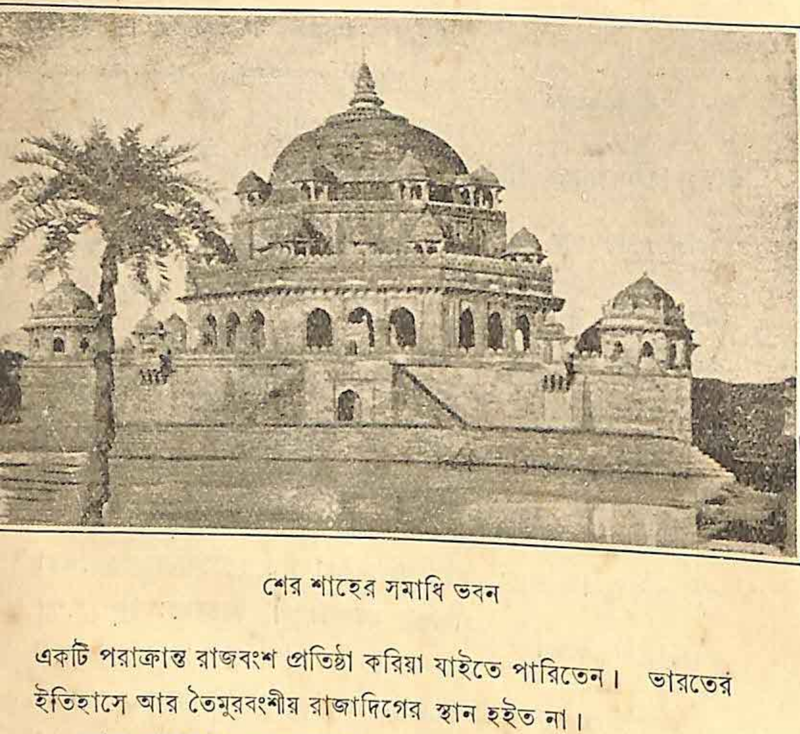
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্

শান্তিরক্ষক পুলিশ

সৈন্য বিভাগ সংস্কার

হিন্দুর প্রতি সুবিবেচনা

আকবরের আমলের অনেক সুব্যবস্থার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যদি অকস্মাৎ মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে তিনি হয়তো নিজেই



শের শাহের সমাধি ভবন

একটি পরাক্রান্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারিতেন। ভারতের ইতিহাসে আর তৈমুরবংশীয় রাজাদিগের স্থান হইত না।

শের শাহের বংশধরগণঃ—শের শাহের কোনও যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর পারিবারিক কলহে স্থরবংশ আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ইস্‌লাম শাহ নয় বৎসর রাজত্বের পরে ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার শিশুপুত্রকে হত্যা করিয়া তদীয় শ্যালক মহম্মদ শাহ আদিল উপাধি ধারণ

ইস্‌লাম শাহ

করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিল তাঁহার হিন্দু মন্ত্রী হিমুর উপরেই রাজ্যশাসন ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মালব ও বঙ্গদেশ একে একে তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। এদিকে শের শাহের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আদিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সিংহাসন দাবি করিলেন। হুমায়ুন এই সকল অশান্তির সুযোগে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিলেন।

আদিল ও হিমু

হুমায়ুনের পুনরায় রাজ্যলাভ ঃ—সিংহাসন হারাইবার পর গৃহহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায় হুমায়ুনকে দীর্ঘকাল ঘুরিয়া ফিরিতে হইয়াছিল। রাজপুতানার ক্ষুদ্র রাজগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সাহস পান নাই। সিন্ধুদেশেও তিনি নিরাপদ আশ্রয় পান নাই। তাঁহার ভ্রাতা কামরাণ তাঁহাকে কাবুলে থাকিতে দিলেন না। অবশেষে এই হতভাগ্য নরপতি পারস্থে পলায়ন করিলেন। পারসিকগণের সাহায্যেই তিনি ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে কাবুলও তাঁহার হস্তগত হইল। কাবুল হইতে হুমায়ুন ও তাঁহার বন্ধুগণ ভারতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর রাজগণ যখন আত্মকলহে শক্তিক্ষয় করিতেছিলেন, তখন (১৫৫৫ খৃঃ) ভারতে প্রবেশ করিয়া হুমায়ুন লাহোর দখল করিলেন। সেই বৎসরই সিকন্দর সূরকে পরাজিত করিয়া তিনি দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। পর বৎসর একদিন নমাজের আজান শুনিয়া তিনি যখন প্রার্থনার জন্য পাঠাগারের সিঁড়ি বাহিয়া তাড়াতাড়ি নামিতেছিলেন সেই সময় অকস্মাৎ পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

পারসিকদের সাহায্যে কামরাণের পরাজয়

লাহোর ও দিল্লী অধিকার

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

মহানুভব আকবর

আকবরের রাজ্য প্রাপ্তি ঃ—হুমায়ুনের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স মাত্র তেরো বৎসর। গৃহহীন, সহায়হীন অবস্থায় হুমায়ুন যখন সিন্ধুর মরুভূমিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছিলেন সেই সময় ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে অমরকোট নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয়। পারস্যে প্রস্থানের সময় হুমায়ুন কামরাণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার পুত্রকে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তারপর হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে আকবর যখন সম্রাট্ হইলেন, তখনও তাঁহার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয় নাই। শিশু সম্রাটের শত্রুর অভাব ছিল না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি একজন উপযুক্ত বিশ্বস্ত অভিভাবক পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম বৈরাম খাঁ।

আকবরের জন্ম

পিতার সহিত বিচ্ছেদ

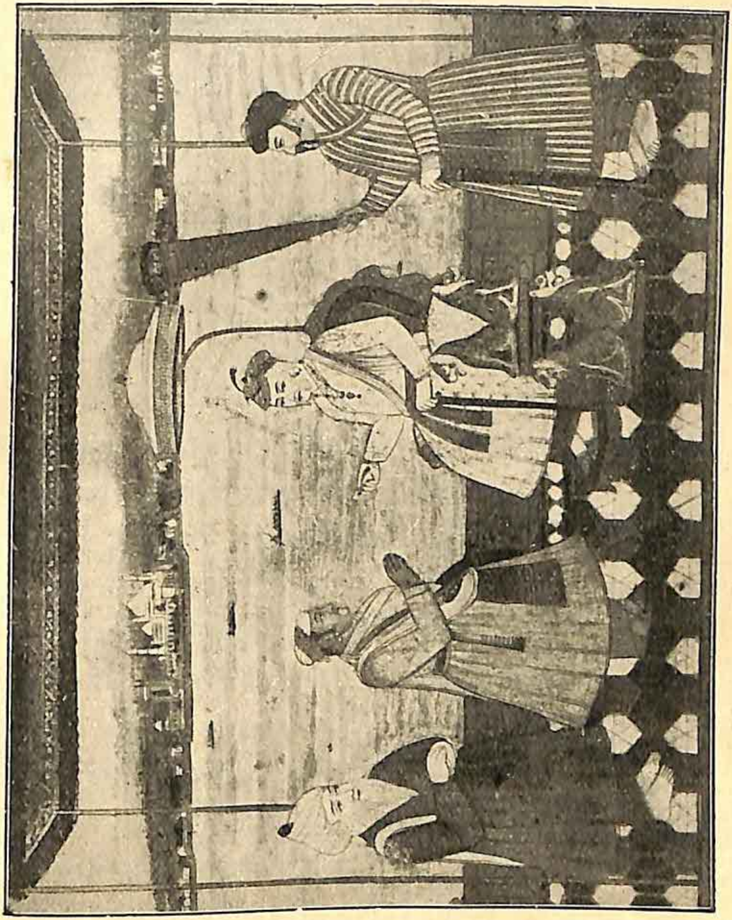
বৈরাম খাঁ

পাঠান কলহ ঃ—হুমায়ুন পিতৃ সাম্রাজ্যের মাত্র অল্প কয়েকটি স্থান পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। তখনও শের শাহের রাজ্যের অধিকাংশ স্থান স্থর-রাজ ও তাঁহাদের অমাত্যগণের অধিকারে। ইহাদের মধ্যে মহম্মদ আদিল শাহের হিন্দু মন্ত্রী হিমুই ছিলেন আকবরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

আদিল ও হিমু

হিমু ও পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ—হিমু জাতিতে বাণিয়া ছিলেন। কেবল নিজের চেষ্টায় তিনি বড় হইয়াছিলেন। সেকালের আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধে তিনি সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়া উচ্চপদ লাভ করেন।

হিমুর বাল্য জীবন



আকবর

আকবরের কর্ম্মচারীদিগকে দিল্লী ও আগ্রা হইতে বিতাড়িত করিয়া তিনি রাজা বিক্রমজিৎ উপাধি ধারণ করিলেন এবং ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে আকবর ও বৈরামের সম্মুখীন হইলেন। এই বিখ্যাত রণক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ভারতের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইল। হিমু শত্রুহস্তে বন্দী ও নিহত হইলেন, পাণিপথের যুদ্ধে উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষা শেষ হইল।

দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

বৈরাম খাঁর পতন:—পাণিপথের যুদ্ধের পরে একে একে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর (১৫৫৯ খৃঃ) অধিকৃত হইল। বৈরাম খাঁ নাবালক আকবরের নামেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিশোর সম্রাট্ তাঁহার প্রভুত্ব বেশীদিন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেই রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আকবর বৈরামকে পদচ্যুত করেন। সম্রাটের কর্ম্মচারীদিগের অসৌজন্যে বিরক্ত হইয়া পদচ্যুত মন্ত্রী বিদ্রোহী হইয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। আকবর পূর্ব্ব উপকারের কথা স্মরণ করিয়া বৈরামের প্রতি কোনও কঠোর আচরণ করিলেন না। মক্কা যাইবার পথে একজন আফগান কর্ত্তৃক বৈরাম নিহত হইয়াছিলেন (১৫৬১ খৃঃ)। বৈরামকে বিদায় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আকবর নিজ হাতে রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করেন নাই। বৈরামের পতনের পর দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাঁহার ধাত্রী মাহম ও তাঁহার আত্মীয়বর্গের প্রাধান্য ছিল।

জৌনপুর অধিকার

বৈরাম পদচ্যুত

বৈরামের বিদ্রোহ

বৈরামের মৃত্যু

মাহম

আকবরের বিজয় অভিযান ঃ—আকবর ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল তিনি রাজ্য শাসন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায় প্রতি বৎসরেই তিনি যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে আধম খাঁ ও পীর মহম্মদ মালব জয় করেন, মালবের আফ্‌গান রাজা বজবাহাদুর ইহার কয়েক বৎসর পরে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে করার শাসনকর্ত্তা আসফ্ খাঁ গড় কটঙ্গার গোণ্ড রাজ্য আক্রমণ করেন। এই স্থানটি মধ্য প্রদেশের উত্তর ভাগে অবস্থিত। তথাকার রাজা তখন নাবালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতা রাণী দুর্গাবতীই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনী বর্ত্তমান জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে পরাজিত হইল। বন্দী হইবার আশঙ্কায় দুর্গাবতী আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার পুত্র শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই যুদ্ধে আকবরের সৈন্যদল বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিল। আসফ্ খাঁ কিছুকাল এই প্রদেশটি শাসন করেন, ইহার পর বর্ত্তমান ভূপাল ব্যতীত বিজিত প্রদেশের অবশিষ্টাংশ প্রাচীন রাজ পরিবারের এক ব্যক্তিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

মালব

গোণ্ডয়ানা

রাণী দুর্গাবতী

রাজপুতগণ অনেকেই এতদিন দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা সাহসী যোদ্ধা ছিলেন এবং এতকাল মরুভূমি ও পার্ব্বত্য কেল্লার আশ্রয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন। মেবার ও মারবারের রাজপুত রাজগণ বাবর ও শের

রাজপুতগণের বশ্যতা স্বীকার ; মেবার অটল

শাহের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আকবর রাজপুতগণের মিত্রতার মূল্য বুঝিতেন। সুতরাং তিনি বন্ধুভাবে তাঁহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে অম্বরের (জয়পুর) বিহার মল তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া আকবরের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। কিন্তু মেবারের রাণা তাঁহার প্রভুত্ব মানিলেন না। ইহার উপর মালবের রাজ্যচ্যুত রাজা বজবাহাদুরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া আকবর তাঁহার প্রতি আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাণা সঙ্গ বীর ছিলেন কিন্তু তাঁহার অপদার্থ পুত্র উদয়সিংহ রাজধানী চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ের মধ্যে পলায়ন করিলেন। তথাপি

জয়মল

জয়মল ও পত্ত দীর্ঘ চারিমাস কাল ধরিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে চিতোর রক্ষা করেন। অবশেষে সম্রাটের গুলিতে জয়মলের মৃত্যু হয়। রাজপুতবীরগণ

চিতোর পতন

সেনাপতির এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া প্রথমে স্ত্রী-পুত্রদিগকে বধ করিলেন এবং পরে অকুতোভয়ে শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

যে সকল রাজপুত বীর এতদিন আকবরকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে-ছিলেন, চিতোরের পতনে তাঁহারা ভীত হইলেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে

রণথম্ভোর

রণথম্ভোরের রাজা রায় সুরজন বাদশাহের চাকরী গ্রহণ করিলেন। সেই বৎসরেই

কালিঞ্জর

কালিঞ্জরাধিপতিও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। বিকানীর ও জয়শলমীরের রাজারা আকবরকে কন্যা দান করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিলেন। কিন্তু মেবারের রাণা কিছুতেই তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না। উদয়সিংহ

ভীরু ছিলেন সত্য, কিন্তু পৈতৃক রাজধানী হারাইয়াও তিনি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে মেবারের বীরগণ নূতন রাণা প্রতাপসিংহের নেতৃত্বে আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন। সাহসে ও তেজে, বীরত্বে ও দৃঢ়তায় প্রতাপ ছিলেন রাজপুত শৌর্য্যের মূর্ত্ত প্রতীক। তখন পর্য্যন্ত ভারতবাসীদিগের মধ্যে ব্যাপক ভাবে জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হয় নাই, কিন্তু সেই সময়েই তিনি তাঁহার বংশ-মর্য্যাদা ও জাতীয় ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ জীবন পণ করিয়াছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করার মত অর্থ-সম্বল তাঁহার ছিল না। একদিকে শক্তিশালী মুস্‌লিম সৈন্যদল ও দিল্লীর সম্রাটের অজস্র সম্পদ্, অন্যদিকে মেবারের রাণার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী। রাণা প্রতাপ তাঁহার প্রতিবেশী রাজপুত

মেবার-রাণা প্রতাপসিংহ



রাণা প্রতাপ

রাজগণেরও সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। বরং আকবরের অধীনস্থ রাজপুত সেনাপতিগণ প্রতাপের বিরুদ্ধে দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু কোন বিপদেই প্রতাপ সঙ্কল্পভ্রষ্ট হন নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার আদর্শে অচল অটল হইয়া ছিলেন।

অসমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে গোগুণ্ডা বা হলদিঘাটীতে আকবরের সেনাপতি অম্বরের মানসিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই সংগ্রামে প্রতাপ পরাজিত হইয়াছিলেন, অনুচরগণের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় কোনক্রমে তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। মেবারের দুর্গগুলি একে একে শত্রুর হস্তগত হইল। তথাপি আকবরের সৈন্যদল ক্ষান্ত হইল না। প্রতাপকে তাহারা নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। হয়তো নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করিলেই আকবর সন্তুষ্ট হইতেন। কারণ, রাজপুত রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসনে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়াও প্রতাপ তাহাতে সম্মত হইলেন না। সহস্র প্রতিকূলতায় অবিচলিত থাকিয়া, বার বার পরাজয় সত্বেও তিনি নির্ভয়ে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি চিতোর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রায় সকল দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সাধ চিতোর-উদ্ধারের চেষ্টা সফল হয় নাই। যখন তিনি ইহলোক হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, তখনও চিতোর দিল্লীর পাদশাহের অধিকারে; শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগের সময়েও তিনি স্বদেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল

গোগুণ্ডা

রাণার সাফল্য

প্রতাপের মৃত্যু

না। তাই সেনানায়কদিগের নিকট হইতে তিনি প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন, "তাঁহারা তুর্কীর নিকট মেবার সমর্পণ করিতে পারিবেন না।" রাজপুতচরিত্রের যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর, সকলই রাণা প্রতাপের চরিত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপুতানায় তাঁহার অপেক্ষা বড় সেনাপতি অথবা রাষ্ট্রনায়কের অভাব ছিল না, কিন্তু ভারত ইতিহাসে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের ন্যায় বীর ও স্বদেশপ্রেমিক বাস্তবিকই বিরল।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে রণথম্ভোর ও কালিঞ্জর অধিকারের পর গুজরাট দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে। এক সময়ে এই প্রদেশটি দিল্লীর স্থলতানদিগের অধীন ছিল। হুমায়ুন স্বল্পকালের জন্য ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। এই প্রদেশে কু-শাসন ও অরাজকতা লাগিয়াই ছিল। সুতরাং আকবরের গুজরাট আক্রমণ একেবারে অনুচিত বলা যায় না। গুজরাটের অভিযান সম্রাট্ নিজেই পরিচালনা করিয়াছিলেন।

গুজরাট

ইহার পরে বঙ্গদেশের দিকে বাদশাহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শের শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার এক নিকট আত্মীয় বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আদিল শাহের রাজত্বকালে স্থর রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। এই বংশের শেষ রাজা শত্রুহস্তে নিহত হইলে, দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্ত্তা স্থলেমান কররাণি বঙ্গদেশে শাসনবিস্তারের সুযোগ পাইলেন। স্থলেমান বুদ্ধিমানের ন্যায় আকবরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

বঙ্গদেশ

স্থলেমান কররাণি

গৌড় হইতে তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া তিনি উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র দায়ূদ পিতার ন্যায় দূরদর্শী ছিলেন না। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সীমান্তের একটি ঘাঁটি আক্রমণ করিলেন। আকবর দেখিলেন বঙ্গবিজয়ের সুযোগ উপস্থিত। দায়ূদ পরাজিত হইয়া পাটনা হইতে উড়িষ্যার দিকে পলাইয়া গেলেন (১৫৭৪ খৃঃ)। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর জিলার তুকারয় নামক স্থানে তিনি আবার পরাজিত হইলেন। কিন্তু সম্রাটের সেনানায়ক মুনীম খাঁ দায়ূদের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে দায়ূদ দ্বিতীয়বার বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবারেও (১৫৭৬ খৃঃ) তিনি রাজমহলের নিকট পরাজিত হইলেন এবং এই যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ইহার পরে বাংলার পরাক্রমশালী কয়েকজন "ভৌমিক" বা জমিদার দীর্ঘকাল সম্রাটের প্রভুত্ব স্থাপনে বাধা দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ ও ঢাকার পূর্ব্বখণ্ডের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, বাখরগঞ্জের অন্তবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপের (বাক্‌লা) কন্দর্পনারায়ণ এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দায়ূদ

বাংলার প্রবীণগণ

আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জ্জা মহম্মদ হাকিম কাবুল শাসন করিতেছিলেন। তিনি ভারতের অসন্তুষ্ট ওমরাহদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন, সুতরাং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থান আক্রমণ করিয়া আকবর কাবুল অধিকার করেন। কাশ্মীর, সিন্ধু ও উড়িষ্যা যথাক্রমে ১৫৮৬, ১৫৯০-৯১ এবং ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হয়। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে বালুচিস্থান

কাবুল

কাবুল অধিকার

বিজিত হইল। সেই বৎসরই কান্দাহার আকবরের হস্তগত হয়। এইরূপে হিন্দুকুশ হইতে ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ আকবরের করতলগত হইল। কেবলমাত্র সিন্ধুর পরপারে পার্ব্বত্য জাতিদিগের সঙ্কীর্ণ বাসভূমি এবং অপর কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র স্থান আকবরের রাজ্যসীমার বাহিরে রহিল।

কান্দাহার

বিজিত ভূখণ্ডের সীমা

কিন্তু আকবর উত্তরভারতের প্রভুত্ব লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। দক্ষিণের মুসলমান-শাসিত রাজ্য কয়েকটির উপরও তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইল। তথাকার রাজারা সাধারণভাবে আকবরের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেই তিনি তৃপ্ত হইতেন, কিন্তু খান্দেশ ব্যতীত আর কোন রাজ্যই বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল না। আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হইল, তথায় বিজাপুরের ভূতপূর্ব্ব মহিষী এবং নিজামশাহী বংশের দুহিতা চাঁদ সুলতানা অপূর্ব্ব দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আকবরের সহিত আহম্মদনগরের রাজার সন্ধি হইল। বালক রাজা আকবরের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া বেরার প্রদেশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু এক বৎসর পরেই আবার দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল এবং (১৫৯৯ খৃঃ) আকবর স্বয়ং সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করিলেন। এদিকে চাঁদবিবির মৃত্যুতে

দাক্ষিণাত্য প্রদেশ

আহম্মদনগর

চাঁদ সুলতানা

বেরার ত্যাগ

আহম্মদনগর পতন

আভ্যন্তরীণ বাদবিসম্বাদে আহম্মদনগরের রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আকবরের আমলে আহম্মদনগরের রাজধানী অধিকৃত হইল বটে কিন্তু শাহজাহানের রাজত্ব পর্য্যন্ত তথাকার রাজবংশের বিলোপ হয় নাই। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে খান্দেশের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গ

অসীরগড়

অসীরগড় আকবরের হস্তগত হয়।



চাঁদ সুলতানা

বিদ্রোহ :— আকবরের মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ সকলেই যে বিশেষ প্রভুভক্ত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের কাহারও কাহারও আচরণে আকবরকে মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিব্রত ও বিপন্ন হইতে হইয়াছে।

উজ্‌বেগ বিদ্রোহ

আসফ্‌ খাঁ

১৫৬৪ হইতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েকজন উজ্‌বেগ দলপতি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। উজ্‌বেগ বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে, আসফ্‌ খাঁ আবার বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন। কিন্তু তিনি ত্রুটি স্বীকার

করিবামাত্র সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারের গোঁড়া মুসলমান দলপতিগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহ সহজে দমন হয় নাই।

বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহ

আকবর শেষজীবনে সুখভোগ বা শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। রাজকুমার সলিম ১৬০১ খৃষ্টাব্দে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে আকবরের প্রিয় সুহৃদ্ আবুল ফজল তাঁহারই ষড়্‌যন্ত্রে নিহত হন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র মুরাদের মৃত্যু হয়, তারপর রাজকুমার দানিয়ালের মৃত্যুতে যখন তাঁহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, তখন সলিম পিতার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবর দেহত্যাগ করেন।

যুবরাজ সলিমের বিদ্রোহ

মুরাদ ও দানিয়ালের মৃত্যু

আকবরের মৃত্যু

আকবরের চরিত্র ঃ—ভারতবর্ষের ইতিহাসে আকবর এক অনন্য-সাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি যেমন অসাধারণ রণদক্ষ যোদ্ধা তেমনই প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। তৈমুর বংশের প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণের মধ্যেও তাঁহার ন্যায় প্রভূত বলশালী ও অসীম সাহসী যোদ্ধা বিরল। প্রথম যৌবনে তিনি একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় আধম খাঁর সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। গুজরাট অভিযানের সময় তিনি অনেক সময়েই মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিতেন, অশ্বপৃষ্ঠে নির্ভয়ে তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। হিংস্রজন্তু শিকার করিবার সময়ে তিনি সচরাচর অনুচরবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। বহু যুদ্ধক্ষেত্রে

আকবরের শক্তি ও সাহস

তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন। নরহত্যা ও রক্তপাতে অভ্যস্ত হইলেও তিনি সর্ব্বদা অনর্থক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন বা জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহেন নাই। অনুতপ্ত বিদ্রোহীরা সম্রাটের নিকট চিরদিনই ক্ষমা লাভ করিয়াছে। পুনঃপুনঃ অপরাধ করিবার পরও তিনি তাঁহার ভ্রাতা হাকিমের প্রতি যে সদাশয়তা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। কখনও কখনও তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহার ব্যবহারে অমায়িকতার অভাব লক্ষিত হইত না। প্রজাসাধারণ আকবরকে এরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত যে, তাহারা দিল্লীশ্বরকেই জগদীশ্বরের আসন দিয়াছিল।

অযথা জিঘাংসায় বীতস্পৃহা

অসাধারণ লোকপ্রিয়তা

নিরক্ষর হইলেও আকবর অশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার জ্ঞানানুসন্ধানের স্পৃহা অতিশয় প্রবল ছিল। নিজে লিখিতে পড়িতে না পারিলেও সেকালের ভাল ভাল গ্রন্থ অপরের দ্বারা পড়াইয়া শুনিতেন এবং সর্ব্বদা বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসিতেন। যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ ও আবিষ্কারেও তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগ তিনি বিশেষ যত্নসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অসাধারণ উদ্যম ও যত্ন যদি প্রতিভার নিদর্শন হয়, তাহা হইলে আকবর নিশ্চয়ই অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

নিরক্ষরতা ও শিক্ষা

আবিষ্কারে উৎসাহ

প্রতিভা

তিনি শুধু কাজের লোক ছিলেন না, তাঁহার কল্পনাশক্তিও ছিল অনন্যসাধারণ। যদিও হিন্দুগণ শের শাহের নিকট সৎব্যবহার পাইয়াছেন এবং তাঁহার বংশধরদিগের আমলেও অনেক উচ্চ রাজপদে উন্নীত

হইয়াছিলেন তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাট্‌দিগের মধ্যে আকবরই প্রথম মুসলমান

বিচক্ষণতা

ও অ-মুসলমানের সকল প্রভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন। কাশ্মীরের জৈন্‌উল আবিদীন (১৪২০-৭০ খৃঃ) ব্যতীত আর কেহ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ সমদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই। আকবর বুঝিয়াছিলেন যে, প্রজার সদিচ্ছা ও আনুগত্য ব্যতীত কোন সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী

হিন্দুর আদর

হইতে পারে না। হিন্দুরা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলেন, আকবর বাদশাহ তাঁহাদের প্রতি অসমান আচরণ ও ঘৃণা প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই। রাজত্বের প্রারম্ভেই তিনি জিজিয়া কর

উদারতা

তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার পরে তীর্থ-যাত্রীদের কর রহিত করিয়া সকলের প্রতি সমান উদারতা দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে বাদশাহ সকল ধর্ম্ম বিরোধের উর্দ্ধে থাকিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল প্রজাই তাঁহার নিকট নিরপেক্ষ ও সমান ব্যবহার পাইবার অধিকারী, এবং তাঁহার রাজ্যে সকলেই স্বাধীনভাবে নিরুপদ্রবে স্বধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে। পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়গুলিকে একই মহাধর্ম্মের অন্তর্ভূত করিবার জন্য

দীন ইলাহি

তিনি "দীন ইলাহি" নামে এক নূতন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। এই নবধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মমতের মূলনীতি অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। "দীন ইলাহি" কোন প্রকার রাজনৈতিক চাতুরী অথবা অবিবেচনা-প্রসূত ধর্ম্মমত নহে ; আকবর সমগ্র অন্তর দিয়া সত্যের সন্ধান করিতেন এবং ধর্ম্ম-তত্ত্বালোচনায়ও তিনি বরাবর আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। নিজে পড়িতে পারিতেন না বলিয়া

বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের ধর্ম্মালোচনা গভীর অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিতেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে এই জন্য তিনি ফতেপুরে একটি "ইবাদৎখানা" বা আরাধনা-গৃহ নির্ম্মাণ করেন।

ভজনালয়

প্রথম তিন বৎসর মুসলমান ভিন্ন অন্য কাহাকেও এইখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ইহার পরে বাদশাহ হিন্দু, জৈন, পার্সি ও খৃষ্টান সাধুদিগকে দরবারে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য সহকারে তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ করিয়া তিনি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্বজনীন ধর্ম্মের পরিকল্পনা মহৎ ও প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আকবরের এই ধর্ম্ম সাধারণে গৃহীত হয় নাই। স্বাভাবিক উদারতাবশতঃ তিনি তাঁহার বন্ধু ও অমাত্যগণের উপর স্বীয় ধর্ম্মমত চাপাইতে চেষ্টা করেন নাই; তথাপি যে মহানুভব প্রজাপালক বিচ্ছিন্ন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ একত্র করিয়া নানা জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়কে একই সাম্রাজ্য এবং ধর্ম্মের অধীনে আনয়নের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার কল্পনা যদি সফল হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্বেই এক বিরাট অখণ্ড জাতি সংগঠিত হইতে পারিত।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি মনোভাব

আকবর শেষ জীবনে ইস্‌লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে উদার হইলেও আকবর সামাজিক অনাচারের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি সতীদাহ প্রথা অনুমোদন করিতেন না। সেকালে প্রচলিত বাল্যবিবাহের কুফল তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। সেই অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে এইরূপ সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা কম সাহসের পরিচয় নহে।

সমাজ সংস্কার

শাসন :—দিল্লীর অন্যান্য সম্রাটের ন্যায় আকবরও নিজের ইচ্ছা মত রাজ্যশাসন করিতেন। কোন বিষয়েই তাঁহার আদেশ ও ইচ্ছার উপরে আর কাহারও কথা খাটিত না। কিন্তু তিনি অবিবেচক ছিলেন না এবং প্রজাসাধারণ ও সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই লোক অত্যাচারী হয় না, আকবরও হন নাই। সেকালের হিসাবে আকবর সত্যসত্যই দয়ালু ও সদাশয় শাসক ছিলেন।

স্বেচ্ছাচারিতা
সুশাসন

বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম তিনি পছন্দ করিতেন না। তাই শাসন-কার্য্যে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানদিগের সময়ে যে জাগীর প্রথা প্রচলিত ছিল আকবর তাহা অনুমোদন করিতেন না। কারণ একদিকে এই প্রথায় সরকারী তহবিলে যেমন আর্থিক ক্ষতি হইত, অন্যদিকে তেমনই জাগীরদারগণ প্রবল হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত। সুতরাং এই পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি মনসব প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন। মনসবদার বা পদস্থ কর্ম্মচারিগণ ৩৩ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং তাহারা নিজ নিজ শ্রেণীর নির্দ্ধারিত হারে বেতন পাইত।

জাগীর প্রথা বিলোপ

মনসব

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্য ১৫টি সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল।* প্রত্যেক প্রদেশ একজন সিপাহ সলার বা সামরিক শাসনকর্ত্তার (পরবর্ত্তী সময়ের সুবাদার) অধীনে শাসিত

প্রাদেশিক শাসন

---

* সুবা—কাবুল, লাহোর, মূলতান, দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, আহম্মদাবাদ, মালব, বিহার, বঙ্গ, খান্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগর।



সংস্কৃত গ্রন্থানুবাদ

বীরবল ও তুলসীদাস

এবং আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় অথর্ব্ব বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং লীলাবতী নামক গণিতশাস্ত্রের গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। হিন্দী কবিতা লিখিয়া সুরসিক রাজা বীরবল খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দী কবিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ

ছিলেন তুলসীদাস। তিনিও আকবরের সমকালীন ব্যক্তি। তুলসীদাস রচিত রাম-চরিত-মানস আজিও উত্তর ভারতের সহস্র সহস্র কণ্ঠে প্রত্যহ গীত হইয়া থাকে। হিন্দী কবি সুরদাসও এই সময়েই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপে সাহিত্যে ও শিল্পে আকবরের রাজত্বকালে এক নব যুগের সূচনা হইয়াছিল।

সুরদাস

আকবরের হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে টোডর মল্লই সর্ব্বপ্রধান। যদিও যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার কৃতিত্বের অভাব ছিল না, তথাপি রাজস্ব-সচিবরূপেই ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। আকবরের রাজস্ব সংস্কার টোডর মল্লের চেষ্টায়ই সম্ভব হইয়াছিল। আকবর ছিলেন প্রকৃত গুণী, তাই তিনি গুণের সমাদর জানিতেন। টোডর মল্ল সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। বরং এই হিন্দু কর্ম্মচারীকেই একদিন তিনি রাজসভায় সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন।

টোডর মল্ল

অম্বরের রাজা মানসিংহ সম্রাটের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। আকবর তাঁহার পিতৃস্বসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং রাজকুমার সলিম ছিলেন তাঁহার ভগিনীপতি। কিন্তু সম্রাটের আত্মীয় বলিয়াই তিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন নাই। তিনি একজন সুযোগ্য সেনাপতি ছিলেন এবং আকবরের মৃত্যুর পরেও রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

মানসিংহ

আকবরের রাজত্বকাল যে সর্ব্বপ্রকারেই ভারতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার সময় কৃষির উন্নতি হইয়াছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়াছিল, শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান শাসক

হইত। তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে এবং নিজ ইচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করিতে পারিতেন। সম্রাটের অনুগ্রহের উপর তাঁহার চাকুরী নির্ভর করিত। সুবাদার তাঁহার শাসিত প্রদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দায়ী থাকিতেন। সমগ্র প্রদেশ অনেকগুলি "সরকারে" বা জিলায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সরকারের শাসনকর্ত্তার উপাধি ছিল ফৌজদার।

ফৌজদার, কোতোয়াল ও কাজী

কোতোয়ালগণ শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করিতেন এবং কাজি ও মীর আদলের প্রতি বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল। সম্রাট্ যেমন ভকিল (প্রধান মন্ত্রি), উজির (অর্থ-সচিব), প্রধান বক্সী (খাজাঞ্চি ও দলিলরক্ষক) ও সদর্ এর (ধর্ম্ম-সচিব) সাহায্যে সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, তেমনি প্রাদেশিক শাসনগণও বিভিন্ন বিভাগের

প্রাদেশিক কর্ম্মচারীর পরিচয়

জন্য বিভিন্ন কর্ম্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন। নিম্নে এই সকল প্রাদেশিক কর্ম্মচারীর পরিচয় প্রদত্ত হইল। (১) দেওয়ান বা প্রধান অর্থ-সচিব (২) প্রাদেশিক ধর্ম্ম-সচিব বা সদর্ (৩) আমিল বা রাজস্ব আদায়কারী (৪) বিতিকচি বা রাজস্বাদির হিসাবরক্ষক (৫) পোতদার বা কোষাধ্যক্ষ (৬) ওয়াকিয়া-নবীশ বা সংবাদ লেখক অর্থাৎ গুপ্তচর। এই সকল কর্ম্মচারিগণ শুধু প্রাদেশিক শাসনে সাহায্য করিতেন না, শাসনকর্ত্তার ক্ষমতাও সংযত রাখিতেন। রাজকর নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশ জরিপ করা হইয়াছিল। কৃষির অবস্থা অনুসারে জমিগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রথম তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটি

জমিবিভাগ

আবার ফসল ও উর্ব্বরতা অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত হইত। কৃষকদিগকে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর দিতে হইত। জমির ফসলের

পরিমাণ ও রাজস্বের হার দশ বৎসরের হিসাবে নির্দ্ধারিত হইত। আকবর যদিও নগদ মুদ্রায় রাজকর আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি ফসল গ্রহণেও বাধা ছিল না। তিনি অনেকগুলি অন্যায্য শুল্ক ও কর তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া রাজস্বের পরিমাণ বেশী হইলেও সাধারণের নিকট তাহা দুর্ব্বহ মনে হইত না। রাজস্ব আদায় সম্পর্কে আকবর শের শাহের পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন। ইহাতে সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল।

রাজকর নির্দ্ধারণ

শের শাহের প্রভাব

শিল্প ও সাহিত্যানুরাগের জন্য আকবর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার যুগের সহিত ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের যুগের তুলনা করা যাইতে পারে। ফতেপুর সিক্রীর পরিত্যক্ত নগর আকবরেরই স্মরণীয় কীর্ত্তি। এই শহরটি বহুকাল হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও ইহার সৌধাবলী দেখিয়া সেকালের স্থাপত্য-কৌশলে মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক তানসেন আকবরের সভাসদ ছিলেন। আকবরের অন্যতম সভাসদ মালবের বজবাহাদুর সেকালের সঙ্গীত বিজ্ঞান ও হিন্দী গানের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ওস্তাদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য ও শিল্প

ফতেপুর সিক্রীর ভগ্নাবশেষ

তানসেন ও বজবাহাদুর

যে সকল সাহিত্যিক আকবরের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ফৈজি ও আবুল ফজলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্য সাহিত্যে ফৈজি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা লিখিয়া আবুল ফজল অমর হইয়াছেন। এই যুগের কয়েকজন মুসলমান মনীষী সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন

ফৈজি ও আবুল ফজল

হইয়াছিল, সাধারণ লোক সুশৃঙ্খল শাসনে সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তি উপভোগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিত। দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌দিগের মধ্যে আকবরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ :—পিতার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরেই সলিম নূরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ গাজী উপাধি ধারণ করিয়া আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আরামপ্রিয় ও অলস ছিলেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পর বাংলা ও গুজরাটে বিদ্রোহ দেখা দিল। ওদিকে মেবার বিজয় সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে দিল্লীসম্রাটের মর্য্যাদা থাকে না। সুতরাং রাণার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য একদল পরাক্রান্ত সৈন্যসহ বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র পরভিজ মেবারের পথে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরুর বিদ্রোহে সম্রাটের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।



জাহাঙ্গীর

মেবার অভিযান

খুস্‌রুর বিদ্রোহ ঃ—আকবরের বড় আদরের পৌত্র খুস্‌রুকে অনেকেই ভালবাসিত। জাহাঙ্গীর যখন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তখন আকবরের পরে খুস্‌রুই সম্রাট্ হইবেন বলিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছিল। রাজসভায় তাঁহার হিতৈষীর অভাব ছিল না। তাঁহার মাতুল মানসিংহ, শ্বশুর খান-ই-আজম সকলেরই রাজদরবারে অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। খুস্‌রুর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য জাহাঙ্গীর নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই খুস্‌রু পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহার অনুচরেরা সম্রাটের আদেশে কঠোর ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিল। খুস্‌রুর পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া এই সময় শিখগুরু অর্জ্জুনের প্রাণদণ্ড হয়।

জনপ্রিয় রাজকুমার খুস্‌রু

খুস্‌রু বন্দী

গুরু অর্জ্জুনের হত্যা

নূরজাহান ঃ—বাংলার নব-নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা কুতবুদ্দীন খাঁ সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বর্দ্ধমানের জাগীরদার শের আফগানকে বন্দী করিতে যাইয়া তিনি নিহত হন। ওদিকে কুতবুদ্দীনের অনুচরগণ শের আফগানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে এবং তাঁহার অসামান্যা সুন্দরী পত্নী মেহের-উন্নিসাকে কন্যাসহ সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দেয়। কথিত আছে, এই সুন্দরী মহিলার জন্যই তাঁহার সাহসী স্বামীকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। মেহের কয়েক বৎসর পরে বাদশাহের প্রধানা মহিষী হইলেন (১৬১১ খৃঃ)। বাদশাহের সহিত

শের আফগান ও কুতব খাঁ



নূরজাহান

পরিণয়ের পরে মেহের নূরজাহান নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

মেহেরউন্নিসার পাণিগ্রহণ

নূরজাহান কেবল অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন না, তাঁহার বুদ্ধিমত্তাও ছিল অসাধারণ। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সম্রাটের উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করিলেন যে কার্য্যতঃ তিনিই সাম্রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন।

সার টমাস রো :—১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সার টমাস রো নামক জনৈক সদ্বংশজাত ইংরেজ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌এর দূতরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের সুবিধার জন্য তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন। সার টমাসের 'জার্ণালে' জাহাঙ্গীরের রাজত্বের কৌতূহলপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।

যুদ্ধবিগ্রহ :—নূরজাহানকে বিবাহ করার পরে জাহাঙ্গীর বাংলায় বিদ্রোহ দমন ও মেবার জয় করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ ও মেবার

প্রতাপসিংহের পুত্র রাণা অমরসিংহ পিতার ন্যায় অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। দিল্লীর সহিত সংঘর্ষে মেবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র কুমার খুরম্ সৈন্য দ্বারা মেবারের চারিদিক্ ঘিরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অতএব অমরসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হওয়ার হীনতা হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। তাঁহার পরিবারের কোনও নারীকে বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয় নাই।

পিতার পন্থা অনুসরণ করিয়া জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ বিজয়ে অগ্রসর হন। আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ হইল কিন্তু বড় বড় সেনাপতি পাঠাইয়াও বিশেষ কোন সুবিধা হইল না।

আহম্মদনগর

মালিক অম্বর

আহম্মদনগরের হাবসী মন্ত্রী মালিক অম্বর খিরকীতে রাজধানী স্থানান্তরিত

করিয়া রাজস্বপ্রথার উন্নতি সাধন করেন, এবং দক্ষতার সহিত সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। অবশেষে যুবরাজ খুরম্ দক্ষিণাপথ জয় করিতে গেলেন। তিনি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগর জয় করেন। পুত্রের বিজয় লাভে আনন্দিত হইয়া জাহাঙ্গীর খুরম্‌কে শাহজাহান উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

খুরম্

শাহজাহানের বিদ্রোহ :—১৬২২ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ কান্দাহার অধিকার করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার পুত্র শাহজাহানকে কান্দাহার উদ্ধার করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই সময় তিনি বিদ্রোহী হইলেন। এতদিন সিংহাসন সম্বন্ধে তিনি একরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন। শাহজাহান নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী মমতাজমহলকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও এতদিন তাঁহারই পক্ষপাতিত্ব করিয়া আসিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র পরভিজ অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন, সুতরাং খুস্রুর মৃত্যুর পর খুরমের আর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু যখন নূরজাহানের কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ হইল, তখন স্বভাবতঃই সম্রাজ্ঞী স্বীয় জামাতার স্বার্থরক্ষায় যত্নবতী হইলেন। শাহজাহানের আশঙ্কা হইল যে হয়তো কনিষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসন লাভের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই তাঁহাকে কান্দাহারে পাঠান হইতেছে। তাই পিতৃ-আজ্ঞা পালন না করিয়া তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

কান্দাহার

শাহজাহানের বিদ্রোহের কারণ

১৬২৫ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের সহিত জাহাঙ্গীরের আপোষ হয়, কিন্তু পরবৎসরেই অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার মহাবৎ খাঁর সাহায্যে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ আরম্ভ করেন।

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ :—মহাবৎ খাঁ জাতিতে আফ্‌গান ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁহার বিশেষ পদোন্নতি হয়। শাহজাহানের বিদ্রোহ দমনের সময়ে তিনি অতিশয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু নূরজাহানের শত্রুতায় তিনি বিদ্রোহী হইলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে কাবুল যাইবার পথে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান যখন ঝিলম নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন মহাবৎ খাঁ বাদশাহকে বন্দী করেন।

মহাবৎ খাঁর পরিচয়

নূরজাহান সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু তিনি যখন বুঝিলেন যে বাহুবলে স্বামীকে উদ্ধারের চেষ্টা বৃথা, তখন নিজেও মহাবৎ খাঁর বন্দিনী হইলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাদিগকে বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইল না। নূরজাহানের বুদ্ধিবলে মহাবৎ খাঁর বাহুবল ব্যর্থ হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাবৎ অবশেষে শাহজাহানের সহিত যোগ দিলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

সম্রাট্ বন্দী

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু

জাহাঙ্গীরের চরিত্র :—জাহাঙ্গীরের চরিত্র সত্যসত্যই বিপরীত গুণের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। যে সম্রাট্ নির্ব্বিকার চিত্তে জীবন্ত মানুষের চর্ম্ম উৎপাটন দেখিতেন, তিনিই আবার ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের সায়াহ্ন উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ আলোচনায় যাপন করিতেন। মনীষী আবুল ফজলকে হত্যা করাইয়াও যাঁহাকে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হইতে দেখা যায় নাই, তাঁহাকেই আবার শীতের দিনে ঠাণ্ডাজলে রাজহস্তীগুলিকে কাঁপিতে দেখিয়া দুঃখে কাতর হইতে দেখা যাইত। জাহাঙ্গীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

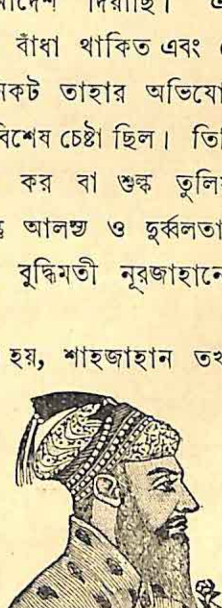
বিপরীত গুণের সংমিশ্রণ

প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। ফুল তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। তিনি নিজে সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন এবং সাহিত্য ও শিল্পে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার রচিত আত্মজীবনী বা "তুজুক" সে-কালের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু অন্যান্য গুণ অপেক্ষা ন্যায় বিচারের জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি লিখিয়াছেন, "বাদশাহ হইয়া আমি প্রথমেই বিচারের শৃঙ্খল বান্ধিবার আদেশ দিয়াছি।" এই শৃঙ্খলে ৬০টি ঘণ্টা বাঁধা থাকিত এবং যে কোনও সাধারণ প্রজা ঘণ্টা নাড়িয়া সম্রাটের নিকট তাহার অভিযোগ জানাইতে পারিত। সুশাসনের জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। তিনি অনেকগুলি অন্যায় কর বা শুল্ক তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আলস্য ও দুর্ব্বলতাই ছিল তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দোষ, তাই তিনি বুদ্ধিমতী নূরজাহানের ক্রীড়াপুত্তলিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

ন্যায় বিচার

শাসন সংস্কার

শাহজাহান ঃ—জাহাঙ্গীরের যখন মৃত্যু হয়, শাহজাহান তখন দক্ষিণাপথে। অতি দূরে থাকিলেও তাঁহার সিংহাসন লাভে অসুবিধা হয় নাই, কারণ সেদিকের সকল বাধা পূর্ব্বেই দূর হইয়াছিল। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে পরভিজের মৃত্যু হয়। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নূরজাহানের জামাতা শাহরিয়ার যেমন অকর্ম্মণ্য তেমনই অপদার্থ। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান আগ্রায় পৌঁছিয়া যথারীতি সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হন। আর কেহ যাহাতে সিংহাসনের দাবী করিতে না পারে তজ্জন্য শাহজাহান প্রথমেই রাজবংশের অনেককে ইহলোক


শাহজাহান

হইতে অপসারিত করিলেন রাজতক্তে যাহাদের ক্ষীণ দাবী থাকিতে পারে তাহাদের কেহই অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সুখে শান্তিতে কাটাইতে পারেন নাই, শেষ জীবনে আপনার সন্তান কর্ত্তৃক তিনি সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

আত্মীয়গণের প্রাণনাশ

বিদ্রোহ ঃ—সিংহাসন লাভের পরে শাহজাহানের চিন্তা বা ভয়ের কারণ ছিল না। দিল্লীর সাম্রাজ্য তখন গৌরবের উচ্চশীর্ষে অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডের ঝুঝর সিং ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা খানজাহান লোদী যখন বিদ্রোহী হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে দমন করিতে সম্রাটের বেগ পাইতে হয় নাই।

বুন্দেলা বিদ্রোহ

খানজাহান লোদী

হুগলী আক্রমণ ঃ—পর্ত্তুগীজগণ হুগলীতে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা নিরীহ প্রজার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিত। এই শহরের মধ্য দিয়া যে কোনও জিনিষ যাইত, ইহারা তাহার উপরেই জোর করিয়া শুল্ক আদায় করিত; এবং অনাথ হিন্দু ও মুসলমান শিশুদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। ইহার উপর আবার পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের উপদ্রবে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। পর্ত্তুগীজদের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ কাসিম খাঁকে হুগলী আক্রমণের আদেশ প্রদান করেন। তিনি ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী অধিকার করিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগীজ অত্যাচার

হুগলী আক্রমণ

শাহজাহান ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজ্য ঃ—পিতার শাসনকালে বহুদিন দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বাস করিয়া শাহজাহান সেখানকার সকল অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন। আহম্মদনগর তখন

শক্তিহীন, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা তৈমুরবংশীয় সম্রাটের ক্ষমতা প্রতিরোধে অসমর্থ। শাহজাহান ও মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহের সময় দক্ষিণের মুসলমান রাজ্যগুলি কিছুকাল বিশ্রাম পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং সম্রাট্ দক্ষিণে আপনার প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্কল্প করিলেন। শাহজাহান ছিলেন গোঁড়া সুন্নী এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজারা শিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত। সুতরাং ধর্ম্মগত বিদ্বেষে রাজনৈতিক বিরোধ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগর অধিকৃত হয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদিগকে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করাইবার জন্য সম্রাট্ নিজেই দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান ভীত হইয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বাৎসরিক কর দিতে সম্মত হন। বিজাপুররাজ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার পরাজয় হইল। বিজাপুররাজ বাৎসরিক করদান হইতে অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু সম্রাটের আশ্রিত গোলকুণ্ডা রাজ্যে উৎপাত করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল (১৬৩৬ খৃঃ)। শাহজাহান তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীবকে যখন দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা (সুবাদার) নিয়োগ করিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর।

আহম্মদনগর অধিকার

বিজাপুর সন্ধি

ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সুবাদার

কান্দাহার ও মধ্য এশিয়া ঃ—শাহজাহানের সৌভাগ্য তখন গৌরবের উচ্চশীর্ষে। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আলী-মর্দ্দন খাঁ নামে পারস্যরাজের একজন বিশ্বাস-ঘাতক কর্ম্মচারীর সাহায্যে তিনি কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। বার বার বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া সম্রাটের দুরাকাঙ্ক্ষার সীমা রহিল না। এবারে পিতৃপুরুষের প্রাচীন রাজ্য জয়ের বাসনা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া

কান্দাহার পুনরুদ্ধার

উঠিল। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্-পুত্র মুরাদবক্স বালখ ও বদখ্যান প্রদেশ জয় করেন। কিন্তু শাহজাহান এই রাজ্য এক বৎসরের বেশী নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। এই অভিযানে প্রচুর অর্থ ও লোকক্ষয় হইয়াছিল।

বালখ্ ও বদখ্যান অধিকার

কান্দাহারও বেশী দিন শাহজাহানের দখলে রহিল না। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যের শাহ কান্দাহার দুর্গ পুনরায় অধিকার করিলেন। শাহজাহানের আমলে তিনবার (১৬৪৯, ১৬৫২ ও ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে) কান্দাহার উদ্ধারের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

কান্দাহার হস্তচ্যুত

দক্ষিণাপথের রাজ্যসমূহ :—১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীব দ্বিতীয়বার দক্ষিণাপথের সুবাদার হন। এতদিন এই প্রদেশে এমন শাসন-বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল যে তথাকার রাজস্বে সরকারী ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। ঔরঙ্গজীব প্রথমেই আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে মন দিলেন। এই কঠিন কার্য্যে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ নামে একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারীর বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। জমির জরিপ ও রাজস্ব নির্দ্ধারণে তিনি দক্ষিণে টোডর মল্লের প্রথা অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজীবের দ্বিতীয়বার দক্ষিণাপথ শাসন

মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব সংস্কার

ইহার পরে ঔরঙ্গজীব গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয়ে মনোনিবেশ করেন। গোলকুণ্ডার সুলতান তাঁহার প্রতিশ্রুত কর দেন নাই। ঔরঙ্গজীব দেখিলেন এই অপরাধই গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই সময় গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রীর সহায়তা পাওয়ায় ঔরঙ্গজীবের সঙ্কল্পসিদ্ধির আরও সুবিধা হইল।

গোলকুণ্ডা

মন্ত্রী মহম্মদ সৈদ, মীরজুম্‌লা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এদেশে আসিয়া তিনি জহরতের ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডার স্থলতান মীরজুম্‌লার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তাঁহাকে প্রধান অমাত্যপদে নিয়োগ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই মীরজুম্‌লা প্রভুর রাজ্যে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। কর্ণাটকের এক বিস্তীর্ণ অংশ জয় করিবার পর তিনি প্রকাশ্য ভাবে প্রভুর ক্ষমতা উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্থলতান যখন মন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মীরজুম্‌লা ঔরঙ্গজীবের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ঔরঙ্গজীব গোলকুণ্ডার স্থলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু সম্রাট্ শাহজাহান যখন শান্তি স্থাপনের আদেশ দিলেন তখন পায়ান্তর না দেখিয়া ঔরঙ্গজীব স্থলতানের সহিত সন্ধি করেন। স্থলতানের নিকট যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ এবং রামগিরি জেলা আদায় করা হয়। এই সঙ্গে গোলকুণ্ডার সমস্ত বাকী করও পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। ইহার অনতিকাল পরেই (১৬৫৬ খৃঃ) মীরজুম্‌লা সম্রাটের মন্ত্রিপদে উন্নীত হন।

মীরজুম্‌লার বাল্য পরিচয়

প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ

রাজ্য বিস্তার

গোলকুণ্ডার সহিত যুদ্ধ

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হওয়ায় বিজাপুর আক্রমণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। গোলকুণ্ডার ন্যায় বিজাপুরকেও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে হইল (১৬৫৭ খৃঃ)। ইহার অল্পদিন পরে শাহজাহান কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাদশাহের সিংহাসন-লোলুপ পুত্রগণ তাড়াতাড়ি রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিজাপুর আক্রমণ

সন্ধি স্থাপন

গৃহবিবাদ :—শাহজাহানের চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দারা শিকো পিতার অত্যন্ত প্রিয় এবং বিশ্বাসী ছিলেন। শাহজাহানের ক্ষমতা থাকিলে তাঁহাকেই সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত করিতেন। বিদ্যোৎসাহী দারা শিকো হিন্দু পণ্ডিত ও খৃষ্টান যাজকগণের সহিত অবাধে মেলা-মেশা করিতেন। তাঁহার আনুকূল্যেই উপনিষদের পার্শি অনুবাদ হইয়াছিল। দারা শিকোর পরধর্ম্মপ্রীতির জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার সুনাম ছিল বটে ; কিন্তু আরাম-প্রিয়তা ও বিলাস-ব্যসনেই তাঁহার সকল গুণ নষ্ট হইয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ গুজরাট শাসন করিতেন। তিনি অত্যন্ত অমিতাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব অসাধারণ কর্ম্মনৈপুণ্যে ও সামরিক কৌশলে ভ্রাতাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং গোঁড়া সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

দারা শিকো

সুজা

মুরাদ

ঔরঙ্গজীব

শাহজাহান যখন সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকো পিতার নিকট আগ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার অনুপস্থিত পুত্রত্রয়ের মনে সন্দেহ হইল, হয়তো শাহজাহানের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু দারা শিকো তাহা গোপন করিতেছেন। সিংহাসনের লোভে তাঁহাদের বিচার বিবেচনা লোপ পাইয়াছিল। সুজা রাজমহল হইতে আপনাকে সম্রাট্ ঘোষণা করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মুরাদও এই সুযোগে আহম্মদাবাদে

সুজার বিদ্রোহ

আপনাকে সম্রাট্ ঘোষণা করিলেন এবং ঔরঙ্গজীবের সহিত সাম্রাজ্য ভাগ করিবার জন্য মালবে মিলিত হইলেন।

মুরাদ ও ঔরঙ্গ-জীবের বন্ধুত্ব

এদিকে শাহজাহান ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দুর্ব্বিনীত পুত্রগণ তাঁহাকে মানিতে চাহিলেন না। সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব ও মুরাদের সম্মিলিত সৈন্যের বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁকে প্রেরণ করিলেন। ওদিকে সুজার বিদ্রোহ দমনের জন্য দারা শিকোর পুত্র সুলেমান শিকো পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু উজ্জয়িনীর নিকটে ধর্ম্মাট নামক স্থানে যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হইলেন (এপ্রিল, ১৬৫৮ খৃঃ) এবং মুরাদ ও ঔরঙ্গজীব বিজয়গর্ব্বে আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ধর্ম্মাটের যুদ্ধ

আগ্রার আট মাইল দূরে সামুগড় নামক স্থানে দারা শিকো তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন। আগ্রা অধিকার করিয়া ঔরঙ্গজীব পিতাকে বন্দী করিলেন। ইহার অল্পদিন পরে বিচারের নামে মুরাদের প্রাণদণ্ড করিয়া ঔরঙ্গজীব দারা শিকো ও সুজার শক্তি খর্ব্ব করিতে উদ্যোগী হইলেন।

সামুগড়

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সুলেমান শিকো কাশীর নিকটে সুজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সামুগড়ের যুদ্ধে দারার পরাজয় হওয়াতে সুজা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিলেন কিন্তু খাজুয়ার যুদ্ধে তিনি ঔরঙ্গজীবের হস্তে পরাজিত হইলেন (জানুয়ারী, ১৬৫৯ খৃঃ)।

সুজার পরাজয়

খাজুয়ার যুদ্ধ

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মীরজুম্‌লা পলায়নপর সুজার পশ্চাদনুসরণ করেন। নিরুপায় সুজা আরাকানে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ইহার

পরে আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ আরাকানীদের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজীবের নিকট সকলেই একে একে পরাজিত হইতেছে দেখিয়া, স্থলেমান শিকোর সৈন্যদলও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি গাড়োয়ালের হিন্দু রাজার আশ্রয় লইলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গাড়োয়ালের রাজকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অতিথিকে ধরাইয়া দিলেন।

স্থলেমান শিকো

দারার যুদ্ধ

দারা শিকোর অদৃষ্টেও শান্তি ছিল না। সামুগড়ের পরাজয়ের পর গুজরাটের শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তখন যশোবন্ত সিংহের সাহায্যের আশ্বাসে প্রলুব্ধ হইয়া দারা শিকো আজমীর অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু প্রয়োজনের সময় যশোবন্ত সিংহের সাহায্য পাওয়া গেল না। ইহার ফলে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে দেওরাইএর গিরিবর্ত্মে দারা শিকো পরাজিত হইলেন। তখন তিনি সীমান্তের দিকে পলায়ন করিলেন, সেখানে একজন আফগান সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বন্দী হইলেন। ঔরঙ্গজীব তাঁহার এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে সর্ব্বদাই ভয় করিতেন। ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া দারা শিকোর প্রাণদণ্ড হইল। তাঁহার ছিন্ন শির শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে সমারোহ সহকারে প্রদর্শিত হইল।

দেওরাইএর যুদ্ধ

দারা শিকোর প্রাণদণ্ড

এদিকে সিংহাসনচ্যুত, বন্দী শাহজাহানের দুরদৃষ্টের আর সীমা রহিল না। অকারণ লাঞ্ছনা ও অনাবশ্যক অপমানে তাঁহার দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর চিরশীতল ক্রোড়ে একদিন তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়।

শাহজাহানের শেষ জীবন

শাহজাহানের চরিত্র ঃ—নির্ম্মম যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের প্রতি অকরুণ হইলেও সম্রাট্ হিসাবে শাহজাহান মন্দ ছিলেন না। ১৬৩০-৩২ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রজাদিগের অনশন-ক্লেশ দূর করিতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দুগণ উচ্চরাজপদে নিযুক্ত হইতেন বটে, কিন্তু তিনি ধর্ম্মসম্পর্কে পিতামহের ন্যায় উদারতা প্রদর্শন করেন নাই। শাহজাহান কেবল নূতন মন্দির নির্ম্মাণে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অনেক প্রাচীন হিন্দু-মন্দির তাঁহার আদেশে ধ্বংস হইয়াছিল। ধর্ম্ম-সম্পর্কে তিনি যে অনুদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সম্রাটের রাজত্বে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে।

নির্ম্মম যোদ্ধা

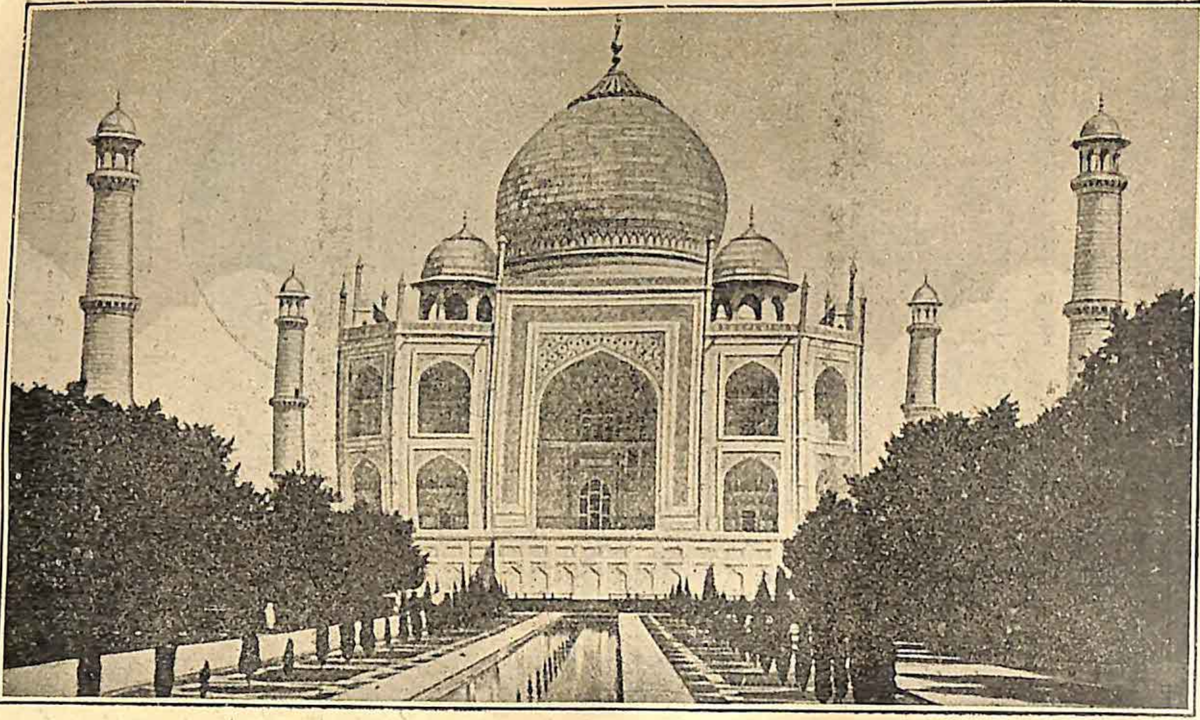
ধর্ম্মসম্পর্কে অভিনব রীতি



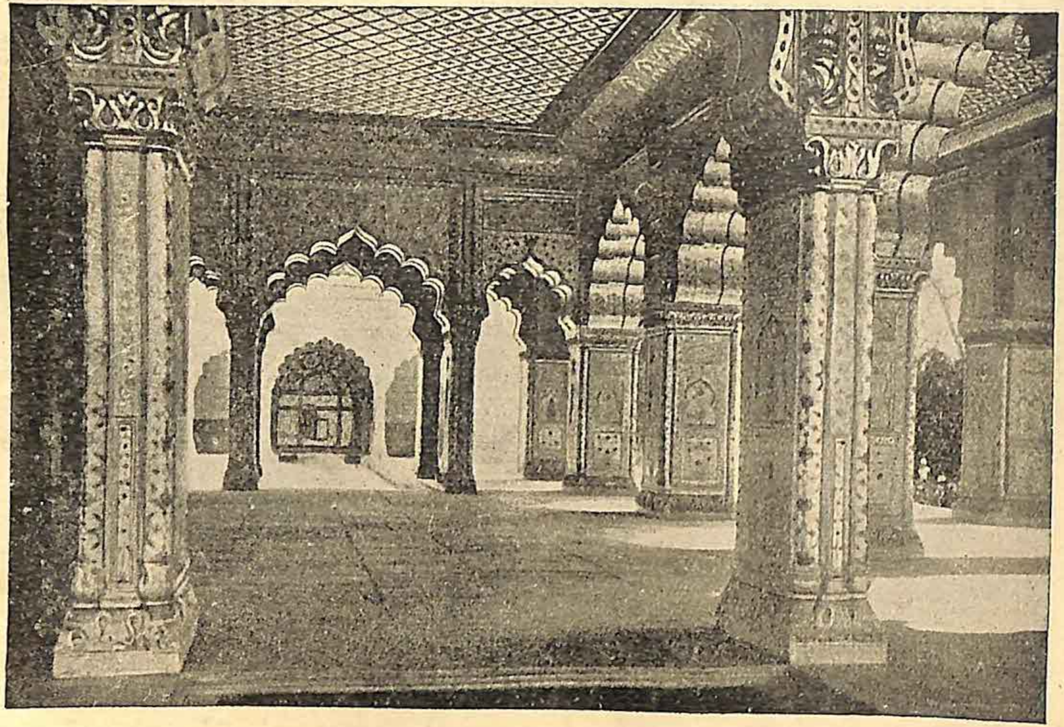
মমতাজমহল

তাঁহার সন্তান বাৎসল্য ও পত্নীপ্রেম ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহার সমাধির উপরে যে অপূর্ব্ব সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন আজিও তাহা পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতমরূপে পরিচিত। এই সমাধি

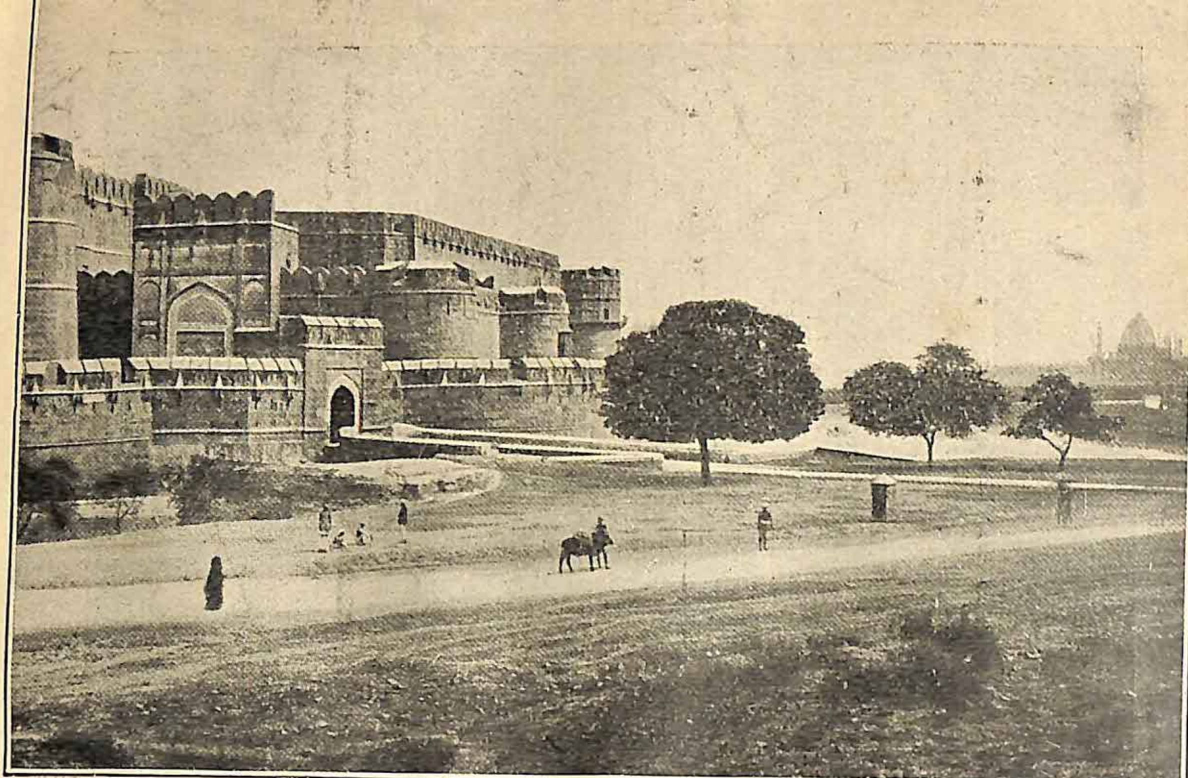
তাজমহল



আগ্রার তাজমহল



দেওয়ান-ই-খাস্



আগ্রা দুর্গে অমরসিংহ দ্বার

মন্দির কেবল তাঁহার পত্নীপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন নহে, স্থাপত্যশিল্পের ইহা একটি অতুলনীয় কীর্ত্তি।

শাহজাহানের ঐশ্বর্য্য ঃ—শাহজাহানের শাসনকাল সম্পদ্ ও সমৃদ্ধির জন্য সুবিখ্যাত। আগ্রা ও দিল্লীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই দুইটি নগরের স্থাপত্য-সম্পদে দর্শকের চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। তাজমহলের সৌন্দর্য্য ও শিল্পকলা অতুলনীয়। আগ্রার মতি মস্‌জিদের অপূর্ব্ব শোভা ভুলিবার নহে।

মতি মস্‌জিদ
দেওয়ানী আম
দেওয়ান-ই-খাস্
জাম-ই-মস্‌জিদ

দিল্লীর উপকণ্ঠে সম্রাট্ একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদপুরী তাঁহারই নামানুসারে শাহজাহানাবাদ নামে পরিচিত। দেওয়ানী আম ও দেওয়ান-ই-খাসের কারুকার্য্যে কিরূপ বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছে তাহা সহজে কল্পনা করা যায় না। জাম-ই-মস্‌জিদ বা মস্‌জিদ-ই-জাহান নুমা শাহজাহানের আর একটি স্মরণীয় কীর্ত্তি।

ময়ূর সিংহাসন

ভুবনবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন শাহজাহানের রাজত্বকালেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। সিংহাসনের চারি পদ স্বর্ণ নির্ম্মিত, দ্বাদশটি মরকতমণিখচিত স্তম্ভের উপর চন্দ্রাতপ বিস্তৃত এবং প্রত্যেক স্তম্ভে বহুমূল্য রত্নভূষিত দুইটি ময়ূর পেখম মেলিয়া আছে। প্রত্যেক ময়ূরযুগ্মের মধ্যে হীরা মরকতমণি-খচিত একটি বৃক্ষ। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ এই সিংহাসনখানি পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তির চিহ্নমাত্রও আর অবশিষ্ট নাই।

নাদির শাহের লুণ্ঠন

চিত্রশিল্প

শাহজাহানের আনুকূল্যে চিত্রশিল্পেও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দেশে সুখসমৃদ্ধির অভাব ছিল না। ভারতবর্ষের কলা এবং শিল্পের ইতিহাসে শাহজাহানের রাজত্ব চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

ঔরঙ্গজীব ও শিবাজী

ঔরঙ্গজীব ঃ—ঔরঙ্গজীব যখন তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তখন তৈমুরবংশীয় সম্রাট্‌গণের ক্ষমতা গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। যদিও নূতন বাদশাহের সময় সাম্রাজ্যের আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হইয়াছিল, তথাপি ঔরঙ্গজীব জীবিত থাকিতেই ইহার পতনের পূর্ব্বাভাষ লক্ষিত হইয়াছে। তৈমুরবংশীয় নরপতিদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় শ্রমশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ শাসনকর্ত্তা আর দেখা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার পরিশ্রম ও যত্ন সফল হয় নাই। তিনি নিজেই মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্যর্থতার বেদনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গভীর নৈরাশ্যে সম্রাট্ লিখিয়াছেন, "আমি সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসন একেবারেই করিতে পারি নাই,

সাম্রাজ্যগৌরব

পরিশ্রমী সম্রাট্



ঔরঙ্গজীব

কৃষকদের হিতসাধনও সম্ভব হয় নাই।...... আমার সৈন্যগণও আমার ন্যায় অসহায়, অস্থির ও বিমূঢ়চিত্ত।" এমনি করিয়া আবুল-মুজফ্‌ফর মহীউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজীব বাহাদুর আলমগীর পাদশাহ গাজীর সুদীর্ঘ শাসন এক বিরাট্ ব্যর্থতার মধ্যে শোচনীয় ভাবে শেষ হইয়াছিল।

শেষ জীবনের নৈরাশ্য

দুইবার রাজ্যাভিষেকঃ—১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আগ্রা অধিকারের পর একবার এবং খাজুয়া ও দেওরাই যুদ্ধ বিজয়ের পরে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আর একবার ঔরঙ্গজীবের অভিষেক উৎসব হইয়াছিল। প্রচলিত প্রথা অনুসারে অভিষেকের সময় তিনিও অনেকগুলি অন্যায্য কর তুলিয়া দিবার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

আসাম ও চাটগাঁও অভিযানঃ—১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্ত্তা মীরজুম্‌লা একটি সুসজ্জিত সেনা-বাহিনী লইয়া আসাম বিজয়ে যাত্রা করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আহোমগণ তাঁহাদের উত্তর ব্রহ্মের আদিম বাসভূমি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পরে ক্রমশঃ রাজ্য বিস্তার করিয়া তাঁহারা সমগ্র আসামে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। আসামে আগমনের পরে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রভাবে তাঁহারাও হিন্দুদের ধর্ম্ম ও আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে কুচ্ হজো বা বর্ত্তমান কামরূপ জিলা বাংলার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সূত্রে অবশেষে দুই পক্ষে বিরোধ হয়। ইহার পরে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে দুই পক্ষের সন্ধি হয়। কিন্তু সিংহাসনের অধিকার লইয়া

মীরজুম্‌লা

আহোম রাজ্য

দিল্লীতে যখন বিরোধ চলিতেছিল সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া আহোমগণ গৌহাটি অধিকার করেন। প্রথমে মীরজুম্‌লা কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কুচবিহার জয় করিয়া তিনি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আহোম রাজধানী ঘরগাঁও অধিকার করিলেন। আহোম সৈন্যদল প্রথমে আক্রমণকারীদিগকে বিশেষ কোনও বাধা দেন নাই, কিন্তু শীঘ্রই পথশ্রমে ও খাদ্যের অভাবে মীরজুম্‌লার সৈন্যদল অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। তাই তাঁহাদের বার বার পরাজয় ঘটিতে লাগিল। অবশেষে আহোমরাজ জয়ধ্বজ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বহু টাকা ও বাৎসরিক কর-দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে মীরজুম্‌লার সেনাদলের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা বড়ই শোচনীয়। আসামের জলবায়ু মীরজুম্‌লার সহ্য হইল না। যুদ্ধের শ্রমে ও নানারূপ অসুবিধায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। আসাম অভিযান শেষ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে আহোমগণ কামরূপ অধিকার করেন। পূর্ব্ব সীমান্তের এই উৎপাত দমনের জন্য দিল্লী সরকার মাঝে মাঝে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী সুফল ফলে নাই। মীরজুম্‌লার পরবর্ত্তী সুবাদার সায়েস্তা খাঁ পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের মিত্র আরাকান রাজ্যের অধিকৃত চাটগাঁও দখল করিয়াছিলেন।

মীরজুম্‌লার সাফল্য

আহোমরাজের সহিত সন্ধি

মীরজুম্‌লার মৃত্যু

আহোমগণ ও কামরূপ

চট্টগ্রাম বিজয়

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত :—ঔরঙ্গজীবের শাসনকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্দ্দান্ত উপজাতি সমূহ আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বাদশাহ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। ভেদনীতির প্রভাবে

বিদ্রোহী নায়কদিগের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজীবের ধর্ম্মনীতিঃ—প্রজাবাৎসল্য অপেক্ষা ঔরঙ্গজীবের ধর্ম্মানুরাগই প্রবল ছিল। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন ও মাদক দ্রব্যে অনাসক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে দরবেশের ন্যায় ভক্তি করিত। সেকালের নরপতিগণের ন্যায় ঔরঙ্গজীব ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন না। মুসলমানগণ তাঁহাকে জিন্দা পীর বা জীবিত মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করিতেন। ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। এজন্য তিনি আকবরের প্রবর্ত্তিত নীতি পরিত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মীর দণ্ডবিধান আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে করিতেন ভারতবর্ষ মুসলমান রাজ্য—এখানে মূর্ত্তি পূজার স্থান নাই। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে উৎসাহিত করিবার জন্য নবদীক্ষিত মুসলমানদিগকে পুরস্কার ও উচ্চ সম্মান প্রদানের ব্যবস্থা হইল। আর অ-মুসলমানদিগের উপর নানারূপ কর ধার্য্য হইল। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজপুত ব্যতীত আর কোন হিন্দু পাল্কী, হাতী অথবা উত্তম শ্রেণীর ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে না বলিয়া আজ্ঞা প্রচারিত হইল। হিন্দুদিগের মধ্যে অস্ত্র ব্যবহার পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইল। ঔরঙ্গজীব যাহা ন্যায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাই করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই ব্যবস্থাবৈষম্যে অ-মুসলমানগণের মন ব্যথিত না হইয়া পারে নাই।

নৈষ্ঠিক মুসলমান

লক্ষ্য

অর্থদণ্ড

জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্ত্তন

অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা

জাঠ বিদ্রোহ ও ছত্রসাল বুন্দেলাঃ—ইহার ফলে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মথুরার জাঠগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহ অতিশয়

কঠোরতার সহিত দমন করা হইয়াছিল। ঔরঙ্গজীবের অনুদারতার জন্য বুন্দেলা-রাজ ছত্রসাল বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া তিনি আপনাকে হিন্দুদিগের রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করেন (১৬৭১ খৃঃ)। মোগলদিগের সহিত তাঁহার অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং বহু সংগ্রামে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহদমনে কঠোরতা

ছত্রসালের সাফল্য

সৎনামী বিদ্রোহ :—ইহার পরে সৎনামীগণ বিদ্রোহী হইল। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই স্বর্ণকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। কি উপলক্ষে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল ঠিক বলা যায় না। সম্রাটের শিক্ষিত সেনাবাহিনীর হস্তে অচিরে সৎনামী দল পরাজিত হইল।

সৎনামী সম্প্রদায়

শিখ :—ঔরঙ্গজীবের ধর্ম্মনীতির ফলে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যেও অশান্তি এবং অসন্তোষ প্রবল হইয়া উঠিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর পঞ্চম শিখগুরু অর্জ্জুনের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ শিষ্যদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন এবং নবম শিখগুরু তেগ্‌বাহাদুর যখন কাশ্মীরী পণ্ডিতদিগকে ধর্ম্মের অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে বলিলেন যে ধর্ম্মত্যাগ করিলে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে। শিখগুরু শির দিলেন কিন্তু সের (ধর্ম্ম) দিলেন না। ধর্ম্মের জন্য তেগ্‌বাহাদুরের এই আত্মোৎসর্গ তাঁহার শিষ্যগণের মনে এক নবীন প্রেরণার সঞ্চার করিল।

হরগোবিন্দ

তেগ্‌বাহাদুরের প্রাণদণ্ড

রাজপুত বিদ্রোহঃ—যে সকল রাজপুত এতদিন সম্পদে বিপদে সম্রাটের প্রধান সহায় ছিলেন, তাঁহারাও বাদশাহের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন।

যশোবন্তসিংহের মৃত্যু

মারবারের রাজা যশোবন্তসিংহ সম্রাটের কার্য্যে কাবুলে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আফ্‌গান সীমান্তের জামরুদ নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঔরঙ্গজীব ভাবিলেন এই সুযোগে তিনি মারবার রাজ্য খাস করিয়া লইবেন। যশোবন্তের শিশুপুত্র অজিতসিংহকে লইয়া তাহার অনুচরেরা দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ তাহাকে নিজ অন্তঃপুরে রাখিয়া পালনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু রাঠোর নায়কগণ ইহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। সেনাপতি দুর্গাদাস অসাধারণ সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে শিশু অজিতসিংহ ও তাহার মাতাকে লইয়া যোধপুরে পলায়ন করিলেন। তখন ঔরঙ্গজীব নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যোধপুর ও অন্যান্য বড় শহরগুলি দখল করিলেন। রাঠোর রাজধানী লুণ্ঠিত হইল; মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করা হইল। কিছুকাল পরে মেবারের রাণা রাজসিংহ অজিতসিংহের সহায় হইলেন।

মারবারের প্রতি ঔরঙ্গজীবের আচরণ

রাজসিংহের যোগদান

সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্ত্তনে মেবারের রাণা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজীব ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সম্রাটের বিশাল বাহিনী রাজসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিল। বুদ্ধিমান রাণা শত্রুর ক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া শহর ছাড়িয়া পার্ব্বত্য দুর্গে লুকাইয়া রহিলেন।

মেবার আক্রমণ

ইহাতে সম্রাটের সৈন্যদল রাজপুতদিগের ঘর বাড়ী ধ্বংস করিয়া

পর্ণকুটির জ্বালাইয়া দিয়া মেবারকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করিল। কিন্তু রাজপুতগণ ইহাতে ভীত হইলেন না। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে দিল্লীর সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা একদিন সম্রাটের চতুর্থ পুত্র আকবরের সৈন্যদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার রসদ লুণ্ঠন করিলেন। ঔরঙ্গজীবের সেনাদল ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল।

সম্রাট্ সৈন্যের বিমূঢ়তা

রাজপুত্র আকবরের বিদ্রোহ ঃ—ইহার পর মহম্মদ আকবর সিংহাসনের লোভে রাজপুতদিগের সহিত যোগদান করিলেন (১৬৮১ খৃঃ)। তৎপরতার সহিত বাদশাহের শিবির আক্রমণ করিলে আকবরের বিশেষ সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি আলস্যে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চতুর বাদশাহ এই সুযোগে একখানি চিঠির সাহায্যে রাজপুতগণের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিলেন যে আকবর তাহাদিগের অনিষ্ট সাধনের জন্য চতুরতা পূর্ব্বক তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। রাজপুতেরা আকবরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিদ্রোহী বাদশাহজাদা উপায়ান্তর না দেখিয়া দুর্গাদাসের সাহায্যে মহারাষ্ট্রে পলায়ন করিলেন। পিতার ভয়ে পরিশেষে তিনি জলপথে পারস্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আকবরের ভুল

শাহজাদা আকবরের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ

রাণার সহিত সন্ধি ঃ—ঔরঙ্গজীব যখন বুঝিলেন রাজপুতদিগকে বলপ্রয়োগে দমন করা যাইবে না, তখন রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। রাণা জিজিয়া করের পরিবর্ত্তে সম্রাট্‌কে কয়েকটি জিলা ছাড়িয়া দিলে সম্রাট্‌ও মেবার হইতে তাঁহার সৈন্য সরাইয়া লইলেন

মেবারের সহিত সন্ধি

(১৬৮১ খৃঃ)। ঔরঙ্গজীব দেখিলেন এইবারে তাঁহার দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাওয়া আবশ্যক, কারণ বিদ্রোহী আকবর তখন সেখানেই অবস্থান করিতেছিলেন। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ মারবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব যখন দক্ষিণাপথে দেহত্যাগ করেন, তখনও এই যুদ্ধ শেষ হয় নাই। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে অজিতসিংহ পিতার রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সংগ্রামে ঔরঙ্গজীবের রাজ্য অথবা গৌরব কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। কেবল মেবার ও মারবারের সহিত সম্রাটের অসদ্ভাব হইল এবং রাজপুতানায় অশান্তি আরম্ভ হইল।

অজিতসিংহের রাজ্যোদ্ধার

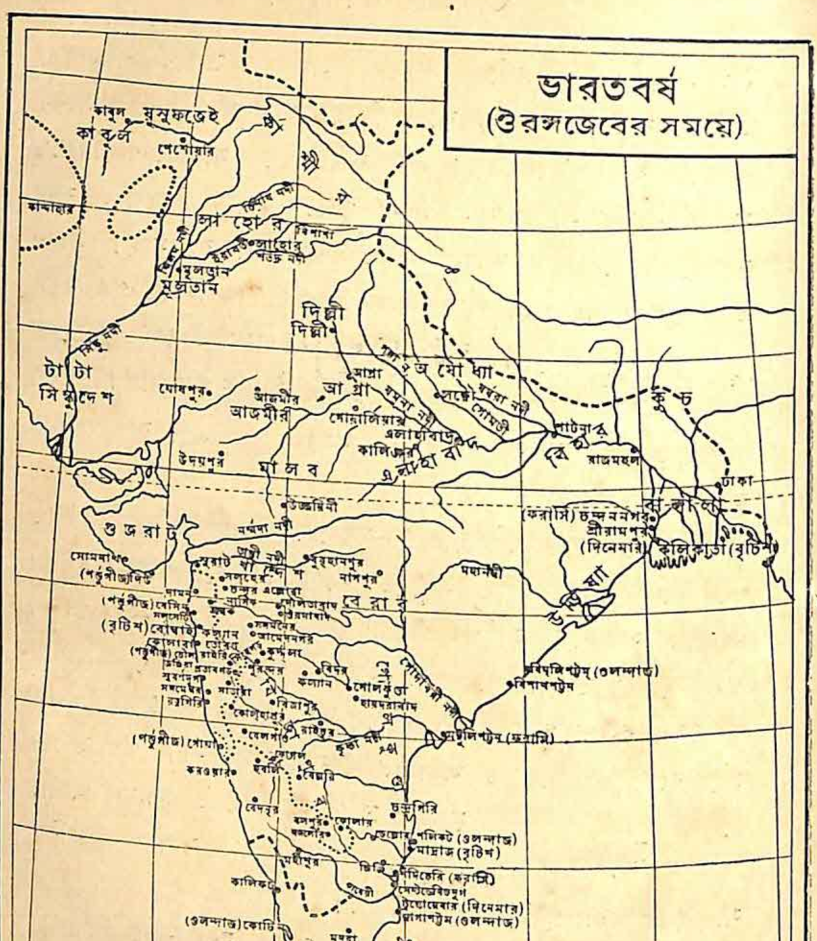
দ্বিতীয় জাঠ বিদ্রোহঃ—সম্রাটের অনুপস্থিতিতে উত্তর ভারতের দুর্দ্ধর্ষ জাতি সমূহের মধ্যে চাঞ্চল্য আরম্ভ হইল। আগ্রার সন্নিকটে জাঠগণ আবার বিদ্রোহী হইল (১৬৮৫ খৃঃ)। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা আকবরের সমাধিমন্দির লুণ্ঠন করিল।

তিন বৎসর পরে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের প্রধান দুর্গটি বিজিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে অশান্তির অবসান হইল না। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে তাহাদের নেতা চুরামন আবার বিশৃঙ্খল জাঠদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সামরিক ক্ষমতায় দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল।

চুরামন

শিবাজীঃ—দক্ষিণাপথে বহুদিন পর্য্যন্ত মরাঠা-বীর শিবাজীর প্রতাপে বাদশাহের কর্ম্মচারীরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উত্তর ভারতের বিদ্রোহ একটু প্রশমিত হইলে, ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ স্বয়ং ঔরঙ্গাবাদে উপস্থিত হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিয়া তিনি মরাঠা জাতির বিলোপ সাধন করিবেন। ঔরঙ্গজীবের দক্ষিণাপথে

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ঔরঙ্গজীব

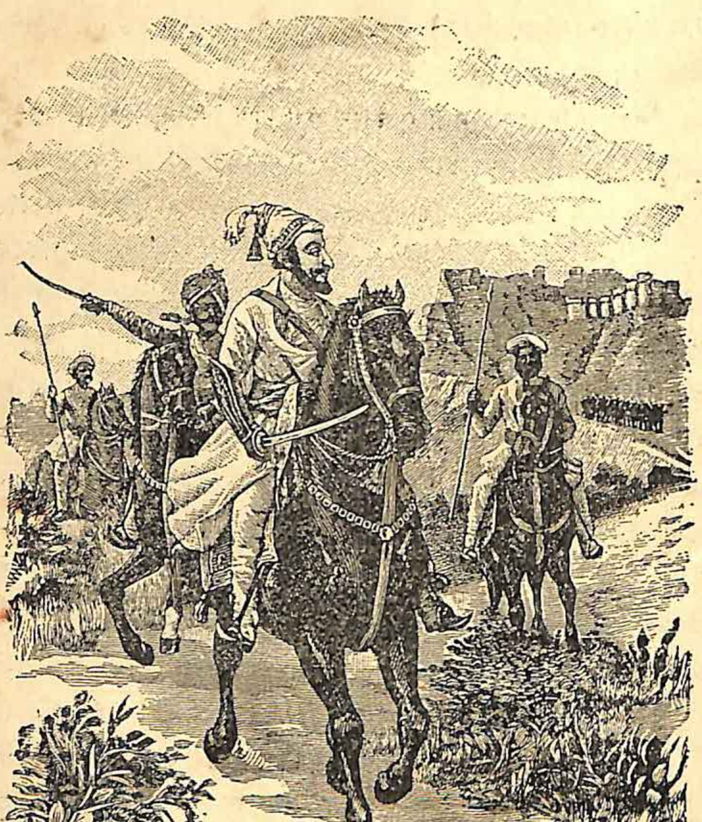

ভারতবর্ষ
(ঔরঙ্গজেবের সময়ে)
কাবুল
পেশোয়ার
কান্দাহার
লাহোর
মুলতান
দিল্লী
আগ্রা
আজমীর
যোধপুর
উদয়পুর
মালব
উজ্জয়িনী
গুজরাট
সিন্ধুদেশ
টাটা
নর্মদা নদী
নাগপুর
বেরার
মহানদী
পাটনা
বিহার
রাজমহল
ঢাকা
কুচ
বাংলা
(ফরাসি) চন্দননগর
শ্রীরামপুর
(দিনেমার)
কলিকাতা (বৃটিশ)
উড়িষ্যা
বিশাখপট্টম
গোলকুণ্ডা
হায়দরাবাদ
বিজাপুর
কৃষ্ণা নদী
চন্দ্রগিরি
মাদ্রাজ (বৃটিশ)
পণ্ডিচেরি (ফরাসি)
কালিকট
মহীশূর
কাবেরী
মদুরা
(ওলন্দাজ) কোচিন
(বৃটিশ) বোম্বাই
(পর্তুগীজ) গোয়া
ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য সীমা ১৭০০
ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য সীমা ১৬৮০

আসিবার দুই বৎসর পূর্ব্বে মরাঠা-বীর শিবাজীর মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু সম্রাট্ যখন দক্ষিণ ভারতে উপনীত হইলেন তখন মরাঠারাই তথাকার প্রবলতম শক্তি।

শিবাজী শিবনের নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মতে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, তিনি ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজামশাহী বংশের পতনের প্রাক্কালে শিবাজীর পিতা শাহাজী আহম্মদনগরের রাজদরবারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। শাহজাহান কর্তৃক আহম্মদনগর বিজয়ের পর শাহাজী বিজাপুরের সরকারে চাকুরী পাইয়া কর্ণাটকে চলিয়া যান। তাঁহার প্রথমা পত্নী ও শিশুপুত্র শিবাজীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দাদাজী কোণ্ডদেব নামক একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। শিবাজী বাল্যকাল হইতেই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। মাতার মুখে হিন্দুদিগের পূর্ব্ব গৌরবের কাহিনী শুনিয়া তাঁহার মনে পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। তরুণ বয়সেই তিনি কয়েকজন সাহসী সহচর লইয়া একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজী ইহাদের সাহায্যে তোরণা দুর্গ দখল করেন। বৃদ্ধ দাদাজী শিবাজীর উচ্চ সঙ্কল্পের সমর্থন করেন নাই। কিন্তু দাদাজীর মৃত্যুর পর আর শিবাজীকে বাধা দিবার কেহ রহিল না। তখন তিনি নূতন উদ্যমে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শক্তি সঞ্চয়ে উদ্যোগী হইলেন। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে কোন রাজনৈতিক অপরাধে শাহাজী বিজাপুরের সুলতানের আদেশে বন্দী হন। তখন বাধ্য হইয়া শিবাজী কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলেন। শাহাজী কারামুক্ত হওয়ার পরই শিবাজী আবার রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। জাউলী নামক

শিবাজীর বাল্য জীবন

তোরণা দুর্গ অধিকার



শিবাজী

জাউলী জয় স্থানের সামন্ত রাজাকে হত্যা করিয়া শিবাজী আপনার রাজ্য বিস্তার করিলেন। তাঁহার উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া

বিজাপুরের কর্তৃপক্ষ আফজল খাঁ নামক একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে একটি প্রবল বাহিনীসহ শিবাজীকে দমন করিবার জন্য পাঠাইলেন। শিবাজী সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রতাপগড়ের দুর্গম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অবশেষে আফজল প্রকাশ্যে সন্ধির প্রস্তাব জানাইলেন। আফজল সন্ধির শর্ত্ত আলোচনার জন্য মাত্র দুইজন অনুচর লইয়া শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মরাঠা লেখকগণ বলেন যে বলিষ্ঠ মুসলমান সেনাপতি খর্ব্বাকৃতি শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার সময় সহসা তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিয়া ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজী পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ আচরণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাই তিনি বস্ত্রাভ্যন্তরে একখানি ছোরা (বিচুয়া) লুকাইয়া হস্তে লৌহ-নির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ বাঘনখ পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন।

আফজলের মৃত্যু

সেনাপতি আফজল শিবাজীর হস্তে নিহত হইলেন, তাঁহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত এবং শিবির লুণ্ঠিত হইল।

ইহাতে কিন্তু শিবাজীর বিপদের শেষ হয় নাই। বিজাপুরের সৈন্যদল তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পাহ্নালা দুর্গে অবরোধ করিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মরাঠা-বীর অতিকষ্টে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। এই সময়েই

শায়েস্তা খাঁ

দক্ষিণাপথের নূতন শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁ পুনা অধিকার করিয়া চাকন আক্রমণ করিলেন এবং কল্যাণ জিলা হইতে মরাঠাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে একদা

নৈশ আক্রমণ

রাত্রিকালে শিবাজী সামান্য কয়েকজন অনুচরসহ শায়েস্তা খাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র ও প্রায় চল্লিশজন ভৃত্যকে নিহত করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া গেলেন। শায়েস্তা খাঁ প্রাণে বাঁচিলেন বটে, কিন্তু শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাঁহার একটি

অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। এই দুঃসাহসিক অভিযানে শিবাজীর সাহসের খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পাইল। শায়েস্তা খাঁ ভীত হইয়া পুণা হইতে পলায়ন করিলেন। ইহার পর বৎসরই শিবাজী সুযোগ বুঝিয়া সুরাট লুণ্ঠন করিয়া বহু ধন-সম্পত্তি লইয়া আসিলেন। বার বার এইরূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সম্রাটের মান-সম্ভ্রম নষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে মরাঠাদিগকে দমনের জন্য ঔরঙ্গজীব অম্বর-রাজ জয়সিংহকে প্রেরণ করিলেন। সামরিক নৈপুণ্যে ও রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির জন্য তিনি অসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহার সহকারী দিলীর খাঁও একজন যোগ্য সেনাপতি ছিলেন।

সুরাট লুণ্ঠন

জয়সিংহ

পুরন্দরের সন্ধি

জয়সিংহ পুরন্দরদুর্গ অধিকার করিলে শিবাজী সন্ধি প্রার্থনা করেন, বারটি দুর্গ ব্যতীত সকল জায়গা ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে তাঁহাকে সন্ধি করিতে হইল। ইহার পর জয়সিংহ শিবাজীর সহযোগিতায় বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। দক্ষিণা-পথে বহু বাদশাহী সেনানায়কের খ্যাতি নষ্ট হইয়াছিল, বিজাপুরের যুদ্ধে জয়সিংহের সম্মান রক্ষা হইল না। তাঁহার অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল। জয়সিংহ দেখিলেন, শিবাজী দক্ষিণাপথে থাকিলে তাঁহার বিপদ বাড়িতে পারে, তাই কৌশলে তিনি তাঁহাকে আগ্রা যাইতে সম্মত করিলেন।

শিবাজীর আগ্রা যাত্রা

আগ্রায় পৌছিলে শিবাজী তাঁহার অভ্যর্থনার নমুনা দেখিয়া নিরাশ হইলেন। সেখানে ঠিক কি হইয়াছিল বলা যায় না। কিন্তু বাদশাহের দরবারে উপযুক্তরূপ শিষ্টাচার পালন না করার ফলেই তিনি যে সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে প্রহরী বসান হইল। শিবাজী ইহাতেও হতাশ হইলেন না। প্রথমে তিনি অসুখের ভান

করিয়া পড়িয়া রহিলেন, পরে আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন বলিয়া আগ্রার আমীর ওমরাহদের ঝুড়ি ঝুড়ি মিঠাই ও ফল উপহার পাঠাইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম প্রহরীরা ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিত, তারপর যখন আর তাহাদের সন্দেহ রহিল না তখন দুইটি শূন্য ঝুড়ির মধ্যে বসিয়া শিবাজী ও তাঁহার শিশুপুত্র আগ্রা হইতে পলায়ন করিলেন এবং ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে নিরাপদে আসিয়া নিজ রাজ্যে পৌছিলেন।

আগ্রা হইতে পলায়ন

দেশে পৌছিয়া শিবাজী সম্রাটের প্রতিনিধির সহিত সন্ধি করিলেন এবং শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং শিবাজী হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করিলেন (১৬৭০ খৃঃ)। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি সুরাটের চৌথ দাবী করেন এবং দুই বৎসর পরে রায়গড়ে মহাসমারোহে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় (১৬৭৪ খৃঃ)। এতদুপলক্ষে তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

সাময়িক সন্ধি

দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক

ওদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করিল। সম্রাট্ বিব্রত হইয়া নিজেই এই অশান্তি দমনে ব্রতী হইলেন এবং দক্ষিণাপথ হইতে বহু সৈন্য সীমান্তে প্রেরিত হইল। শিবাজীও সুযোগ বুঝিয়া গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া কর্ণাটক আক্রমণ করিলেন। জিঞ্জি (১৬৭৭ খৃঃ), ভেলোর (১৬৭৮ খৃঃ) ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ তাঁহার করতলগত হইল। কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরেই মরাঠা-বীরের মৃত্যু হয় (১৬৮০ খৃঃ)। উত্তরে সুরাটের নিকটবর্তী ধরমপুর

গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতা ও কর্ণাট অভিযান

শিবাজীর মৃত্যু

হইতে পর্ত্তুগীজ অধিকৃত দমন, সালসেটি, বেসিন, চৌল ও গোয়া ব্যতীত দক্ষিণে কারোয়ার পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূল শিবাজীর অধিকারে আসিয়াছিল। পূর্ব্বে বাগলানা হইতে কোলহাপুর পর্য্যন্ত অনেক স্থান শিবাজীর রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। এতদ্ব্যতীত কর্ণাটকের কিয়দংশ, বর্ত্তমান মহিষূরের একটি প্রধান অংশ এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কতকগুলি স্থান শিবাজীর দখলে আসিয়াছিল।

রাজ্য সীমা

শিবাজীর চরিত্র ঃ—যাঁহাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও শাসন-কীর্ত্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সমুজ্জল হইয়া আছে, শিবাজী তাঁহাদের অন্যতম। পদে পদে প্রতিকূলতা ও বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইয়াছিল। এই মরাঠা-বীর যখন দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তৈমুরবংশীয়দের রাজক্ষমতা তখন গৌরবের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। তথাপি অসীম শক্তিশালী সম্রাটের সহিত সংগ্রামে এই নগণ্য জাগীরদার-পুত্রেরই জয় হইয়াছিল। নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি একটি জাতি গঠন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে মরাঠারাই ছিলেন ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান শক্তি এবং ঔরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারিগণ মরাঠা সেনাপতির ক্রীড়া পুত্তলিতে পরিণত হইয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে যে অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা একদিন তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, আজ সমগ্র ভারতবাসীর মনে তাহাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেকালের অভিজাতশ্রেণীর অভ্যস্ত চরিত্রদোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। পরম শত্রুও এই বিষয়ে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারে নাই।

মহানুভবতা

নবজাতি সংগঠন

সাম্রাজ্য স্থাপন

খাঁফি খাঁ তাঁহাকে 'নরকের কুক্কুর' বলিয়া অভিহিত করিতেন, কিন্তু তিনিও তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শিবাজী তাঁহার প্রজাপুঞ্জের সম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন……মুসলমান নারী ও বালক-বালিকা তাঁহার হাতে পড়িলে তিনি সযত্নে তাঁহাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন। নিজে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু হইয়াও তিনি কখনও পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ অথবা অনুদারতা প্রদর্শন করেন নাই। শেখ মহম্মদ নামে একজন মুসলমান সাধুকে তিনি অতিশয় ভক্তি করিতেন। মুসলমানদিগের ধর্ম্মস্থানে প্রদীপ দিবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি নিষ্কর জমি দান করিতেন। লুণ্ঠনের সময় মস্‌জিদ, ধর্ম্মগ্রন্থ অথবা কোনও নারীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল। "পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহার কোন মুসলমান অনুচরকে উহা দান করিতেন।" প্রথমবার স্থরাট লুণ্ঠনের সময় তিনি এই সমৃদ্ধ নগরীর ধনরত্ন কাড়িয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু কাপুসিন্ (খৃষ্টান) ধর্ম্ম-যাজকদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। দরিদ্র ও উৎপীড়িতের বন্ধু শিবাজীকে সকলেই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত। অনেকে তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া পূজা করিতেন। অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণের নিকট তিনি ধর্ম্মবীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

নীতিবোধ

খাঁফি খাঁর প্রশংসা

মুসলমানদের প্রতি উদারতা

হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষক

শাসন :—মুসলমান সম্রাট্‌গণের ন্যায় শিবাজীও স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন তাহাই করিতে পারিতেন। আটজন 'প্রধান' বা মন্ত্রীর সাহায্যে তিনি রাজ্য শাসন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে ছয়জন শাসন ও সমর উভয় প্রকার

স্বেচ্ছাচারিতা

অষ্টপ্রধান মন্ত্রী সভা

কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনজন মন্ত্রীকে আবার এতদুপরি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিতে হইত। শাসনতন্ত্রের ত্রিশটি বিভাগ তত্ত্বাবধানের ভারও মন্ত্রীদের উপর অর্পিত হইয়াছিল। সমগ্র রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ আটজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহযোগিতায় আপনাদের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের কার্য্যকালের পরিমাণ রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত। কর্ণাটকের শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা অন্যান্য কর্ম্মচারী অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল।

প্রাদেশিক শাসন

সৈন্য ঃ—বাল্যকাল হইতে শিবাজী সমর-কৌশলে সুনিপুণ ছিলেন। জাগীর প্রথা তুলিয়া দিয়া তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদলে পদমর্য্যাদা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিলেও সামরিক বিভাগের ভার একজন প্রধান সেনাপতির হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ইনি মন্ত্রি-পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। রাজ্যরক্ষার জন্য শিবাজী স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা নিবারণের জন্য দুর্গের শাসনভার সমশ্রেণীর তিনজন কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। সৈন্যদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিবাজী শিবিরে বা সেনানিবাসে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য সরকারী সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, সিপাহীদিগের তাহাতে কোনও অধিকার ছিল না। পার্ব্বত্য মাওয়ালীদিগকে লইয়া অজেয় সেনাবাহিনী গঠন করা কম কৃতিত্বের কার্য্য নহে। ইহা হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। মরাঠা সেনার বেশির

'জাগীর' প্রথা রদ

সৈন্যদের শ্রেণীবিভাগ

দুর্গ নির্ম্মাণ

শৃঙ্খলা

ভাগই বারগীর। বারগীরেরা সরকার হইতে অস্ত্রশস্ত্র, বাহন ও পরিচ্ছদ পাইত। আর শিলাদারেরা নিজেরাই অস্ত্র, বাহন ও পোষাক লইয়া আসিত। কোন কোন শিলাদার আবার কতকগুলি অনুচর সহ সেনাদলে যোগদান করিত। এজন্য তাহারা সরকার হইতে প্রয়োজনমত টাকা পাইত। কিন্তু শিবাজী শিলাদার শ্রেণীর সৈন্য যতদূর সম্ভব কমাইতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল, তাই নৌবহর নির্ম্মাণেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। শিবাজী যে বিশাল নৌবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, তাহা জলপথে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে না পারিলেও ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে কয়েকবার জয়লাভ করিয়াছে।

বারগীর

শিলাদার

শিবাজীর নৌবহর

রাজস্ব নীতি ঃ—রাজস্ব আদায়ের এবং শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য শিবাজী তাঁহার রাজ্য কতকগুলি 'প্রান্ত' বা প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রান্ত কতকগুলি পরগণা ও তরফে বিভক্ত হইত এবং গ্রাম ছিল রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ। বিশেষ যত্ন সহকারে তদন্ত করিয়া রাজস্বের হার নির্দ্দিষ্ট হইত। উৎপন্ন দ্রব্যের $\frac{২}{৫}$ অংশ রাজকর রূপে গৃহীত হইত। কৃষকগণ স্ব স্ব সুবিধা অনুসারে শস্য অথবা অর্থ দ্বারা রাজস্ব দিতে পারিত। কিন্তু মহারাষ্ট্রের মত অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিক রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং অর্থাগমের জন্য তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বিজাপুরের সুলতান কিম্বা বাদশাহের কর্ম্মচারীরা মরাঠা অশ্বারোহীদিগের উৎপাত হইতে প্রজা-সাধারণের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিতেন না। সুতরাং পার্শ্ববর্ত্তী জনপদের অধিবাসীরা অনেক সময় প্রাণের দায়ে মরাঠাদিগকে প্রচুর

কর নির্দ্ধারণ

অর্থ দিয়া বিদায় করিত। শিবাজীও চৌথ এবং সরদেশমুখী পাইলেই নিরীহ লোকদিগের প্রতি আর উপদ্রব করিতেন না। চৌথ শব্দের অর্থ এক-চতুর্থাংশ। শিবাজী সরদেশমুখী হিসাবে রাজস্বের দশমাংশ দাবি করিতেন। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিয়া মরাঠাগণ তাঁহাদের রাজ্যসীমার বহিঃস্থিত দেশ সমূহেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

চৌথ ও সরদেশমুখী

দক্ষিণ ভারতে ঔরঙ্গজীবঃ—১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীব ঔরঙ্গাবাদে পৌছেন। মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ের সঙ্কল্প করিলেন। মরাঠা শক্তির অভ্যুত্থানে বিজাপুর অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, তদুপরি রাজকর্ম্মচারিগণের আত্ম-কলহে এই রাজ্যটি আরও শক্তিহীন হইল। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীবের সৈন্যদল বিজাপুর অবরোধ করিল কিন্তু ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা অধিকৃত হয় নাই। পর বৎসর গোলকুণ্ডার কুতবশাহী রাজত্বও লোপ পাইল। ঔরঙ্গজীব এই রাজ্যটি অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, দক্ষিণে তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিলেন। যদিও এইরূপে একে একে পুরাতন রাজ্যগুলি ঔরঙ্গজীবের হস্তগত হইল, তথাপি নবীন মরাঠা শক্তি সম্রাটের নিকট পরাজয় মানিল না।

বিজাপুরের পতন

গোলকুণ্ডার পতন

সাম্ভাজী ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণঃ—শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী মরাঠা সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্ভাজী দুশ্চরিত্র হইলেও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ঔরঙ্গজীবের বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে

সাম্ভাজীর চরিত্র

তিনি সাহসের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাদশাহের একজন কর্ম্মচারীর হাতে বন্দী হইলেন এবং সম্রাটের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল।

সাম্ভাজীর মৃত্যু

ইহার পর বাদশাহের সেনাদল মরাঠা রাজধানী রায়গড় দখল করিয়া সাম্ভাজীর শিশুপুত্র শাহুকে বন্দী করেন। ঔরঙ্গজীব শাহুকে তাঁহার নিজ অন্তঃপুরে রাখিয়া পালন করিতে লাগিলেন। শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম মহারাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া কর্ণাটকের জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মরাঠাগণ তাঁহাকেই রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন। ১৬৯০ হইতে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর অবরোধের পর জুলফিকর খাঁ এই দুর্গটি অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রাজারাম নিরাপদে মহারাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজীব দুর্গের পর দুর্গ জয় করিয়া চলিলেন, তথাপি মরাঠাগণ পরাভূত হইল না, অথবা তাহাদের রাজ্যও অধিকৃত হইল না; মহানুভব শিবাজী এই মরাঠা জাতিকে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাহারা তখনও বিস্মৃত হয় নাই। ঔরঙ্গজীব শীঘ্রই বুঝিলেন এত বড় একটা জাতিকে বাহুবলে বশীভূত করিবার চেষ্টা বৃথা। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাই অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত তাঁহার নাবালক পুত্র শিবাজীর (৩য়) নামে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্রাটের সৈন্যদলকে অতিষ্ঠ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহও তাঁহাদের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইল। রাজারামের সময়েই একবার মালব রাজ্য আক্রান্ত

শাহু ও রাজারাম

জিঞ্জি দুর্গের পতন

রাজারামের মৃত্যু
তারাবাই

হইয়াছে (১৬৯৯ খৃঃ)। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে একদল মরাঠা সৈন্য বেরার আক্রমণ করিল, ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণের পরে বরোদা লুণ্ঠিত হয়। বার বার পরাজয়ের এই গ্লানি বহন করিয়া ঔরঙ্গজীবের দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগরে তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজ্যজয়ের সঙ্কল্প লইয়া তিনি দক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেইখানেই তাঁহার চিরসমাধি রচিত হইল। তাঁহার সঙ্গে তৈমুরবংশের সাম্রাজ্যগৌরবও বিলুপ্ত হইল।

মরাঠাদের মালব প্রবেশ, বেরার ও গুজরাট আক্রমণ

ঔরঙ্গজীবের চরিত্র ও শাসন :—ঔরঙ্গজীব যেরূপ হৃদয়হীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সত্য সত্যই তিনি তত নির্ম্মম ছিলেন না। দিল্লীর বাদশাহজাদারা ইচ্ছা করিলেও রাজনৈতিক কলহ এড়াইতে পারিতেন না। তাঁহাদের ভাগ্যে হয় সিংহাসন, না হয় মৃত্যু। তাই আত্মরক্ষার জন্যই তাঁহাদিগকে সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিতে হইত। ঔরঙ্গজীব তাঁহার ভ্রাতাগণকে হত্যা না করিলে, হয়তো তাঁহারাই তাঁহাকে একদিন হত্যা করিতেন। তাঁহার পিতা শাহজাহান প্রায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকেই বধ করিয়াছিলেন কিন্তু ঔরঙ্গজীব তাঁহার সকল ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করেন নাই। তৈমুরবংশীয় সম্রাট্গণের মধ্যে পিতৃদ্রোহিতাও নূতন নয়। এবিষয়ে ঔরঙ্গজীব পিতা ও পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। প্রভেদ এই, ঔরঙ্গজীবের মত তাঁহাদের পিতৃদ্রোহ সফল হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমান রাজ-পরিবারে পিতৃহত্যার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিন্তু ঔরঙ্গজীব পিতৃহত্যা করেন নাই।

ঔরঙ্গজীবের প্রতি অবিচার

পিতৃপিতামহের দৃষ্টান্ত

ঔরঙ্গজীব মুসলমান ধর্ম্মের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন

করিতেন। স্বধর্ম্মানুরাগই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। মধ্য এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়াও তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া উপাসনা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। যুদ্ধের কোলাহল ও মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু রাজা হিসাবে তিনি তত খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহাকেও কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। সমস্ত কাজ তিনি নিজেই করিতে চাহিতেন। অসাধারণ শ্রমশীলতা সত্ত্বেও কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে একটা বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নহে। তথাপি তিনি অপরের প্রতি নির্ভর করিতে পারিতেন না। এই অপরিণামদর্শিতার ফলে শাসন পদ্ধতির অবনতি হইতে লাগিল। রাজকার্য্যের শৈথিল্যের জন্য অকর্ম্মণ্য ওমরাহদিগকে তিনি কঠোর দণ্ড দিতে ইতস্ততঃ করিতেন। তাহাতে প্রত্যেক বিভাগেই বিশৃঙ্খলা ও শৈথিল্য বাড়িয়া চলিল। খাঁফি খাঁ ঔরঙ্গজীব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কেবল তৈমুরবংশীয়দের মধ্যে নহে, দিল্লীর সমুদয় রাজগণের মধ্যে সিকন্দর লোদীর পর আর কেহ ঔরঙ্গজীবের তুল্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, মিতাচার ও ন্যায়ানুরাগের জন্য খ্যাতিলাভ করেন নাই। তাঁহার সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ন্যায়পরায়ণতা অতুলনীয়। কিন্তু কোরানের নির্দ্দেশের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবশে তিনি কাহাকেও দণ্ড দিতে পারিতেন না এবং দণ্ড ব্যতীত সুশাসন অসম্ভব। ওমরাহগণের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বিরোধ আরম্ভ হইল। সুতরাং সম্রাট্ যাহা কিছু সঙ্কল্প করিতেন, তাহার প্রায় সকলই নিষ্ফল হইত। যে

উৎসাহী মুসলমান

ব্যর্থ শাসক

শাসনকার্য্যে অপরিণামদর্শিতা

ঔরঙ্গজীব সম্বন্ধে খাঁফি খাঁ

উদ্দেশ্যে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও তাহা সফল হইত না।" কোন কোন বিষয়ে ঔরঙ্গজীবের মহত্ত্ব অসাধারণ হইলেও সম্রাট্ হিসাবে তাঁহার বিশেষ কোনও কৃতিত্ব নাই। সাহসী যোদ্ধা হইয়াও তিনি নিপুণ রাষ্ট্রপতির খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। রাজনৈতিক চাতুর্য্যের অভাব না থাকিলেও সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই।

সাহিত্য ও শিল্পে বীতস্পৃহা

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণের ন্যায় ঔরঙ্গজীব শিল্প ও সাহিত্যের সমাদর করেন নাই। নিজে ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে শুধু ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি নিজের জন্য ব্যয়সাধ্য সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন নাই। মৃত্যুর পরে যাহাতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোনও প্রকার অযথা খরচ না হয়, সে জন্য পূর্ব্বেই তিনি সকলকে সাবধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজসভায় ইতিহাস রচনা ও সঙ্গীত আলাপ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

যাঁহারা তাঁহার শাসননীতি সমর্থন করিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার শ্রমশীলতার ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতেন। ব্যর্থতায় বিচলিত না হইয়া, পুত্রদের সাহায্য না পাইয়াও সম্রাট্ একাকী অকুণ্ঠ-নিষ্ঠা ও অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সহিত আপন পথে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার এই দৃঢ়তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

শেষ জীবন

ঔরঙ্গজীবের শেষ জীবন বড়ই অশান্তিময়। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ তাঁহার শাসনের প্রথম ভাগেই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, শাহজাদা আকবরও পিতার অবাধ্য হইয়াছিলেন। শাহ আলম এবং কামবক্সের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজীব সর্ব্বদা রাজদ্রোহের সন্দেহ পোষণ করিতেন। তাঁহার শেষ জীবনের পত্রগুলি বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনের চিত্র তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল; সুদীর্ঘ সমরের কঠোর শ্রমে অবসন্ন, দুশ্চিন্তায় দীর্ণ চিত্ত তাঁহার জীবনের ভার দুর্ব্বহ বোধ হইয়াছিল। অবশেষে একদিন প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় পাপের অনুতাপ বক্ষে বহিয়া স্রষ্টার অসীম অনুগ্রহে দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

তৈমুরবংশীয় রাজশক্তির পতন

শাহ আলম বাহাদুর শাহঃ—ঔরঙ্গজীব সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরেই সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে আত্মকলহ আরম্ভ হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম বাহাদুর শাহ কাবুল হইতে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ওদিকে সিংহাসনের লোভে আজম শাহ রাজধানীর দিকে ধাবিত হইলেন। আগ্রার অনতিদূরে জাজউ ক্ষেত্রে আজম পরাজিত ও নিহত হইলেন (জুন, ১৭০৭ খৃঃ)। তারপর নূতন সম্রাট্ দক্ষিণাপথে অগ্রসর হইলেন। হায়দরাবাদের নিকটে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে কামবক্সের পরাজয় ও মৃত্যু হইল।

উত্তরাধিকার-বিরোধ

জাজউর যুদ্ধ

কামবক্সের মৃত্যু

রাজপুত সন্ধিঃ—ইহার মধ্যে মেবার (উদয়পুর), মারবার (যোধপুর) ও অম্বরের (জয়পুর) রাজপুত রাজগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাহাদুর শাহের সেনাপতিদিগকে কয়েক স্থানে পরাজিত করেন। কিন্তু সম্রাটের যুদ্ধের অভিপ্রায় ছিল না, তাই রাজপুতদের সহিত সন্ধি করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে শান্ত করেন। এই সময় শিখ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

রাজপুত মৈত্রী

শিখঃ—শিখ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নানক ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নানকের পিতা একজন ক্ষত্রী-বংশীয় হিসাবনবীশ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অধিকাংশ সময় ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সুতরাং পৈতৃক ব্যবসায় অথবা সাংসারিক কোনও কার্য্যেই তাঁহার মন বসিত না। নানক স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় ছিলেন, এবং সকল ধর্ম্মের সার সত্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন দুই পুত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার শিষ্য অঙ্গদকে গুরুর পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। গুরু রামদাসের সময়ে অমৃতসরের সরোবর সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সুবিখ্যাত সুবর্ণ মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরব্ধ হয়। রামদাসের পুত্র অর্জ্জুনমল এই সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু। তিনি শিখগণের আদি গ্রন্থ বা গ্রন্থ সাহেব সঙ্কলন করিয়াছিলেন। গুরু অর্জ্জুনের প্রভূত সম্পদ্ ও প্রতিপত্তি দেখিয়া বাদশাহের সন্দেহের উদ্রেক হইল। জাহাঙ্গীরের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শিষ্যদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ করিয়া তুলেন। নবম গুরু তেগ্‌বাহাদুর

অঙ্গদ, রামদাস

আদি গ্রন্থ

হরগোবিন্দ

তেগ্‌বাহাদুর

কিরূপ বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ

তাঁহার পুত্র শিখগণের দশম এবং শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে পাটনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ একাধিক কারণে স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি কেবল ধর্ম্মগুরু ছিলেন না, সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে তিনি একটি সামরিক জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। তৎসংগঠিত সামরিক সঙ্ঘ খাল্‌সা নামে পরিচিত। যেরূপ ভাবে

খাল্‌সা

তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে এই সম্প্রদায়ের সকলেই সৈন্য সংগঠনের প্রয়োজন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন। শিখগণের অনেকেই যুদ্ধপ্রিয় জাঠ বংশজাত। গুরুর নেতৃত্বে তাহারা শীঘ্রই একটি দুর্দ্ধর্ষ জাতিতে পরিণত হইল। গুরু গোবিন্দ পঞ্চ ‘ক’কারের ব্যবহার প্রচলন করিয়াছিলেন। কেশ (চুল), কচ্ছ (ছোট পায়জামা), করা (লৌহ বলয়), কৃপাণ (ছোরা বা অসি) এবং কাঙ্ঘা (কাঁকুই, চিরুণী) —এই পঞ্চ আভরণ শিখগণ আজিও শ্রদ্ধার সহিত পরিধান করিয়া থাকেন।

গোবিন্দ পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতি ও মুসলমান ফৌজদারগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র সরহিন্দের ফৌজদারের হস্তে নির্ম্মম ভাবে নিহত হয়। বাহাদুর শাহ যখন কাবুল হইতে আগ্রায় ফিরিয়া যান, তখন গোবিন্দ সিংহ তাঁহার সহিত কয়েকজন বিশ্বস্ত শিখ অনুচর পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহারা জাজউর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ইহার পরে শিখগুরু নিজেই

গুরু গোবিন্দের মৃত্যু

সম্রাটের সহিত দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে জনৈক পাঠানের ছুরিকাঘাতে গুরু গোবিন্দের প্রাণবিয়োগ হয়। গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার

কোন পুত্রসন্তান জীবিত ছিল না, সুতরাং তাঁহার পরে শিখগণের আর কোন গুরু রহিল না।

গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পরে বান্দা নামক এক অসম-সাহসী বীর শিখদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বান্দা বহু অনুচর সংগ্রহ করিয়া গুরু গোবিন্দের পুত্রহন্তা সরহিন্দের ফৌজদারের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। স্থানীয় মুসলমানেরা তাঁহার ভয়ে এমন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল যে সম্রাট্ নিজেই যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। লৌহগড় দুর্গে বান্দা অবরুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সম্রাটের সেনাদল এই দুর্গটি অধিকার করিবার পূর্ব্বেই তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

বান্দা

বান্দার পরাজয়

সম্রাট্ বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী :—১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে আবার সিংহাসন লইয়া বিরোধ আরম্ভ হইল এবং জাহান্দার শাহ জুলফিকর খাঁর সাহায্যে পিতৃ সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি যেমন অকর্ম্মণ্য তেমনি দুশ্চরিত্র ছিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে জাহান্দার শাহ পদচ্যুত ও নিহত হইলেন। বাহ্বার সৈয়দেরা ফর্‌রুখ্‌-সিয়রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। তাঁহাদের আদেশে জুলফিকর খাঁকে হত্যা করা হইল।

সিংহাসন লইয়া বিরোধ

জাহান্দার শাহ

ফর্‌রুখ্‌সিয়র ও সৈয়দ ভ্রাতৃগণ :—নূতন সম্রাট্ ফর্‌রুখ্‌সিয়র জাহান্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি নামে বাদশাহ ছিলেন, কিন্তু শাসনের কোন ব্যাপারে তাঁহার হাত ছিল না। সাম্রাজ্যের প্রধানগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইচ্ছামত কলহ, বিবাদ ও ষড়যন্ত্র করিতে

লাগিলেন, সুতরাং সাম্রাজ্যের স্বার্থ পদে পদে নষ্ট হইতে লাগিল। এই

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

সময় সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণ তিনটি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত ছিলেন। জুলফিকর খাঁ ইরাণী দলের নেতা ছিলেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া হিন্দুস্থানী দলের

বাহ্রার সৈয়দগণ

নায়ক বাহ্রার সৈয়দেরা বাদশাহের দরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁহাদের প্রতিযোগী ছিলেন তুরাণী দলের নেতা চিনকিলিচ খাঁ নিজাম-উল-মুল্‌ক।

ফরুক্‌শিয়র সৈয়দ আবদুল্লা

ফরুক্‌থ্‌সিয়র দুর্ব্বল, ধূর্ত্ত, অবিশ্বাসী ও অব্যবস্থিতচিত্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার ছয় বৎসরব্যাপী রাজত্ব-কালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের শান্তি ছিল না। প্রথম হইতেই বাদশাহ ও তাঁহার বন্ধুগণ মন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। শেষে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে

ফরুক্‌থ্‌সিয়রের মৃত্যু

সিংহাসনচ্যুত করিলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ফরুক্‌থ্‌সিয়রকে হত্যা করা হয়।

রাজপুত, শিখ ও জাঠ:—এই সময়ে সাম্রাজ্যের নানাপ্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে যখন সিংহাসন হইয়া

যোধপুর অভিযান রাজার আনুগত্য

বিরোধ আরম্ভ হয়, সেই সুযোগে যোধপুরের অজিতসিংহ বাদশাহের রাজ্য আক্রমণ করেন। সৈয়দ হুসেন আলি তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে রাজা বিনা যুদ্ধেই সন্ধির প্রস্তাব করেন। তিনি যথারীতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া সম্রাটের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন।

বান্দার দৌরাত্ম্য

শিখ-নেতা বান্দা এতদিন লুকাইয়াছিলেন, তিনিও এই সময় আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ও তাঁহার অনুচরবর্গ বাদশাহী সেনার হস্তে বন্দী হইলেন। দিল্লীতে তাহাদের প্রায় সকলকেই নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছিল।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে চুরামনের নেতৃত্বে জাঠগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। সম্রাটের সৈন্যদল তাহাদিগকে দমন করিতে পারিল না। শেষে মন্ত্রী আবদুল্লা খাঁর মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপিত হইলে চুরামন সম্রাট্ দরবারে তাঁহার আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছিলেন।

চুরামন জাঠ

মহম্মদ শাহ ঃ—ফর্রুখ্সিয়রের পদচ্যুতির পরে সৈয়দগণ স্বল্পকালের জন্য রফি-উদ-দরজাৎ ও রফি-উদ-দৌলা নামক দুইজন রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহাদের দুইজনেরই মৃত্যু হয়। ইহার পরে বাদশাহ হইলেন বাহাদুর শাহের পৌত্র রোসান আখ্তার। মহম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়া ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠারো বৎসর। সৈয়দগণ ভাবিয়াছিলেন যে এই যুবক তাঁহাদের একান্ত অনুগত থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের আশা সফল হয় নাই। শীঘ্রই দেখা গেল যে বয়স কম হইলেও বুদ্ধি ও চতুরতায় মহম্মদ শাহ বালক নহেন। সাত বৎসর প্রভুত্বের ফলে সৈয়দগণের অনেক শত্রু হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে নিজাম-উল-মুলুক ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। তিনি বাদশাহের পক্ষে যোগ দিলেন। হুসেন আলি দক্ষিণাপথে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে আততায়ী হস্তে নিহত হইলেন। আবদুল্লা নিজ ইচ্ছামত অপর একজনকে সম্রাট্ করিয়া আপন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে আবদুল্লা পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন এবং ১৭২২ খৃষ্টাব্দে কারাগারে বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে বধ করা হইল।

রফি-উদ-দরজাৎ
রফি-উদ-দৌলা

সৈয়দগণের পতন

সৈয়দগণের পতনে সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার

পরে যিনি উজীর হইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পরে নিজাম-উল-মুলক ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। সৈয়দগণের বিরুদ্ধে বাদশাহকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উজীরের পদ পাইলেন।

নিজাম-উল-মুলক (আসফজা)

দক্ষিণাপথের হায়দরাবাদ রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠাতা মীর কমরউদ্দীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা গাজীউদ্দীন খাঁ ফিরোজ জঙ্গ সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তিনি এদেশে আসেন এবং দক্ষিণাপথে বাদশাহের চাকুরী করিয়া প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার পুত্র কমরউদ্দীনের বয়স যখন মাত্র তেরো বৎসর তখন তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর নায়ক পদে নিয়োগ করা হয়। কর্ম্মদক্ষতার জন্য তিনি অনতিবিলম্বে উচ্চপদে উন্নীত হইলেন এবং সাত বৎসরের মধ্যেই 'চিন-কিলিচ খাঁ' উপাধি লাভ করিলেন। বাহাদুর শাহ তাঁহাকে অযোধ্যার সুবাদার নিয়োগ করেন। জাহান্দার শাহের রাজত্বকালে চিনকিলিচ খাঁকে আগ্রা শহর রক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়, কিন্তু বিদ্রোহী ফর্‌রুখ্‌সিয়রের পক্ষাবলম্বী সৈয়দগণ গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিলেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে খাঁন খাঁনান ও নিজাম-উল-মুলক বাহাদুর ফতেজঙ্গ উপাধি দিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সৈয়দগণের সহিত তাঁহার এই সম্প্রীতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কিছুকাল পরে নিজাম মালবে বদলী হন। মালবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পিতৃ পরিচয়

উপাধিলাভ

সুবাদার পদপ্রাপ্তি

দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা

মালব শাসক নিয়োগ

সৈয়দগণ তাঁহার কার্য্যে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে অন্য স্থানে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। নিজাম এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সৈয়দ দিলওয়ার আলি খাঁ ও আলীম আলি খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজাম কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। তখন সৈয়দ হুসেন আলি নিজেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন। সৈয়দগণের পতনে নিজামকে আর আত্মরক্ষার্থে শক্তিক্ষয় করিতে হইল না। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকেই সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা হয়। বাদশাহী দরবারের অবস্থা দেখিয়া নিজাম সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাপথে ফিরিয়া গিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পারস্যের অধিবাসী সাদৎ খাঁ অযোধ্যায় আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁর শাসনে বঙ্গদেশও কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া উঠিল। গঙ্গার উত্তরে বর্ত্তমান রোহিলখণ্ডে রোহিলা আফ্‌গানগণ বসতি স্থাপন করিলেন। মরাঠাগণও চারিদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর বিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং মরাঠাগণ ভারতের প্রবলতম শক্তি হইয়া উঠিলেন।

মালব ত্যাগে অস্বীকার

উজীর নিয়োগ

স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন

অযোধ্যার সাদৎ খাঁ

বাংলার আলীবর্দ্দী

রোহিলাগণ

তৈমুরবংশীয় সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন

শাহু ঃ—শিবাজীর পৌত্র শাহু ঔরঙ্গজীবের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সম্রাটের মৃত্যুর পরে

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে জুলফিকর খাঁর পরামর্শে আজম শাহ তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। জুলফিকর খাঁ বুঝিয়াছিলেন শাহু পিতৃ-রাজ্যে ফিরিয়া গেলে মরাঠাদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহ-বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। আত্মকলহে ব্যাপৃত থাকিলে তাহারা দক্ষিণাপথে বাদশাহী বাহিনীর অনুপস্থিতিতে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তাঁহার এই ধারণা একেবারে মিথ্যা হয় নাই। শাহু পিতৃরাজ্যে পৌছিলে খুল্লতাত-পত্নী তারাবাইর সহিত তাঁহার বিরোধ হইল। সেই যুদ্ধে শাহুই অবশেষে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কোকঁণের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বালাজী বিশ্বনাথ এই ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন।

শাহুর মুক্তি

আত্মকলহ

বালাজী বিশ্বনাথ ঃ—বালাজী বিশ্বনাথ এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহু তাঁহাকে পেশবা বা প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ (১৭১৪ খৃঃ) করিবার পূর্ব্বেই সামরিক এবং শাসন বিভাগে তিনি তাঁহার অসাধারণ কর্ম্ম-দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রতিনিধির স্থান পেশবার উর্দ্ধে হইলেও বুদ্ধিবলে বালাজীই রাজদরবারে প্রাধান্য লাভ করিলেন। তাঁহার পুত্র বাজীরাও তাঁহারই মত পরাক্রমশালী মন্ত্রী ছিলেন। এই দুই মন্ত্রীর প্রবল প্রতাপে রাজা বা ছত্রপতির ক্ষমতা হ্রাস হইল এবং পেশবারাই ক্রমশঃ মরাঠা সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। বালাজী তাঁহার প্রভু শাহুর নামে সৈয়দ হুসেন আলির নিকট হইতে দক্ষিণাপথের ছয়টি সুবার চৌথ ও সরদেশমুখীর বাদশাহী সনন্দ আনিয়াছিলেন। শাহু তাঁহার পিতামহের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, দিল্লীর

বাল্যজীবন

পেশবার মর্য্যাদাবৃদ্ধি

দাক্ষিণাত্য প্রদেশের চৌথ ও সরদেশমুখী

সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। সুতরাং কাগজপত্রে মরাঠাদিগকে এই প্রকার কর আদায়ের অধিকার দেওয়ায় বাদশাহের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মহারাষ্ট্রের চতুর ব্রাহ্মণ শাসকগণ নামের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। চৌথ ও সরদেশমুখীর জন্য বাদশাহী সনন্দ পাইয়া তাঁহারা রাজ্য বিস্তারের অভাবনীয় সুযোগ লাভ করিলেন।

সর্ব্বময় কর্ত্তা পেশবা

প্রথম বাজীরাওঃ—১৭২০ খৃষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশবাপদে নিযুক্ত হন। বাজীরাও পিতার ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বালাজী তাঁহার পরে পেশবা হইলে এই পদটিতে তাঁহাদের বংশানুক্রমিক দাবি স্বীকৃত হয়। ছত্রপতি শাহু তাঁহার চরম পত্রে পেশবাকেই রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রথম বাজীরাও একজন সাহসী যোদ্ধা ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তৈমুরের বংশধরগণের রাজক্ষমতা তখন বিলুপ্তপ্রায়।

বাজীরাওএর রাজনীতি

বাজীরাও দেখিলেন উত্তরের হিন্দু নরপতি-গণের সাহায্য পাইলে তিনি এক সঙ্গে মরাঠা সাম্রাজ্য বিস্তার এবং দিল্লীর ক্ষমতা ধ্বংস করিতে পারেন। কিন্তু বহু মরাঠা নায়ক এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা বলিলেন দক্ষিণে মরাঠা-শক্তি সংহত করিবার ইহাই যোগ্য অবসর। সুদূর উত্তরের রাজ্যগুলি আক্রমণ করার পরিবর্ত্তে দক্ষিণে মরাঠা-শক্তি বৃদ্ধি করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু বাজীরাওএর উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া ছত্রপতি শাহু তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। হিন্দুদের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তিনি হিন্দু সাম্রাজ্য (হিন্দু পদ পাদসাহী)

স্থাপনের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। মালব বিজয়ে বাজীরাও তথাকার হিন্দু জমিদারগণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। গুজরাটের আধিপত্য লইয়া যখন মুসলমান কর্ম্মচারিগণের মধ্যে আত্মকলহ চলিতেছিল, মরাঠাগণ তখন সুযোগ বুঝিয়া এই সমৃদ্ধ প্রদেশে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপিত করেন। মহারাষ্ট্রের বাহিরে বাজীরাও যে সকল প্রভাবশালী মিত্র লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অম্বরের রাজা জয়সিংহ সওয়াই এবং বুন্দেলা ছত্রসালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের রাজধানীর নিকটে পৌছিয়াও বাজীরাও দিল্লী আক্রমণ করেন নাই। কারণ সম্রাটের মনে আঘাত দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারে সম্রাট্ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, নিজামকে পেশবার গতিরোধ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। নিজাম নিজেও পেশবার শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, সুতরাং সম্রাটের আহ্বানে তিনি আর কালক্ষেপ না করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ভূপালের নিকটে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর যুদ্ধ হইল, কিন্তু বৃদ্ধ নিজাম যুবক বাজীরাওএর হস্তে পরাজিত হইলেন। তখন আর সন্ধি ব্যতীত নিজামের অন্য উপায় রহিল না। এই সন্ধি অনুসারে মালবে মরাঠাদের দাবী স্বীকৃত হইল কিন্তু বাদশাহ বহুদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মরাঠা সৈন্য পর্ত্তুগীজদিগের সালসেট ও বেসিন কাড়িয়া লইল। এই সময় নাদির শাহের ভারত আক্রমণ সংবাদে পেশবা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বাজীরাও তৎক্ষণাৎ

মালব ও গুজরাট

নিজামের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

পর্ত্তুগীজদের সহিত যুদ্ধ

মুসলমান প্রতিবেশীদের সহিত সকল বিরোধ মীমাংসা করিয়া ভারতবর্ষের নবাগত শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাজীরাওএর মৃত্যু

পাঁচটি মরাঠা রাজ্য :—প্রথম বাজীরাও তাঁহার প্রভুর নামে যে সাম্রাজ্য শাসন করিতেন তাহাতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল না। রাজারামের সময় জাগীর প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তনের ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি অর্দ্ধস্বাধীন সামন্ত রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। একই সাম্রাজ্যের মধ্যে এইরূপ বিভিন্ন রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং অবশেষে ইহারই ফলে মরাঠা সাম্রাজ্যের পতন হইল। এই সকল সামন্ত রাজ্যের মধ্যে বেরার অন্যতম। রঘুজী ভোঁস্‌লা এই রাজ্যটি শাসন করিতেন, তিনি বিবাহসূত্রে শাহুর আত্মীয় ছিলেন। রাজারামের শাসন সময়ে এই পরিবারের অভ্যুদয় হয়। সুতরাং পেশবার পূর্ব্বেই বেরারের ভোঁস্‌লাগণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। গুজরাট প্রথমে দাভাড়েবংশীয় সেনাপতিদিগকে দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সেনাপতির পতনের পরে তাঁহার পূর্ব্ব অনুচর গায়কবাড়গণ ক্ষমতাশালী হইয়া বরোদায় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। রণোজী সিন্ধিয়া এবং মলহার রাও হোল্‌কর প্রথম বাজীরাওএর অধীনে কাজ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মালব যখন মরাঠা অধিকারে আসে, তখন এই কর্ম্মচারীদ্বয় তথায় বিস্তৃত জাগীর পাইয়াছিলেন। উত্তরে মরাঠা শক্তির ইঁহারাই ছিলেন প্রধান অবলম্বন। ইঁহাদের বংশধরগণ আজিও গোয়ালিয়র এবং ইন্দোর শাসন করিতেছেন। পবারগণ মালবে একটি

বেরারের ভোঁস্‌লা

বরোদার গায়কবাড়

গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া ও ইন্দোরের হোল্‌কর

ধারের পবারগণ

ক্ষুদ্র জাগীর পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও ধার নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

পেশবাগণের মধ্যে বাজীরাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কেবল সুদক্ষ সেনাপতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন নাই, উচ্চ শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ হিসাবেও তাঁহার প্রতিভা অতুলনীয়। তাঁহার নৈতিক চরিত্র নির্ম্মল না হইলেও সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাকে মরাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর সময় তাঁহার ৪২ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

নাদির শাহের আক্রমণ :—বাজীরাও দিল্লী আক্রমণ করিয়া রাজধানীর মর্য্যাদা নষ্ট করেন নাই বটে, কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণকারীর নিকট বাদশাহের সম্মান অব্যাহত রহিল না। ভারতবর্ষের সম্পদ প্রাচীনকাল হইতে বিদেশীদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তদুপরি আবার রাজশক্তি দুর্ব্বল দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী পরাক্রান্ত রাজাদিগের আক্রমণ-স্পৃহা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তৈমুরের আক্রমণে ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত হইয়াছিল, আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারস্যের বিখ্যাত বীর নাদির কুলি খাঁ হিন্দুস্থান আক্রমণ করিলেন।

তৈমুরের ন্যায় তিনি ধর্ম্মযুদ্ধের ভাণ করেন নাই। দিল্লীর দরবারে তাঁহার দূতগণের অপমান হইয়াছিল বলিয়া তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে গজনী, কাবুল ও লাহোর অধিকৃত হইল, তথাপি অলস সম্রাট্ ও তাঁহার বিলাসী কর্ম্মচারিগণ আত্মরক্ষার আয়োজন করিলেন না। অবশেষে পারস্য সৈন্য যখন দিল্লী হইতে একশত মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন অকস্মাৎ তাঁহাদের চৈতন্য হইল।

কর্ণালের যুদ্ধ

কিন্তু তখন আর নাদির শাহের আক্রমণ রোধ করার সম্ভাবনা ছিল না। কর্ণালের যুদ্ধে সম্রাটের সেনাদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, মহম্মদ শাহ উপায়ান্তর না

দেখিয়া তাড়াতাড়ি সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে দুই জনেই একসঙ্গে দিল্লী প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পরে নাদিরের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া একটি গুজব প্রচারিত হইলে দিল্লীর অধিবাসিবৃন্দ উত্তেজনা বশে পারস্য সম্রাটের কয়েকজন সৈন্যকে নিহত করিল। নাদির শাহ প্রথমে এই উত্তেজনা দমনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গিগণের মৃতদেহ দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধোন্মত্ত পারস্যরাজ তাহার পরে যে ভয়াবহ হত্যানুষ্ঠান করিলেন, ভারতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। প্রভাতে আটটা হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত নরহত্যার পৈশাচিক বীভৎস লীলা চলিতে লাগিল।

দিল্লীতে হত্যা ও লুণ্ঠন

কেহ কেহ বলেন যে এই সময় নাদিরের আদেশে অন্যূন দেড় লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল। বাসগৃহ, হাট-বাজার কিছুই বাকী রহিল না। ঘর জ্বালাইয়া, গৃহসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া নিরীহ নরনারীর শবের স্তূপে দিল্লী মহানগরীকে আর একবার শ্মশানভূমে পরিণত করা হইল। অবশেষে মহম্মদ শাহের বিনীত অনুরোধে এই হত্যা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু শান্তি স্থাপিত হইল না। অর্থের জন্য অসহায় অধিবাসিগণের উপর অকথ্য উৎপীড়ন চলিতে লাগিল, এবং দিল্লীর নাগরিকগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক প্রায় তিন কোটি টাকা আদায় করা হইল। কথিত আছে যে, কয়েক দিনের লুণ্ঠনে প্রায় চারি কোটি টাকা নাদিরের হস্তগত হইয়াছিল। আট সপ্তাহ ধরিয়া সৈন্যগণের উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পৈশাচিক তাণ্ডবে শহরবাসিগণকে ভীত, ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া অতুল ধনসম্পদসহ নাদির শাহ পারস্যে ফিরিয়া গেলেন। মহম্মদ শাহ সম্রাট্ রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মানসম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ্ সবই অন্তর্হিত হইল। সিন্ধুর পরপারের রাজ্যগুলি হস্তচ্যুত হইল, শাহজাহানের ভুবনবিখ্যাত মণি-মানিক্য-



নাদির শাহ

খচিত ময়ূর সিংহাসনখানিও নাদির শাহ লইয়া গেলেন। সম্রাটের পদমর্য্যাদার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিনষ্ট হইল, তৈমুরবংশীয় রাজগণের পতনের কথা বিশ্বের কাহারও নিকটেই আর অবিদিত রহিল না।

আহম্মদ শাহ দুর্‌রাণী:—১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহের ন্যায় আর একজন আক্রমণকারী ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার নাম আহম্মদ শাহ। ইনি আফগানিস্থানের আবদালী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভুর মৃত্যুর পরে শক্তিসঞ্চয় করিয়া তিনি নাদিরের সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন এবং 'দুর্‌-ই-দুর্‌রাণ' বা যুগমণি বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন। তখন হইতেই এই বংশ দুর্‌রাণী নামে পরিচিত হইয়াছিল। প্রথমবার তাঁহার ভারতবর্ষ আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তথাপি ভগ্নোদ্যম না হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এদিকে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পরে রাজপুত্র আহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লীর আহম্মদ বাধ্য হইয়া আফগান আহম্মদকে পঞ্জাবের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে বাদশাহের রাজ্যসীমা আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল-মুল্‌কের পৌত্র গাজিউদ্দীন সম্রাট্‌কে অন্ধ করিয়া পদচ্যুত করেন এবং তাঁহার স্থানে রাজবংশের অন্য একজনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

দিল্লীর আহম্মদ শাহ

নূতন বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের অনুকরণে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি ধারণ করিলেন। গাজিউদ্দীন মরাঠাদের সাহায্যে পঞ্জাব দখল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইহার ফলে আহম্মদ শাহ চতুর্থবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। আবার নররক্তে রাজপথ রঞ্জিত হইল, লুণ্ঠন ও গৃহদাহে দিল্লীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল (১৭৫৬ খৃঃ)। মরাঠাগণ যে

দ্বিতীয় আলমগীর

সকল স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে সকল স্থান হইতে বিতাড়িত হইলেন। অবশেষে দক্ষিণাপথের হিন্দুশক্তির সহিত আফ্গান শক্তির সংঘর্ষ হইল।

বালাজী বাজীরাও :—প্রথম বাজীরাওএর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজী পেশবা হইয়াছিলেন (১৭৪০ খৃঃ)। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে শাহু তাঁহার চরম পত্রে সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব পেশবার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি বালাজী পুণা হইতে সাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন।

পেশবার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা

মরাঠা সাম্রাজ্যের আয়তন এই সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা উত্তরাপথ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করেন। তিনি অনায়াসে পঞ্জাবের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। কিন্তু বিজিত স্থানগুলি রক্ষার সুবন্দোবস্ত না করিয়াই তিনি দক্ষিণাপথে ফিরিয়া গেলেন। সুতরাং ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ যখন পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন মরাঠাদিগকে তাড়াইয়া দিতে তাঁহার কিছুই অসুবিধা হইল না। সিন্ধিয়া ও হোল্করের আফগানশক্তি প্রতিরোধ করার সাধ্য ছিল না। সুতরাং পেশবাকেই দক্ষিণ ভারত হইতে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করিতে হইল। পেশবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসরাও নামে প্রধান সেনাপতি হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সদাশিবরাওই সৈন্য পরিচালনা করিতেন।

রাঘোবার পঞ্জাব অধিকার

আহম্মদ দুর্‌রাণীর পুনরাগমন

সদাশিবরাও

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ :—ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ণয় করিবার জন্য পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে মরাঠা সেনাপতি পাঠান বীরের সম্মুখীন

হইলেন। উত্তর ভারতের মুসলমানগণ একযোগে আহম্মদ শাহের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বালাজীরাও হিন্দু নরপতিগণের সাহায্য পাইলেন না। রাজপুতগণ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়াছিলেন, ছোট বড় সকল মরাঠা নায়ক পেশবার পতাকাতলে সমবেত হইলেও এই সঙ্কটে রঘুজী ভোঁস্‌লা নিরপেক্ষ রহিলেন। সদাশিবরাও প্রথম হইতেই ক্রমাগত ভুল করিতে লাগিলেন। আফ্‌গান সেনাপতিকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া মরাঠা সেনানায়ক নিজেই শত্রুর ফাঁদে পড়িলেন। আফ্‌গান সেনাদল তাঁহার রসদ বন্ধ করিয়া দিল। সদাশিবরাও তথাপি তাঁহার পূর্ব্ব নীতি পরিত্যাগ করিলেন না। অবশেষে সৈন্যদের মধ্যে যখন খাদ্যাভাব ঘটিল, তখন তিনি শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন। এই যুদ্ধে মরাঠা বাহিনী একেবারে বিনষ্ট হইল। মহারাষ্ট্রে এমন পরিবার রহিল না যাহাদের আত্মীয়-বিরহে অশ্রুপাত করিতে হয় নাই। জনৈক ব্যবসায়ীর পত্রে পেশবা মর্ম্মান্তিক সংবাদ পাইলেন, দুটি মুক্তা চূর্ণ হইয়াছে, ২৭ খানি মোহর হারাইয়া গিয়াছে, খুচরা টাকা পয়সা কত যে নষ্ট হইয়াছে তাহা হিসাব করিবার উপায় নাই। দুঃখে, মর্ম্মবেদনায় অভিভূত হইয়া পেশবা পুণায় ফিরিয়া গেলেন, সেখানে ভগ্নহৃদয়ে শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইল।

সদাশিবরাওএর পরাজয়

যুদ্ধ

পেশবার মৃত্যু

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরাঠা শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। পরবর্ত্তী পেশবা শীঘ্রই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হিন্দুস্থানে মরাঠা প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন। পাণিপথের শোচনীয় ঘটনার পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই আবার মহাদাজী সিন্ধিয়া

দিল্লীতে মরাঠা প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। পাণিপথের পরাজয়ে তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার কিছুকালের জন্য বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আহম্মদ শাহ তদ্দ্বারা বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন নাই, পঞ্জাবে শিখগণ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছিল, সুতরাং আহম্মদ এই প্রদেশটিও আপন অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। তথাপি পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নবীন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে বৃটিশ জাতি বাংলায় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার অবকাশ পাইলেন। পাণিপথে মরাঠাদিগের পরাজয়েই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল

তৈমুরবংশীয়দিগের শাসনের শেষ কালঃ—এই সময় হইতেই তৈমুরবংশীয়দিগের শাসনের অবসান হয়। যদিও সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত তৈমুরের বংশধরগণ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের কোনও ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয় আলমগীর নিহত হইলে তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী শাহ আলম গৃহহীন, রাজ্যহীন অবস্থায় পূর্ব্ব দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সাম্রাজ্য পতনের কারণঃ—ঔরঙ্গজীবের শাসনকালে রাজ্যসীমা এত অধিকদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, বিভিন্ন কেন্দ্রে যাতায়াত ও সংবাদ গ্রহণ প্রভৃতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। সম্রাট্ যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দক্ষিণাপথ শাসনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। আবার দাক্ষিণাত্য প্রদেশ রক্ষায় মনোনিবেশ করিলে উত্তর ভারতের শাসন-কার্য্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। তুঘলুক শাহের পুত্র মহম্মদ শাহের সাম্রাজ্যও একদিন এমনি করিয়া অতি বিস্তারের ফলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া

সাম্রাজ্যের অতি বিস্তার

গিয়াছিল, ইহার পরে মরাঠা শক্তিও এইরূপেই খর্ব্ব হইয়াছিল। বাবরের বংশধরদিগের বাদশাহী নষ্ট হইবার ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বাদশাহের ক্ষমতা প্রধানতঃ প্রাদেশিক সুবাদারদিগের সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিত। তখনও ব্যাপকভাবে জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই, সুতরাং সম্রাটের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর সাম্রাজ্যের উন্নতি অথবা অবনতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিত। আকবর এবং তাঁহার পরবর্ত্তী তিনজন বাদশাহ সকলেই সুদক্ষ শাসক ছিলেন। ঐতিহাসিক ডাঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, "চারিজন বাদশাহের মধ্যে জাহাঙ্গীর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইলেও নির্ব্বোধ ছিলেন না। অপর তিনজন অসাধারণ কর্ম্মদক্ষ ছিলেন।" এক পরিবারে চিরদিন প্রতিভাবান ব্যক্তির জন্ম হয় না, তৈমুরের বংশেও এই নিয়মের অন্যথা হয় নাই। ঔরঙ্গজীবের পরে বাহাদুর শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি বৃদ্ধ। তাঁহার পরে যাঁহারা সম্রাট্ হইয়াছিলেন, প্রকৃতির অমোঘ বিধানে তাঁহারা সকলেই দুর্ব্বল, অলস ও অকর্ম্মণ্য। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ঔরঙ্গজীবের সামরিক অভিযানে যে বিপুল অর্থ ও লোকক্ষয় হইয়াছিল, তাহা পূরণ করা সম্ভবপর ছিল না। তদুপরি তাঁহার মৃত্যুর পরে সিংহাসন লইয়া যে আত্মকলহ হইয়াছিল, তাহাতেও সাম্রাজ্যের বিশেষ বলক্ষয় হইয়াছিল। চারিদিকে যখন এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিল তখন নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লীর সম্রাটের এই পরাক্রান্ত আক্রমণকারীকে প্রতিহত করিবার মত সৈন্য অথবা অর্থবল কিছুই ছিল না। তৃতীয়তঃ, মরাঠা-শক্তির অভ্যুত্থানে দিল্লীর ক্ষমতা আরও খর্ব্ব হইয়া পড়িল। হিন্দুশক্তির এই পুনরুত্থানের জন্য একমাত্র ঔরঙ্গজীবকেই দায়ী করা চলে না। কিন্তু পিতাকে

পরবর্ত্তী তৈমুর বংশীয়গণের অক্ষমতা

হিন্দুশক্তির অভ্যুত্থান

সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া তিনি যে অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন তাহাতে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অশুভ সূচিত হইয়াছিল। ঔরঙ্গজীবের ধর্ম্মনীতি ও সঙ্কীর্ণতার ফলে জাঠ, রাজপুত ও শিখগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সুবিবেচনার সহিত কার্য্য করিলে হয়তো শিবাজীর মৃত্যুর পরে নবজাত মরাঠা শক্তি ধ্বংস করা কঠিন হইত না। কিন্তু সম্রাট্ আপোষ আলোচনার ধার ধারিলেন না। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের পক্ষে নবজাগ্রত হিন্দুশক্তি খর্ব্ব করা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং মরাঠা শক্তির অভ্যুত্থানে তৈমুরবংশীয়দের প্রভাব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে দিল্লীর ওমরাহদিগের দলাদলিতে সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সকল দলের লোকেরাই কেবল নিজ নিজ স্বার্থের সন্ধানে থাকিতেন, সাম্রাজ্যের শুভাশুভের ধার ধারিতেন না। জুলফিকর খাঁ, সৈয়দ হুসেন আলি এবং নিজাম-উল্-মুল্কের ন্যায় ব্যক্তিগণ যদি স্বার্থ ভুলিয়া সাম্রাজ্যের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বাদশাহের অক্ষমতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্য রক্ষা অসম্ভব হইত না। কিন্তু একদিকে যেমন রাজনৈতিক সংঘর্ষে কেন্দ্রীয় শক্তি হীনবল হইতে লাগিল, অপর দিকে তেমন প্রাদেশিক সুবাদারগণ একে একে স্বাধীন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ফলে তৈমুরবংশীয় বাদশাহগণের গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হইল।

দলাদলি

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

মোগলযুগে ভারতবর্ষের অবস্থা

স্বেচ্ছাতন্ত্র ঃ—প্রায় দুই শতাব্দী কাল তৈমুরের বংশধরগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিলেন। দিল্লীর পূর্ব্বতন রাজগণের ন্যায় তাঁহারাও অপরিসীম ক্ষমতাপন্ন শাসক ছিলেন। তাঁহারা যাহা খুসী করিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারো কিছু বলিবার অধিকার ছিল না। বিদ্রোহ ব্যতীত অত্যাচার ও কু-শাসনের প্রতিকার সচরাচর সম্ভব হইত না। সম্রাটের সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকগণ কিছুই করিতে পারিতেন না। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহাদের ক্ষমতা অসীম হইলেও অন্য হিসাবে এই সকল সম্রাটের প্রভুত্ব অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যের দূরতম অংশে সম্রাটের আদেশের বিশেষ মূল্য ছিল না। আকবর হইতে জাহান্দার শাহের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্রের প্রকৃত পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু এক বিষয়ে আকবরের প্রবর্ত্তিত নীতি একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। আকবর তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে নগদ বেতন দানের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বাদশাহদিগের আমলে ক্রমে ক্রমে জাগীর প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই অনিষ্টকর প্রথার ফলে একদিকে যেমন জাগীরদারগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত, অন্যদিকে তেমনি কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব হইয়া পড়িত। জাগীর

সাম্রাজ্য শাসনে অপরিসীম ক্ষমতা

সম্রাটের প্রভুত্বের সীমা

জাগীর প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তন

কুফল

প্রথায় প্রজাসাধারণকে জাগীরদারের দয়ায় একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইত, সুতরাং তাহাদের দুঃখ দুর্ভাগ্যও নেহাৎ কম ছিল না।

শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যা :—এই যুগে ধনীর সংখ্যা অল্প হইলেও দেশের অবস্থা অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। যাঁহারা অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃই জাঁক জমক-প্রিয় ছিলেন, এবং তৈমুরবংশীয় সম্রাট্গণের প্রায় সকলেই বহু প্রাসাদ ও সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যদিও বাবর এবং হুমায়ুন নির্ম্মিত প্রায় সকল সৌধই ধ্বংস পাইয়াছে, তথাপি তাঁহারা যে এদেশে স্থাপত্যশিল্পের নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধ্যএশিয়ায় থাকিতে তৈমুরবংশীয়গণ সাধারণতঃ পারস্যের প্রচলিত আদর্শে তাঁহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইতেন। ভারতবর্ষে তাঁহারা যে নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারত ও পারস্যের স্থাপত্যরীতির সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। আকবর ফতেপুর সিক্রীতে অনেকগুলি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফতেপুর সিক্রীর মস্জিদ সম্রাট্ আকবরের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নূরজাহান তাঁহার পিতা ইতিমৎউদ্দৌলার সমাধির উপর একটি অতি সুন্দর মর্ম্মর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শাহজাহানের স্থাপত্য-কীর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে পারস্য স্থাপত্য-শিল্পের গৌরবময় যুগের অবসান হয়। প্রবীণ ঐতিহাসিক ফার্গুসন বলিয়াছেন, কোন কোন বিষয়ে জগতের যে কোনও স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনরাজির সহিত তৈমুরবংশীয় সম্রাট্গণের সৌধগুলির তুলনা করা যায়।

স্থাপত্যশিল্পের নূতন আদর্শ

ফতেপুর সিক্রী

ইতিমৎউদ্দৌলার কবর

চিত্রশিল্প :—হিন্দুগণ চিত্রবিদ্যায় অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া-

ছিলেন। অজন্তা ও বাঘ গুহায় হিন্দু শিল্পীদিগের সাধনার পরিচয় আজিও অমর হইয়া রহিয়াছে। তৈমুরবংশীয় সম্রাট্গণের সময় চিত্রবিদ্যায় একটি মিশ্র-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাতে হিন্দু ও পারস্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর স্বয়ং চিত্রশিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রাজপুত রাজগণেরও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। রাজপুত চিত্র-রীতির একটা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল। বর্ত্তমানে আবার এদেশে ও বিদেশে 'মোগল' ও 'রাজপুত' চিত্রের সমাদর হইতেছে।

মোগল চিত্র পদ্ধতি

রাজপুত চিত্র পদ্ধতি

গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিক ঃ—তৈমুর বংশে বহু সাহিত্যানুরাগীর জন্ম হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাবর তুর্কি ভাষায় পুস্তক লিখিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজ অন্তঃপুরের মহিলাগণেরও সাহিত্য-প্রতিভার অভাব ছিল না। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজীবের কন্যা জেবউন্নিসা যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাও অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। আকবরের সময় যে সকল গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিক যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আকবরের সমসাময়িক এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অধিবাসী কাসিম ফিরিস্তা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, উহা সে সময়ে

বাবর

জাহাঙ্গীর

গুলবদন বেগম

জেবউন্নিসা

ফিরিস্তা

সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। আর একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মহম্মদ হাসিম বা খাঁফি খাঁ। ঔরঙ্গজীবের সময় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

খাঁফি খাঁ

এই যুগে হিন্দু লেখকদের মধ্যে সুজন রায় ক্ষত্রি, ভীমসেন ও ঈশ্বর দাস নাগরের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মরাঠাদের লিখিত ইতিহাসে কতখানি মুসলমান প্রভাব ছিল বলা কঠিন, কিন্তু এই সময়েই মরাঠী ভাষায় কয়েকখানি সুপরিচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

হিন্দু ঐতিহাসিক

দেশীয় সাহিত্যঃ—এই যুগেই প্রাদেশিক সাহিত্য গৌরবের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। ভক্তকবি তুলসীদাসের কাব্য-গাথা হিন্দী সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। আগ্রার অন্ধকবি সুরদাস, কেশবদাস ও ভূষণ হিন্দী সাহিত্যে সুবর্ণযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। বাংলায় কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম প্রভৃতি তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বঙ্গ সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। শিবাজীর সমসাময়িক রামদাস ও তুকারাম মরাঠা সাহিত্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বামন, মহীপতি, ময়ূর পণ্ডিতের যশ ও খ্যাতি মহারাষ্ট্রের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল।

তুলসীদাস, সুরদাস, ভূষণ, কাশীরাম ও অন্যান্য বাঙ্গালী কবি

মরাঠী সাহিত্য

বৈদেশিক বিবরণঃ—আকবরের রাজত্বের পূর্ব্বে সাধারণ লোকের অবস্থা অথবা জীবনযাত্রার কথা বিশেষ কিছু জানা না গেলেও, মাঝে মাঝে এই যুগের রাজসভার বর্ণনা পাওয়া যায়। যে কয়েকজন

ইউরোপীয় পর্য্যটক এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ এ দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পর্য্যটকের মধ্যে ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্‌স্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইংরেজ রাজদূত সার টমাস রো লিখিয়াছেন, রাজার হুকুম অনুসারে রাজ্য শাসন হয় এবং প্রাদেশিক শাসকগণও রাজার প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করেন। সপ্তাহে একদিন সম্রাট্ বিচারে বসেন এবং ধৈর্য্যের সহিত অভিযোগ শ্রবণ করিয়া অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডবিধান করেন। মৃত ব্যক্তির বিত্ত-সম্পত্তি সম্রাটের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাতে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন বটে, কিন্তু রাজ্যের মঙ্গল হয় নাই। সম্রাটের পার্শ্বচরগণ সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান নহেন, তাঁহারা তাঁহার অনুগ্রহভাজন মাত্র।

হকিন্‌স্

জাহাঙ্গীরের ঐশ্বর্য্য

সার টমাস রো

সম্রাট্ ও তাঁহার প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণ

সাম্রাজ্যের সীমা সম্পর্কে সার টমাস রো বলিয়াছেন, "তাঁহার রাজ্য পারস্য অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, এবং তুরুষ্ক অপেক্ষা বড় না হইলেও প্রায় সমান। রাজস্ব ও উপহার এবং মৃত প্রজার ত্যক্ত সম্পত্তির সমবায়ে পারস্য এবং তুরুষ্কের রাজাদিগের অপেক্ষা তাঁহার বেশি আয় হয়।" সাম্রাজ্যের মধ্যে অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজার রাজ্য অবস্থিত ছিল। রো জাহাঙ্গীরকে নম্র, প্রফুল্ল ও নিরহঙ্কারী দেখিয়াছিলেন। দিনের মধ্যে তিনবার তিনি তিন স্থানে দরবারে বসিতেন। দ্বিপ্রহরে একবার হাতী ও অন্যান্য পশুর যুদ্ধ দেখিতেন, চারিটা হইতে পাঁচটা বা ছয়টা

সাম্রাজ্যের সীমা ও রাজস্ব

জাহাঙ্গীর সম্পর্কে রো

পর্য্যন্ত প্রার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতেন। নয়টা হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি প্রধান ব্যক্তিদের সহিত কালযাপন করিতেন। প্রাদেশিক শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ইংরেজ রাজদূতের মতে তাঁহারা ইচ্ছামত প্রজাদের জীবন নাশ করিতেন এবং ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেন। সার টমাস রো সম্রাটের নিকট একবার একজন প্রাদেশিক সুবাদারের অত্যাচারের কথা জানাইয়াছিলেন।

প্রাদেশিক শাসকগণের অত্যাচার

এই সময়ে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ ছিল ওলন্দাজ ব্যবসায়ী ফ্রান্সিস্কো পেলসির্ট তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তিনিও এদেশের অতুল সম্পদ্ ও শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ ও রাজস্ব আদায়কারিগণের অত্যাচারে কৃষির বিশেষ উন্নতি হইত না। বাংলার রেশম ও বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং গুজরাটে অনেকগুলি ব্যবসায়-কেন্দ্র ছিল। শিল্পী ও শ্রমিকেরা কাজের অনুপাতে কম বেতন পাইত। সুতরাং অর্থের অভাবে অধিকাংশ সময়েই তাহাদিগকে কষ্টে কাটাইতে হইত। পেলসির্ট বলিয়াছেন, "শ্রমিকদিগকে দুই প্রকারে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। প্রথমতঃ বেতনের অল্পতা, দ্বিতীয়তঃ প্রাদেশিক শাসক, অমাত্য, দেওয়ান, কোতোয়াল, বক্সী ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার"। কৃষক ও শিল্পী অপেক্ষা সাধারণ দোকানদারদের অবস্থা অনেকটা ভাল ছিল। কিন্তু তাহাদিগকেও শাসনকর্ত্তা অথবা রাজকর্ম্মচারীদের নিকট অর্দ্ধমূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিতে হইত।

পেলসির্ট

বাংলার সমৃদ্ধি

শ্রমিকদের জীবন

জিন ব্যাপ্‌টিষ্ট টাভার্নিয়ে একজন ফরাসি সওদাগর, তিনি জহরতের ব্যবসা করিতেন। তিনি ঔরঙ্গজীবের মণিমুক্তা দেখিয়া বলিয়াছেন, "মোগল সম্রাটের মণিমুক্তাখচিত সাতখানি সিংহাসন আছে। ইহার মধ্যে একখানি আগাগোড়া হীরকে খচিত।"

টাভার্নিয়ে

ফ্রান্সোয়া বার্ণিয়ে নামক জনৈক ফরাসি চিকিৎসক ১৬৫৬ হইতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বারো বৎসর কাল ভারতবর্ষে কাটাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বর্ণ ও রৌপ্য পৃথিবীর অন্য দেশে ব্যবহৃত হইবার পর হিন্দুস্থানের করতলগত হয়। হিন্দুস্থান অনেক বালুময় অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য প্রদেশে পরিপূর্ণ। চাষ আবাদের সুবন্দোবস্ত নাই, জনসংখ্যাও বিরল। শ্রমিকের অভাবে উর্ব্বর জমিগুলিও অনেক সময় অকর্ষিত পড়িয়া থাকে। প্রাদেশিক শাসকগণের অত্যাচারে বহু কৃষক ধ্বংস পায়"। বার্ণিয়ে বলেন, মোগল সম্রাট্ যেমন প্রচুর রাজস্বের অধিকারী তেমনি তাঁহার ব্যয়ের পরিমাণও প্রভূত ; সুতরাং সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই ফরাসি চিকিৎসক বলেন, কৃষক ও শ্রমিকগণের একান্তভাবে জাগীরদারদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। এমন কোনও স্থান ছিল না যেখানে উপদ্রুত কৃষক, শ্রমিক অথবা ব্যবসায়ী তাহার ন্যায্য অভিযোগের প্রতিকার পাইতে পারিত।

বার্ণিয়ে

দেশের অবস্থা

কৃষকের প্রতি অত্যাচার

ব্যয়-বাহুল্য

কৃষকদের অবস্থা

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ধনসম্পদে ফরাসি চিকিৎসক বার্ণিয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে দেখা যায়, "এই দেশে

এত প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইত যে, তাহা হইতে শুধু পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের নহে, দূরতম প্রদেশগুলির পর্য্যন্ত খাদ্য সরবরাহ হইত।" বাংলায় প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইত। ইহা সুদূর গোলকুণ্ডা, কর্ণাটক, আরব, পারস্য, এমন কি মেসোপটেমিয়ায় পর্য্যন্ত রপ্তানী হইত।

বাংলায় প্রাচুর্য্য

ইটালীর পর্য্যটক নিকোলাও মানুচী তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় এদেশে কাটাইয়াছিলেন। তিনিও এদেশ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মানুচী ব্যতীত আরও অনেক বিদেশী ভাগ্যান্বেষণে এই কল্পতরুর দেশে আসিয়াছিলেন। ধন-সম্পদে ভারতবর্ষ বাহিরের যে বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, অন্যান্য বৈদেশিক বিবরণ হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লীর সম্রাট্ বা মহিমান্বিত মোগলগণ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের অমাত্য ও কর্ম্মচারিগণ যাহা চাহিতেন, তাহাই পাইতেন। কিন্তু কৃষক ও শিল্পিগণ প্রবলের উৎপীড়নে ও শক্তিমানের শোষণে অতিকষ্টে জীবনধারণ করিত। তাহাদের অভিযোগ জানাইবার সাহস পর্য্যন্ত ছিল না। প্রবলের অত্যাচারে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারা কেবল আপন অদৃষ্টের ধিক্কার দিত, আর ভাবিত, হয়তো উহাই তাহাদের নিয়তি।

মানুচী

পঞ্চম খণ্ড

আধুনিক যুগের উপক্রমণিকা

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ইউরোপীয় জাতি সমূহের আগমন

মুসলমানগণের সামুদ্রিক শক্তির অবহেলা :—গজনী ও ঘুর এবং সমরকন্দ ও কাবুল হইতে যে সকল মুসলমান নায়ক ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুপরিচিত পথে এদেশে আসিয়াছিলেন। তৈমুরবংশীয় রাজগণের বিশাল সেনাবাহিনী ছিল, তাঁহারা সকলেই স্থলপথে যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু ভারত মহাসাগরে বাদশাহের আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতের যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহারা সমুদ্রপথেই এদেশে আগমন করিয়াছিলেন।

নৌ-বাহিনীর অভাব

পর্ত্তুগীজ :—একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক জলপথে ভারতে পৌঁছিবার পথ আবিষ্কার করেন। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য দেশসমূহের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত এই অতিশয় লাভজনক ব্যবসায় আরবগণের হস্তগত হয়। ইটালির বণিক্‌গণ তাঁহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় জিনিষ ক্রয় করিতেন। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়িগণ ভারতবর্ষের সহিত সরাসরি বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অবশেষে

তাঁহারাই ভারতবর্ষে পৌঁছিবার নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। পর্ত্তুগীজ সরকারের উদ্যোগে আফ্রিকার উপকূল-পথে কয়েকবার সামুদ্রিক অভিযান প্রেরিত হয়। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্থলোমিউ দিয়াজ নামক এক ব্যক্তি "উত্তমাশা" বা "বাত্যা-বিক্ষুব্ধ অন্তরীপ" পার হইয়াছিলেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামা নামক আর একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন। এইভাবে পর্ত্তুগীজগণের বহুদিনের চেষ্টা ও পরিশ্রম সফল হয়।

অন্তরীপের পথ আবিষ্কার

ভাস্কো ডা গামা

পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাদের আবিষ্কারের সুবিধা অন্যান্য জাতিকে দিতে চাহিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের সহিত আরব বণিক্‌দের ও কালিকটের জামোরিণ উপাধিধারী হিন্দু নরপতির সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া গেল।

জামোরিণ

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুপ্রসিদ্ধ পর্ত্তুগীজ নায়ক আলফন্সো ডি আলবুকার্ক বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত গোয়া বন্দর আক্রমণ করেন। আলবুকার্ক মুসলমানদের প্রতি অতিশয় নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে ভারতীয় রমণী বিবাহ করিয়া এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিতে উৎসাহ দিতেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজদের ন্যায় প্রবল নৌশক্তি আর ছিল না।

আলবুকার্ক

ক্রমশঃ সমুদ্রোপকূলে তাঁহারা কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। সালসেটি, বেসিন, গোয়া, দমন, দিউ, চৌল, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের নিকটস্থ সাম্থোম ব্যতীত বাংলায় হুগলি এবং সিংহলের অধিকাংশ

পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ

স্থানে তাঁহাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দমন, দিউ ও গোয়া এখনও পর্ত্তুগীজ অধিকারে রহিয়াছে। সমুদ্রপথে তাঁহাদের উপদ্রব এবং পরধর্ম্মবিদ্বেষের জন্য শীঘ্রই দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য ঘটে। শাহজাহানের রাজত্বকালে

হুগলি ও সালসেটি হস্তচ্যুত

কাসিম খাঁ কিরূপে হুগলি অধিকার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল অত্যাচার উৎপীড়নের ফলে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সালসেটি ও বেসিন মরাঠাদিগের হস্তগত হইল। এদিকে ইউরোপ হইতে আগত অন্যান্য জাতির সঙ্গেও তাঁহাদের সংঘর্ষ বাধিয়া গেল।

ইংরেজ প্রমুখ অন্যান্য জাতি ঃ—পর্ত্তুগীজদের যেমন ইটালীয় বণিক্‌দিগের সমৃদ্ধি সহ্য হইত না, তেমনই ইউরোপের অন্য জাতিসমূহও পর্ত্তুগালের উন্নতিতে ঈর্ষা বোধ করিতে লাগিল। পশ্চিমের অন্যান্য জাতি ভারত মহাসাগরে পর্ত্তুগীজদিগের আধিপত্য স্বীকার করিতে

ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

প্রস্তুত ছিলেন না। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পূর্ব্ব সমুদ্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের জন্য রাজসনন্দ লাভ করেন। অতঃপর ওলন্দাজ এবং দিনেমারগণ ভারতে

ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়া কোম্পানি

ব্যবসায়ের জন্য উদ্যোগ করেন। ফরাসী রাজনৈতিক কোলবার্টের আগ্রহে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়।

এক স্থানে এতগুলি জাতি ব্যবসা করিতে গেলে বিরোধ বিসম্বাদ অনিবার্য্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্যবসায়ের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল ব্যবসায় লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের

সকলেই এদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া একে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কোম্পানিই নিজ নিজ সরকারী সনন্দের বলে পূর্ব্ব সমুদ্রে একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার দাবী করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের অর্থলোভ এত প্রবল ছিল যে কোন কোম্পানি আপনাদিগের স্বজাতি বণিককেও ব্যবসায় করিতে দিতে সম্মত হইতেন না। একসময়ে ইংরেজ কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যে শতকরা চারিশত টাকা লাভ হইয়াছিল। দিল্লীর বাদশাহ যদি সমুদ্রপথে শান্তিরক্ষা করিতে পারিতেন তবে এই সকল পাশ্চাত্য বণিক্ বিনা বিরোধে ব্যবসায় পরিচালন করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু সম্রাট্ নৌবল-হীন বলিয়া বিদেশী বণিকেরা ভারত মহাসাগরে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই।

ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কোম্পানিদের প্রতিযোগিতা

অশান্তিকর ব্যবসাপদ্ধতি

দিনেমারগণ কখনই পূর্ব্বদেশে তেমন প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ত্তুগীজদের প্রভাবও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। সুতরাং ভারতবর্ষে এবং পূর্ব্বদেশে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীগণই ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন। এক সময়ে ওলন্দাজগণই বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় সকলকে হারাইবার উপক্রম করিয়াছিল কিন্তু তাঁহারা সিংহল এবং পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনে সমধিক ব্যস্ত রহিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসীগণ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন।

শক্তিহীন জাতির বিলোপ

ফরাসী ও ইংরেজ

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি :—পশ্চিম ভারতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সুরাটে। কিন্তু কালক্রমে

ইহা অপেক্ষা আর একটি ক্ষুদ্র বন্দর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগীজরাজের ভগিনী ক্যাথারিণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ পর্ত্তুগীজরাজ দ্বিতীয় চার্লস্‌কে বোম্বাই দ্বীপ প্রদান করেন। তখন বোম্বাই অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়াই পরিচিত ছিল। ইংলণ্ডের রাজা এই দ্বীপটি বাৎসরিক দশ পাউণ্ড অর্থাৎ সে সময়কার হিসাবে ৮০৲ টাকা খাজনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ইজারা দেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস ডে নামক জনৈক ব্যক্তি স্থানীয় এক রাজার নিকট হইতে মাদ্রাজের ইজারা গ্রহণ করেন। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে এই স্থানটিই ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। নূতন কেন্দ্র রক্ষার জন্য সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গ নির্ম্মিত হয়। বাংলায় ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কুঠিগুলি প্রথমে মাদ্রাজের অধীনে ছিল। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক ভাগীরথীতীরস্থ জলাভূমির মধ্যে কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। এইরূপে ইংরেজ বণিকগণ একে একে কতকগুলি স্থানের মালিক হইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া অনেক ইংরেজ বণিক্ ভারতের বাজারে উপস্থিত হইল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে অপর একটি ইংরেজ কোম্পানি রাজসনন্দ লইয়া ইংলণ্ড হইতে আগমন করিল, এবং শীঘ্রই তাহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ১৭০২ খৃষ্টাব্দে এই দুইটি কোম্পানি মিলিত হইল। এইরূপে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিযোগিতায়

বোম্বাই

মাদ্রাজ

কলিকাতা

নূতন ইংরেজ কোম্পানি

যে কলহের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা চিরতরে অবসান হইয়া গেল।

ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশঃ—১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে সুরাটে এবং ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মসুলিপটমে কুঠি স্থাপন করিয়া ফরাসী ব্যবসায়ীগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সোয়া মার্টিন ও বেলাঞ্জার ডি লেস্‌পিনে এক মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ইজারা লয়েন। এইখানেই পরে পন্দিচেরী নগরের অভ্যুদয় হয় (১৬৭৪ খৃঃ)। ফরাসী শাসকগণের চেষ্টায় পন্দিচেরী অতিশয় সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব ফরাসীদিগকে চন্দননগর প্রদান করেন। ১৬৯০-৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সেখানে একটি কুঠি নির্ম্মাণ করেন। পরে পশ্চিম উপকূলের মাহে ও পূর্ব্ব উপকূলের কারিকল ফরাসীদের হস্তগত হয়। কিন্তু এই সময় সুরাট ও মসুলিপটমের কুঠিগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফরাসী ও ইংরেজ এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ইংরেজগণই ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থসম্পদে প্রবল ছিল। সরকারী হস্তক্ষেপে ফরাসী বণিক্ কোম্পানির অনেক অসুবিধা হইত। কিন্তু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইংরেজ কোম্পানির এরূপ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে পন্দিচেরীর গভর্ণর হইয়া আসেন। তিনি যেমন অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন তেমনই তাঁহার উচ্চাভিলাষও ছিল অপরিসীম।

পন্দিচেরী

চন্দননগর

মাহে ও কারিকল

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি

ডুপ্লেঃ—ডুপ্লে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প

করিয়াছিলেন। ভারতীয়গণের দুর্ব্বলতার কথা কাহারো অবিদিত ছিল না। সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালেই যে বাদশাহের সামরিক শক্তি খর্ব্ব হইয়াছিল, ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ডুপ্লে যখন পন্দিচেরীর শাসনভার গ্রহণ করেন তখন দিল্লীর সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ডুপ্লে বুঝিলেন এই সুযোগে সুদক্ষ ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর পরিচালনায় একদল সুশিক্ষিত ভারতীয় সৈন্য গঠন করিতে পারিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এই সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। তখন ভারতবর্ষেও এই দুই জাতির বিরোধ সংক্রামিত হয়।


ডুপ্লে

কর্ণাটে প্রথম ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ :—অনেক দিন ধরিয়াই ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত-মহাসাগরস্থিত এবং ফরাসী জাতির অধিকৃত মরিসিয়াসের শাসনকর্ত্তা মাহে ডি লা বুরদনে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশ আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্স হইতে ফরাসী নৌ-বাহিনীর প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ আসিলে তাঁহার সে আশা বিফল হইয়া যায়। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকখানি ইংরেজ রণতরী পন্দিচেরী আক্রমণের উদ্যোগ করেন। কিন্তু কর্ণাটকের (আর্কটের পার্শ্ববর্ত্তী দেশ) নবাব

লা বুরদনে

তাঁহার এলাকায় যুদ্ধ নিষেধ করিয়া দিলেন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লা বুরদনে

মাদ্রাজ অধিকার

মাদ্রাজ অধিকার করেন। চারি লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে তিনি মাদ্রাজ শহরটি প্রত্যর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ডুপ্লে এই

ডুপ্লে ও আনোয়ারউদ্দীন

প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না এবং শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত মাদ্রাজ ফরাসী অধিকারে রহিল। কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দীন ভাবিয়াছিলেন, ফরাসীরা তাঁহার নিকট মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করিবে, কিন্তু তাহার কোনও লক্ষণ না দেখিয়া তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার দশ হাজার সৈন্য পাঁচ শত ফরাসী সৈন্যের নিকট পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ডুপ্লে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের যে কল্পনা করিয়াছিলেন, মাদ্রাজে তাহার সূত্রপাত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ আক্রমণ ব্যর্থ হইল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে

একস্-লা-স্যাপেলের সন্ধি

ইউরোপে একস্-লা-স্যাপেলের সন্ধিতে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে মাদ্রাজ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই সন্ধিতে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইল না, তাঁহারা নূতন করিয়া শত্রুতার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন এবং সে সুযোগের অভাব হইল না। দুই জন দেশীয় রাজার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহারা শীঘ্রই পরস্পরের বিরুদ্ধে আবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধঃ—দক্ষিণাপথে নিজাম-উল্-মুল্ক প্রকৃতপক্ষে

কর্ণাটকের আর্কটের নবাবপদ

স্বাধীন হইলেও আপনাকে দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিতেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আধুনিক মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কর্ণাটক জনপদ নামে তাঁহার অধীন ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ

১৯

সাদাতুল্লার বংশধরগণই বংশানুক্রমে এই প্রদেশটি শাসন করিতেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটকের নবাব পরিবারে কলহ আরম্ভ হইলে চতুর নিজাম আনোয়ারউদ্দীন নামক আপনার এক অনুচরকে নাবালক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। ইহার অত্যল্প কাল পরেই বালক-নবাবকে নিহত করিয়া আনোয়ারউদ্দীন নবাব-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পুরাতন রাজবংশের জামাতা চাঁদসাহেব তখন সাতারায় বন্দী ছিলেন, তিনি কর্ণাটকের অধিকার দাবি করিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ ও দৌহিত্র মুজাফ্‌ফরজঙ্গের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। ডুপ্লে দেখিলেন, এই কলহই ফরাসী প্রভাব বিস্তারের সর্ব্বোত্তম সুযোগ। তিনি মুজাফ্‌ফরজঙ্গের পক্ষাবলম্বন করিয়া কর্ণাটকে আনোয়ারউদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চাঁদসাহেবকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ডুপ্লে দেখিলেন, যদি নিজামের গদিতে তাঁহার পক্ষের কাহাকেও বসাইতে পারেন এবং কর্ণাটকের নবাব পদে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে দক্ষিণাপথে তাঁহার নিষ্কণ্টকে প্রভুত্ব করিবার আর বাধা থাকে না; এই সকল মিত্ররাজের নিকট হইতে তিনি যে ফরাসী কোম্পানির জন্য নানারূপ সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। প্রথমতঃ ডুপ্লে ও তাঁহার পক্ষের ব্যক্তিগণই জয়লাভ করিতে লাগিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আনোয়ার-উদ্দীন নিহত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলি পলায়ন করিয়া ত্রিচিনপল্লীতে উপস্থিত হন। ইহার পরে নাসিরজঙ্গ ও মহম্মদ আলি ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নাসিরজঙ্গ তাঁহার

ডুপ্লের রাষ্ট্রনীতি

আনোয়ারউদ্দীনের পরাজয় ও মৃত্যু

ভাগিনেয়কে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। তখন মুজাফ্‌ফরজঙ্গ মাতামহের রাজ্য পাইলেন (১৭৫০ খৃঃ, ডিসেম্বর)। অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলেও ফরাসীদের কোন ক্ষতি হয় নাই।

ফরাসীদের জয়লাভ

ফরাসী সেনাপতি বুসি সলাবৎজঙ্গ নামক নিজামের এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া হায়দরাবাদ দরবারে দীর্ঘকাল ফরাসী প্রভাব অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য বিষয়েও ডুপ্লের আশা বিফল হয় নাই। মুজাফ্‌ফরজঙ্গ তাঁহাকে এক বিশাল জনপদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ফরাসীদিগকে মসুলিপটম প্রদান করিয়াছিলেন। মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লীতে চাঁদসাহেব কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন।

ত্রিচিনপল্লী অবরোধ

এইরূপে ডুপ্লের কল্পনা যখন কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছিল তখন একজন প্রতিভাশালী ইংরেজ সেনাপতির আবির্ভাব হইল। ইঁহার নাম রবার্ট ক্লাইভ।

রবার্ট ক্লাইভঃ—রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মার্কেট ড্রেটনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরাণীর চাকুরী লইয়া তিনি মাদ্রাজে আগমন করেন

পূর্ব্বকথা

কিন্তু শীঘ্রই তিনি মসী ছাড়িয়া অসি ধারণ করিলেন। লা বুরদনে, যখন মাদ্রাজ অধিকার করেন, তখন তিনি ইংরেজ সেনাদলে যোগদান করেন। সেণ্ট ডেভিড দুর্গ রক্ষায় এবং তাঞ্জোর অভিযানে তাঁহার সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল। ফরাসীদিগের সহায়তায় চাঁদসাহেব যখন ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিয়াছিলেন তখন ক্লাইভ মাদ্রাজের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইলেন যে, চাঁদসাহেবের

অনুপস্থিতিতে তাঁহার রাজধানী আর্কট আক্রমণ করিতে পারিলে অবরুদ্ধ মহম্মদ আলির সুবিধা হইবে ; এবং স্বয়ং এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কেবলমাত্র পাঁচ শত ভারতীয় এবং ইংরেজ সৈন্য লইয়া তিনি অতর্কিতে আর্কট দখল করিলেন। চাঁদসাহেব সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুত্র রাজা-সাহেবকে আর্কট পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজাসাহেব ক্লাইভের হস্তে পরাজিত হইলেন। তখন

আর্কট অবরোধ ও আত্মরক্ষা



রবার্ট ক্লাইভ

ক্লাইভ ত্রিচিনপল্লী পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হইলেন এবং চাঁদসাহেব ও ফরাসীদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত করিয়া মহম্মদ আলিকে আর্কটের সিংহাসনে বসাইলেন। ইতিপূর্ব্বে হায়দরাবাদে ফরাসী প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এইবার আর্কটে (১৭৫২ খৃঃ) ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

চাঁদসাহেবের পতন

ডুপ্লে ইহার পরেও অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ফরাসীরা ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন। এইরূপে ইঙ্গ-ফরাসী সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

ডুপ্লের অকৃতকার্য্যতা

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ (তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ) :—ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সঙ্গে (১৭৫৬-৬৩ খৃঃ) আবার এদেশে ইংরেজ ও

ফরাসীদিগের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। নিজামের দরবারে ফরাসী সেনাপতি বুসি ইহার মধ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আধুনিক মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরস্থিত উত্তর সরকার প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন ফরাসী সেনাপতি লালির অসুবিধার অন্ত ছিল না। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ বাংলা দেশ জয় করিলে ইংরেজদিগের বল আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইউরোপের যুদ্ধের সংবাদ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিলে ক্লাইভ ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেন। ইংরেজ নৌ-শক্তির পরাক্রমে সমুদ্র-পথে ফরাসীগণের পক্ষে যাতায়াত করা আর নিরাপদ রহিল না। সুতরাং স্বদেশ হইতে সেনাপতি লালি সৈন্য বা অর্থ সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারিতেছিলেন না। ওদিকে পন্দিচেরীর অ-সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহার কার্য্যে নানাবিধ অন্তরায় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ আক্রমণ করেন। তারপর অর্থের অভাবে বাধ্য হইয়া তাঞ্জোর আক্রমণ করিলেন। ইংরেজ নৌ-বাহিনী যথাসময়ে না পৌছিলে নিশ্চয়ই তাঞ্জোরের পতন হইত। লালি হায়দরাবাদ হইতে বুসিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বুসির প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই নিজাম রাজ্যে ফরাসী প্রভাব লুপ্ত হইল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে লালি মাদ্রাজ অবরোধ করিলেন কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল ষ্ট্রীঞ্জার লরেন্স দক্ষতার সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইংরেজ নৌ-বাহিনী আসিয়া পৌছিলে (১৭৫৯ খৃঃ) দুর্গ দখল করিবার সকল আশা ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে উত্তর সরকার প্রদেশ ফরাসীদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। মসুলিপটম প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থান হইতে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে বঙ্গদেশ হইতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন।

হায়দরাবাদে বুসি

লালির অসুবিধা

লালির কার্য্যাবলী

ফোর্ড উত্তর সরকারে উপস্থিত হইবার পর নিজাম ইংরেজদিগকে ঐ প্রদেশটি দান করিলেন (১৭৫৯ খৃঃ)। বার বার পরাজয়ে ফরাসী সৈন্যদল নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, তদুপরি অর্থাভাববশতঃ কর্ণাটকে লালির আর নূতন কোনও অভিযান সফল হইল না। অবশেষে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি কূট কর্ত্তৃক লালি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন (১৭৬০ খৃঃ)। ইহার পর পন্দিচেরী অবরুদ্ধ হইল। নয় মাস অবরোধের পরে পন্দিচেরীর পতন হইল এবং লালি শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। ইংরেজেরা পন্দিচেরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয়। প্যারিসের সন্ধি অনুসারে ভারতবর্ষের ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়। কিন্তু ফরাসী শক্তি ক্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়িল, তাঁহাদের পুনরভ্যুত্থানের কোন সম্ভাবনা রহিল না।

উত্তর সরকারে ইংরেজ

বন্দীবাসের যুদ্ধ

প্যারিসের সন্ধি

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণঃ—ভারতবর্ষে ফরাসী শক্তির পতনের জন্য ডুপ্লে অথবা লালি কেহই সম্পূর্ণরূপে দায়ী নহেন। বুদ্ধিতে অথবা দূরদৃষ্টিতে ডুপ্লে তাঁহার ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অনুসৃত নীতি কার্য্যে পরিণত করাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ফরাসী রাজসরকার তাঁহাকে প্রয়োজন মত সাহায্য করেন নাই। জলপথে ইংরেজদিগের প্রাধান্য এবং অর্থাভাবই লালির পরাজয়ের প্রকৃত কারণ। প্রয়োজনের সময় আবশ্যকমত অর্থ সাহায্য তিনি কখনই পান নাই। কিন্তু ইংরেজেরা যখনই প্রয়োজন হইত, তখনই বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর অর্থ পাইতেন। বন্দীবাসের জয় একরূপ পলাশীরই পরিণাম এবং বাংলাদেশ হইতেই ইংরেজ জাতি সমগ্র ভারতে তাঁহাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

অর্থাভাব

ত্রিংশ অধ্যায়

বঙ্গ-বিজয় ও হায়দর আলির অভ্যুত্থান

মুর্শিদকুলি খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণঃ—ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের অবসানে যে কয়েকজন সুবাদার নামে সম্রাটের অধীনে থাকিয়া কার্য্যতঃ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাদের অন্যতম। পূর্ব্বে তিনি বাংলা প্রদেশের দেওয়ান ছিলেন। ১৭০৩-৪ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে বঙ্গদেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত করেন। তিনিই ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর নামানুসারেই রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ হইয়াছিল। দিল্লী হইতে তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার আশঙ্কা ছিল না বলিয়া তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবেই বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে সম্রাটের ফরমান বলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার নবাব হইলেন। ইহাতে পূর্ব্ব প্রথা অনুযায়ী বাদশাহের প্রভুত্ব অব্যাহত রহিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ বাংলার নবাব সম্রাটের আধিপত্যে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

সুজাউদ্দীন

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। কয়েক মাস পরেই ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইয়াছিলেন। নবাবের

সরফরাজ খাঁ

আলিবর্দ্দী খাঁ

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধিমান আলীবর্দ্দী বাদশাহী ফরমান আনাইয়াছিলেন। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে তাঁহার বিদ্রোহের অপরাধ হয় নাই। আলীবর্দ্দী অতিশয় উৎসাহী ও কর্ম্মদক্ষ শাসনকর্ত্তা হইলেও নাগপুরের মরাঠাদিগের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়েক বৎসরকাল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে উড়িষ্যা প্রদেশের এক অংশ একরূপ ছাড়িয়া দিয়া বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দানের প্রতিশ্রুতিতে তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দীর মৃত্যু হয়, তৎপরে তাঁহার দৌহিত্র (কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র) মির্জ্জা মহম্মদ বা সিরাজদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই বঙ্গদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

মরাঠা আক্রমণ (বর্গীর হাঙ্গামা)

সিরাজদ্দৌলা

সিরাজদ্দৌলা ও ইংরেজঃ—বাংলায় ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের কুঠি পরস্পরের অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এক বিষয়ে ইংরেজদের একটি বড় রকমের সুবিধা ছিল। ইচ্ছা করিলেই কলিকাতার কুঠি হইতে তাঁহারা চন্দননগর ও চুঁচুড়া-যাত্রী ফরাসী ও ওলন্দাজ জাহাজের পথ রোধ করিতে পারিতেন। আলীবর্দ্দী তাঁহার রাজ্যমধ্যে ইউরোপীয় বণিক্‌দিগকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দীর জীবিত কালে তাঁহার আদেশ অমান্য হয় নাই। ইংরেজ ও ফরাসীরা যখন কর্ণাটকে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত, তখনও নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে শান্তি ভঙ্গ করিতে তাঁহারা সাহসী হন নাই। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সময় ইহার ব্যতিক্রম হইল। প্রচলিত ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলার প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। অনেকেই তাঁহাকে নিষ্ঠুর ও চরিত্রহীন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে



নবাবের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গদেশে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ নিষেধ করায় আলীবর্দ্দীর প্রতি ইংরেজগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে হয়তো তাঁহার রাজত্বকালেই যুদ্ধ আরম্ভ হইত। সম্ভবতঃ তরুণ নবাবের যৌবন-সুলভ চাপল্য ও অনভিজ্ঞতার জন্য এত শীঘ্র সংগ্রাম আসন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সিরাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ একেবারে অমূলক ছিল না। প্রথমতঃ তাঁহারা সিরাজদ্দৌলার একজন পলাতক প্রজাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ ফরাসীরা নবাবের আদেশে চন্দননগরে দুর্গ নির্ম্মাণে নিবৃত্ত হইলেও কলিকাতার ইংরেজগণ সিরাজের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য শর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়াও তাঁহারা নবাবের অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। ইংরেজ গবর্ণর ড্রেকের উদ্ধত আচরণে নবাব আরও বিরক্ত হইলেন। অবশেষে ইংরেজদিগকে দমন করিবার জন্য ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব কলিকাতায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ড্রেক এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি অধিকাংশ কর্ম্মচারীর সহিত পলায়ন করিলেন। যাহারা কলিকাতায় রহিল, তাহারা কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। কথিত আছে, ইহার পরে ১৪৬ জন বন্দীকে একটি অপরিসর কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখার ফলে তাহাদিগের অধিকাংশের শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হয়। বন্দীদিগের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি এই বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে একেবারে অলীক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের যুক্তি একেবারে উপেক্ষা

নবাবের ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণ

অন্ধকূপ হত্যা সংক্রান্ত জনশ্রুতি

করাও সহজ নহে। তবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই শোচনীয় ব্যাপারে নবাবের নিজের কোনও দোষ ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খৃঃ) :—ড্রেক ও তাঁহার সহচরগণ কলিকাতার কিছুদূরে ফলতায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং এই দুর্ঘটনার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে, ক্লাইভ ও নৌ-সেনাধ্যক্ষ ওয়াট্‌সন একদল সৈন্য ও কয়েকখানি রণতরী লইয়া বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা অনায়াসে কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন (১৭৫৭ খৃঃ)। নবাব যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু জয়-পরাজয় স্থির হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজদের সহিত নূতন শর্ত্তে সন্ধি করিলেন। স্থির হইল, ইংরেজেরা তাঁহাদের কেল্লা ও কোম্পানির পূর্ব্বপ্রচলিত অধিকার ফিরিয়া পাইবেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা হইবে এবং কলিকাতায় দুর্গনির্ম্মাণের ও মুদ্রা চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে। ইংরেজগণ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন। কিন্তু পাঁচ মাসের অধিক কাল এই শান্তি স্থায়ী হইল না। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিলে ক্লাইভ কিরূপে চন্দননগর অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে নবাব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অপর পক্ষে ইংরেজেরা সন্দেহ করিলেন যে, নবাব হয়ত গোপনে ফরাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন। এদিকে নবাবের কয়েকজন কর্ম্মচারী সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলীবর্দ্দীর ভগিনীপতি মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ক্লাইভের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। যখন এইরূপ পরামর্শ চলিতেছিল, তখন ক্লাইভ একটি হীন কার্য্য করিয়াছিলেন। উমিচাঁদ

ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সনের বাংলায় গমন

সন্ধি স্থাপন

নামে একজন বণিক্ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতেন। তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য ক্লাইভ ওয়াট্সনের নাম একখানি সন্ধিপত্রে জাল করিয়াছিলেন। উদ্যোগ আয়োজন সব শেষ হইলে ক্লাইভ একদিন নবাবের প্রতি সন্ধিভঙ্গের অভিযোগ আরোপ করিয়া প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নবাব সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। মুর্শিদাবাদের প্রায় তেইশ মাইল দূরে পলাশীর আম্রকাননে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল। নবাব শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করিলেন এবং ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার নবাব ঘোষণা করিলেন। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই সিরাজদ্দৌলা ধৃত হইয়া মীরজাফরের পুত্র মীরণ কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে নিহত হন। কিন্তু যে অর্থের লোভে এত ষড়যন্ত্র, সেই অর্থের পরিমাণ দেখিয়া ইংরেজগণকে নিরাশ হইতে হইল। প্রত্যাশিত অর্থের বিশ ভাগের একভাগও রাজকোষে পাওয়া গেল না। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের তাহাতে কোন ক্ষতি হইল না। ক্লাইভ নগদে ২,৩৪,০০০ পাউণ্ডের কম পান নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি বাৎসরিক ত্রিশ হাজার পাউণ্ড আয়ের একটি জাগীর পাইয়াছিলেন। যাঁহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু একসঙ্গে সকলের দাবি সম্পূর্ণরূপে মিটাইবার সাধ্য নূতন নবাবের ছিল না। সুতরাং স্থির হইল, কোম্পানির প্রাপ্য টাকা কিস্তীতে কিস্তীতে দেওয়া হইবে।

পলাশীর যুদ্ধ

ক্লাইভের লাভ

নামাবশেষ নবাবঃ—মীরজাফর নামে মাত্র নবাব রহিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্লাইভই বঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতা হইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চব্বিশ পরগণার জমিদারী লাভ করিলেন। নূতন নবাব

এমনই অকর্ম্মণ্য ছিলেন যে, রাজ্যরক্ষার জন্যও তাঁহাকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হইত। শাহজাদা বা দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যখন বিহার আক্রমণ করিলেন, তখন ক্লাইভকেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল (১৭৫৯ খৃঃ)।

শাহজাদা

ওলন্দাজদের সহিত সংঘর্ষঃ—নিতান্ত অপদার্থ হইলেও মীরজাফর তাঁহার হেয় অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিলেন না। প্রজাসাধারণ যে তাঁহাকে প্রকাশ্যে ঘৃণা করিত, তাহাও তিনি জানিতেন। তিনি স্থির করিলেন ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূর করিবেন। ওলন্দাজেরাও সাগ্রহে মীরজাফরের আনুকূল্য করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভাগীরথীর মুখে তাঁহাদের জাহাজগুলি আটক করা হইল এবং জলে ও স্থলে তাঁহারা ইংরেজের হস্তে পরাজিত হইলেন। এইরূপে বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন।

বাংলায় ইংরেজ ও ওলন্দাজ সংঘর্ষ

নীলামে নবাবীঃ—ক্লাইভের পরে ভ্যান্‌সিটার্ট কলিকাতার গবর্ণর নিযুক্ত হন। ইংরেজ মিত্রগণের অর্থ-শোষণে মীরজাফর এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোম্পানির দাবি পূরণে তাঁহার আর সাধ্য রহিল না। কোম্পানি আশা করিয়াছিলেন যে বাংলার অর্থে তাঁহারা বোম্বাই ও মাদ্রাজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু নবাব তাঁহাদের এই আশা পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া কলিকাতার কর্ম্মচারিগণ অপর এক পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের নিকট বাংলার

ভ্যান্‌সিটার্ট

মীরকাশিম

নবাবী বিক্রয় করিলেন এবং উহার বিনিময়ে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব পাইলেন। এতদ্ব্যতীত গবর্ণর ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গকে এককালীন দুই লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হইল। যাঁহারা মীরজাফরকে আজীবন সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। মানুষ হিসাবে মীরকাশিম তাঁহার অকর্ম্মণ্য শ্বশুর অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুযোগ পাইলে হয়তো সুশাসকরূপেও তিনি খ্যাতি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু ইংরেজদের প্রভুত্ব তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এজন্য কলিকাতা হইতে অনেকদূরে মুঙ্গেরে গিয়া তিনি রাজধানী স্থাপন করিলেন। সেখানে তিনি সৈন্য ও শাসন বিভাগের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই অতি সামান্য কারণে ইংরেজদের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নবাবের রাজ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। কোম্পানির কর্ম্মচারীরাও লাভের প্রত্যাশায় ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আইনতঃ তাঁহাদের নিজ নিজ পণ্যের জন্য নবাব সরকারের নির্দ্দিষ্ট শুল্ক দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা নিজেরাও নবাবের প্রাপ্য শুল্ক দিতেন না। কোম্পানির ছাড় পত্র দিয়া নিজেদের বন্ধু ও অনুগৃহীতদিগকেও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার সুবিধা করিয়া দিতেন। ইহাতে দেশীয় বণিক্‌গণের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। কারণ কোম্পানির কর্ম্মচারীরা ও তাঁহাদের আশ্রিত ব্যবসায়িগণ শুল্ক দিতেন না বলিয়া সস্তায় জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিতেন। মীরকাশিম প্রথমে ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে তিনি সমস্ত শুল্ক রহিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং ইংলণ্ডের ব্যবসায়িবৃন্দ সকলেই সমান সুবিধা পাইতে

নূতন নবাব ও ইংরেজ

সুযোগের অপব্যবহার

লাগিলেন। কিন্তু ইংরেজ বণিক্‌গণ ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল।

পাটনা অধিকার

পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস্ হঠাৎ পাটনা শহর অধিকার করিলেন। তাঁহার এই উদ্ধত আচরণে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু যুদ্ধে নবাবের সৈন্য দুইবার পরাভূত হইল। এই পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া মীরকাশিম ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত বন্দীকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অবশেষে তৃতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি অযোধ্যায় পলায়ন করেন এবং নবাব সুজাউদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থনা করেন। অযোধ্যার নবাব সৈন্যসহ বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বক্সারে

বক্সারের যুদ্ধ

উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল। এবারেও নবাবের সৈন্যদল মেজর মন্‌রো কর্ত্তৃক পরাজিত হইল (১৭৬৪ খৃঃ)। মীরকাশিমের সহিত যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন কলিকাতার কাউন্সিল অপদার্থ মীরজাফরকেই আবার বাংলার নবাবী প্রদান করেন। ইহার বিনিময়ে ইংরেজগণের যুদ্ধে যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, মীরজাফরকে তাহা পূরণ করিতে হইল এবং তাঁহারা বাণিজ্য সম্পর্কে যে সকল সুবিধা দাবি করিয়াছিলেন, তাহার

মীরজাফরের মৃত্যু

সমস্তই প্রদান করিতে হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের আর একবার অর্থলাভের মহা সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহারা মীরজাফরের এক পুত্রকে নবাব করিলেন এবং বাংলার গবর্ণর ও তাঁহার সহযোগিগণ তাঁহার নিকট ১৩৯,৩৫৭ পাউণ্ড আদায় করিলেন। ইহা ছাড়া নূতন নবাবকে ইংরেজদিগের বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় সুবিধাগুলিও বাহাল

লর্ড ক্লাইভের পুনরাগমন

করিতে হইল। এই ভাবে কোম্পানির কর্ম্মচারিবৃন্দ অবাধে ঘুষ লইতে লাগিলেন। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার যখন কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না, তখন

ডিরেক্টরগণ লর্ড ক্লাইভকে পুনরায় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বাংলায় প্রেরণ করিলেন।

অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধিঃ—এদেশে ফিরিয়া আসিয়া ক্লাইভ তাঁহার স্বাভাবিক উৎসাহ ও তৎপরতার সহিত কোম্পানির কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অযোধ্যার নবাবের সৈন্য বক্সারের যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইলেও এতদিন সন্ধি স্থাপিত হয় নাই। ক্লাইভ ফিরিয়া আসিয়া সন্ধির সর্ত্ত স্থির করিলেন। সুজাউদ্দৌলা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং এলাহাবাদ ও কোরা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কোম্পানি এই জিলা দুইটি আবার সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলমের বৃত্তিরূপে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রতি বৎসর ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই অনুগ্রহের বিনিময়ে নামাবশেষ বাদশাহের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিলেন। উড়িষ্যা বলিতে এখন যে প্রদেশ বুঝায়, তাহা তখন নাগপুরের মরাঠারাজের অধীন ছিল। যদিও মাদ্রাজের উত্তরস্থিত উত্তর সরকার (Northern Sarkars) প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সৈন্যের বাহুবলে অধিকৃত হইয়াছিল, তথাপি এই সময় ক্লাইভ ঐ প্রদেশের জন্যও বাদশাহের সনন্দ সংগ্রহ করিলেন। বাংলার নবীন নবাবের আর শাসন-ক্ষমতা রহিল না, তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে বৃত্তির ব্যবস্থা হইল (১৭৬৫ খৃঃ)।

এলাহাবাদের সন্ধি

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী

দ্বৈত শাসনঃ—ক্লাইভের প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী দ্বৈত শাসন (Double Government) নামে পরিচিত। বাদশাহের সনন্দের বলে নূতন ব্যবস্থায় কোম্পানি দেওয়ানী পাইলেন, কিন্তু দেওয়ানের কাজ ছিল রাজস্ব

দ্বৈত-শাসনের অসুবিধা

আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা করা। নবাব, নিজামত বা শাসন বিভাগের ও ফৌজদারী বিচারের কর্ত্তা ছিলেন। "নিজামত" বিভাগের কাজকর্ম্মের জন্য বাংলা ও বিহারের দুইজন নায়েব নিজাম নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানির সম্মতি ব্যতীত কেহ এই পদ পাইতেন না। সুতরাং কাগজপত্রে নবাবের ক্ষমতা অব্যাহত থাকিলেও দেওয়ানী ও নিজামত উভয় বিভাগেই প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের হস্তগত হইল। অথচ আইনতঃ শাসন সম্পর্কে তাহাদের কোন দায়িত্ব রহিল না।

অন্যান্য সংস্কার :—কোম্পানির কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে সকল অনাচার প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা দূর করিবার জন্যই ক্লাইভকে পুনরায় এদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ব্যক্তিগত ব্যবসায় যাহাতে লোপ পায় তাহার ব্যবস্থা করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ক্লাইভ আসিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে ব্যবসায় করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং কেহ কোনও প্রকার উপহার গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি লইলেন। কিন্তু তাঁহারা যে স্বল্প বেতন পাইতেন, তাহাতে তাঁহাদের চলিত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ক্লাইভ একটি ব্যবসায় সমিতি গঠন করিলেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারীবৃন্দ ইহার অংশীদার হইলেন। কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ক্লাইভের এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই। পলাশীর যুদ্ধের পরে সেনা-বিভাগে শান্তির সময়েও ডবল ভাতা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, অথচ যুদ্ধের সময় ব্যতীত এইরূপ অতিরিক্ত ভাতা দিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। সুতরাং ক্লাইভ ইহা বন্ধ করিয়া

ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ

ডবল ভাতা

দিলেন। ইহাতে সৈন্যদলের মধ্যে অনায়াসে বিদ্রোহ হইতে পারিত, কিন্তু ক্লাইভের দৃঢ়তায় তাহা সম্ভব হয় নাই। দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীরা পূর্ব্ব ত্রুটির জন্য এই সময় তাঁহাকে নানাপ্রকার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পার্লামেণ্টের বিচারে তিনি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন (১৭৭৩ খৃঃ)। ইহার পর বৎসর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে লর্ড ক্লাইভ্ আত্মহত্যা করেন।

ক্লাইভের কৃতিত্ব ঃ—ক্লাইভই প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। অনেকের ধারণা যে তিনি অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। দৃঢ়সঙ্কল্প, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী রবার্ট ক্লাইভ কখনও পরিশ্রমে কাতর অথবা বিপদে বুদ্ধিভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসেই কর্ণাটকে বৃটিশ প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার বুদ্ধি ও বাহুবলেই বঙ্গদেশের বিপুল সম্পদ্ বৃটিশের করতলগত হইয়াছিল। মাদ্রাজের উত্তর সরকার বিজয়ের গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য।

রণনীতি

ক্লাইভ অতিশয় ধনলোভী ছিলেন, স্বকার্য্য-সাধনে তাঁহার ন্যায়-অন্যায় বোধ ছিল না। স্বদেশের হিতসাধনে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি যে সময় এদেশে আসিয়াছিলেন, সে সময় লোকের নীতিবোধ তেমন প্রবল ছিল না, তথাপি অপরের নাম জাল করিয়া তিনি যে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। নবাবের নিকট উপহারের নামে উৎকোচ গ্রহণের কুফল অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ সকল দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি যে একজন অসাধারণ কৃতী পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে তাঁহার কার্য্যাবলীর জন্য ইংলণ্ডবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

দোষ-ত্রুটি

তাঁহার দুর্ব্বলতা ও দোষ-ত্রুটির কথা এখন আর বড় কাহারো মনে পড়ে না, কিন্তু তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন সেই কথাই সকলে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে।

ক্লাইভের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল ঃ—ক্লাইভের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদের আমলে দ্বৈত শাসনের দোষগুলি প্রবল হইয়া উঠিল। উৎকোচ ও অনাচারে দেশ পূর্ণ হইল। ইহার উপর আবার ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাহাতে দেশের অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। ভারতের ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। খাদ্যাভাবে ও রোগের আক্রমণে বঙ্গদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। জনমানবের অভাবে শস্যক্ষেত্রগুলি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অনশনক্লিষ্ট কৃষকদের দুঃখ দূর করিবার কোন ব্যবস্থাই হইল না, নির্ম্মম উদাসীনতার সহিত রাজকর আদায় করা হইতে লাগিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ বলিয়াছেন, ১৭৭১ সালে ১৭৬৮ সাল অপেক্ষাও অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

ভীষণ দুর্ভিক্ষ

প্রথম ইঙ্গ-মহিষূর যুদ্ধ ঃ—বাংলার ন্যায় কর্ণাটকেও শাসনের অব্যবস্থা হইয়াছিল। এদিকে মহিষূর রাজ্যে অসমসাহসী কূটবুদ্ধি হায়দর আলি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিলেন। তিনি সাধারণ সিপাহীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অজ্ঞ ও নিরক্ষর হইলেও হায়দরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। মহিষূরের দলবই বা প্রধান মন্ত্রী যখন নামাবশেষ রাজার নামে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, হায়দর তখন তাঁহার অধীনে অশ্বারোহী সেনাদলে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু বুদ্ধির জোরে তিনি শীঘ্রই সেনানায়কের পদে

হায়দর আলির বাল্যকাহিনী

উন্নীত হইয়াছিলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই আপন আশ্রয়দাতাকে পদচ্যুত করিয়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী ছোট ছোট জনপদের ('পলিগার') রাজাদিগকে দমন করিয়া তিনি মহিষূরের রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। উত্তরে মরাঠাদিগের সহিত তিনি সমকক্ষতা করিতে পারিলেন না। মহিষূর আক্রমণ করিয়া মরাঠারা হায়দর আলির নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করিলেন। কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলির সহিত বিরোধ ছিল বলিয়া হায়দর আলি নবাবের আশ্রয়দাতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনের জন্য নিজামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু নিজামের তখন যুদ্ধস্পৃহা দূর হইয়াছে। অবশেষে হায়দর আলিকে একাই যুদ্ধ করিতে হইল।



হায়দর আলি

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অকস্মাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে মাদ্রাজের পাঁচ মাইল দূরে উপস্থিত হইলেন, এবং ইংরেজদিগকে আপন ইচ্ছামত সন্ধির শর্ত্তে সম্মত হইতে বাধ্য করিলেন। উভয় পক্ষের বন্দীদিগকে মুক্তি দান ও পরস্পরের অধিকৃত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করিবার চুক্তি হইল। অপর কেহ আক্রমণ করিলে ইংরেজগণ হায়দর আলিকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। হায়দরের নিকট এই শর্ত্তটিরই মূল্য ছিল অধিক, কারণ তিনি জানিতেন যে অচিরে মরাঠাদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য দরকার হইবে। কিন্তু মরাঠারা ...

মাদ্রাজের সন্নিকটে সন্ধি

পরে যখন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন, ইংরেজগণ তখন নিরপেক্ষ রহিলেন। এই বিশ্বাসভঙ্গের কথা হায়দর তাঁহার জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

হায়দর আশা-বঞ্চিত

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ বাংলার গবর্ণর হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থার ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

একত্রিংশ অধ্যায়

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ (১৭৭২-৮৫ খৃঃ)

হেষ্টিংসের শাসন-সংস্কারঃ—ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে কোম্পানির অধীনে চাকুরি লইয়া তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন, তৎপরে কর্ম্মতৎপরতায় ও চরিত্র-গুণে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করেন। গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রথমেই তিনি কোম্পানির আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন। ক্লাইভের দ্বৈত শাসনে দেশের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়াছিল। হেষ্টিংসের আমলে এই নীতির অবসান হইল। বাংলার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁ ও বিহারের নায়েব নাজিম মহম্মদ সীতাব রায় পদচ্যুত হইলেন। কলিকাতায় একটি 'রেভিনিউ বোর্ড' অর্থাৎ রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য সভা স্থাপিত হইল এবং রাজকোষ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। রাজস্ব আদায়ের জন্য বৃটিশ কর্ম্মচারী বা কলেক্টর

ডেপুটি নায়েবের পদচ্যুতি

নিযুক্ত হইল এবং কোম্পানি বিশেষ যত্ন ও আন্তরিকতা সহকারে



ওয়ারেণ হেষ্টিংস্

রাজস্ব সংস্কার

দেওয়ানীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইলেন। কৃষক ও জমিদারগণের সহিত পাঁচ বৎসরের জন্য রাজস্ব সম্বন্ধীয় নূতন বন্দোবস্ত হইল এবং দেওয়ানী ও

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত

ফৌজদারী বিচারের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দুইটি বিচারালয় স্থাপিত হইল। নবাব নামেমাত্র দেশের কর্ত্তা রহিলেন, তাঁহার বিশেষ কোনও ক্ষমতা রহিল না।

ব্যয়সঙ্কোচ

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তাঁহার বৃত্তির টাকা কমাইয়া কোম্পানির ব্যয়সঙ্কোচ করিলেন। এদিকে দিল্লীর সম্রাটের অবিবেচনায় হেষ্টিংস্ আরও বহু টাকা বাঁচাইবার সুযোগ পাইলেন।

অযোধ্যার নবাব ও সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলম:— ক্লাইভের নিকট হইতে বাদশাহ যখন বাৎসরিক করস্বরূপ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ ও কোরাপ্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনি গৃহহীন ও নিরাশ্রয়। কিন্তু শাহ আলম তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। মরাঠাদিগের সাহায্য লইয়া তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন।

হেষ্টিংস্ মরাঠাদিগের আশ্রিত বাদশাহের বাৎসরিক কর ২৬ লক্ষ টাকা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন এবং এলাহাবাদ ও কোরা পুনরায় অযোধ্যার নবাবকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। অযোধ্যার নবাব ইহার বিনিময়ে কোম্পানিকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন। ইহা ছাড়া অযোধ্যায় বৃটিশ সৈন্য রাখিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কতক অর্থ দিতে সম্মত হইলেন।

মরাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থান

কাশীর সন্ধি

রোহিলা যুদ্ধ (১৭৭৩-৭৪ খৃঃ) ঃ—অযোধ্যার নবাব তাঁহার প্রতিবেশী রোহিলখণ্ডের আফগানদিগকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। এই সমৃদ্ধ প্রদেশটির প্রতি তাঁহার বিশেষ লোভ ছিল। এদিকে রোহিলাগণও মরাঠাদিগের ভয়ে জনৈক বৃটিশ কর্ম্মচারীর সাক্ষাতে নবাবের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার করিলে মনে হইতে পারে যে হয় ত তাঁহারা সেবার আপনাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। সুতরাং অযোধ্যার নবাব রোহিলখণ্ড অধিকার করিবার জন্য বৃটিশের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এইজন্য ইংরেজদিগকে বহু অর্থ দিতে সম্মত হইলেন। অনেক বিবেচনার পরে হেষ্টিংস্ নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রোহিলারা ইংরেজদিগের কোন অনিষ্ট করে নাই। রোহিলখণ্ড বাহুবলে অধিকার করিয়া থাকিলেও সুশাসনের গুণে রোহিলা সর্দ্দারেরা হিন্দু প্রজাদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সুতরাং কেবল টাকার জন্য একটি প্রতিবেশী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হেষ্টিংস্ অতিশয় অসদ্দৃষ্টান্তই দেখাইয়াছিলেন বলিতে হইবে।

যুদ্ধের কারণ

রেগুলেটিং এ্যাক্ট বা নিয়ামক আইন (১৭৭৩ খৃঃ) ঃ—আইনের চক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি বণিক্‌সঙ্ঘ হইলেও কার্য্যতঃ

তাঁহারা ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অংশের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। বৃটিশ পার্লামেণ্ট এই ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অনেকে মনে করিতেন যে একটি সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব কয়েকজন বণিকের হস্তে রাখা সঙ্গত নহে। এই জন্য ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট বা নিয়ামক আইন পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল।

রেগুলেটিং এ্যাক্টের বিধিসমূহ

তদনুসারে স্থির হইল যে ভারত সম্পর্কীয় কাগজপত্র অতঃপর মন্ত্রীদের অবগতির জন্য পাঠাইতে হইবে। বাংলার গবর্ণর এই আইনের বলে 'গবর্ণর জেনারেল' উপাধি পাইলেন এবং সপারিষদ গবর্ণর জেনারেল ভারতবর্ষের অন্যান্য বৃটিশ শাসিত প্রদেশের উপরও কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। গবর্ণর জেনারেল ব্যতীত চারিজন সদস্য লইয়া তাঁহার পরিষদ্ (শাসন-সভা) বা কাউন্সিল গঠিত হইল। কোনও বিষয়ে দুইদিকে সমান সংখ্যক ভোট হইলে গবর্ণর জেনারেলের অতিরিক্ত ভোটে বিষয়টির চূড়ান্ত নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা হইল। প্রথম গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার পরিষদের সদস্যগণের নাম আইনে লিপিবদ্ধ হইল। ইহারা সকলে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইলেন।

কাউন্সিলরগণ

কাউন্সিলরগণের মধ্যে একমাত্র রিচার্ড বারওয়েল ব্যতীত অপর কাহারও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। অবশিষ্ট তিনজন, অর্থাৎ জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসন্ এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস্ পূর্ব্বে কখনও এদেশে আসেন নাই। একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন নিম্নতন বিচারক

সুপ্রীম কোর্ট

লইয়া কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট বা শ্রেষ্ঠ আদালত স্থাপিত হইল। এই কোর্টের সর্ব্বপ্রথম প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে হেষ্টিংসের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। নূতন ব্যবস্থার প্রধান দোষ এই যে ইহাতে সপারিষদ গবর্ণর জেনারেলের সহিত বোম্বাই ও মাদ্রাজ

সরকারের সম্পর্ক সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুপ্রীম কোর্ট (শ্রেষ্ঠ আদালত) এবং সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের (অর্থাৎ বড়লাট ও তাঁহার সভার সদস্যগণের) সম্পর্কও অতিশয় অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছিল। শাসন-সভার অধিকাংশ সদস্যের অভিমতের বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনারেলের কিছুই করিবার ক্ষমতা ছিল না।

রেগুলেটিং এ্যাক্টের দোষ-ত্রুটি

হেষ্টিংস্ ও কাউন্সিলরগণ :—এই ব্যবস্থায় হেষ্টিংস্‌এর অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। নূতন কাউন্সিলরগণ প্রতিপদে তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। একমাত্র বারওয়েল ব্যতীত তিনি কোনও কাউন্সিলরের সমর্থন পাইতেন না। প্রত্যেক ব্যাপারেই তাঁহার পরাজয় হইতে লাগিল। এইরূপ করিয়া শাসন-সভা বা কাউন্সিলে তাঁহার লাঞ্ছনার আর অবধি ছিল না। অবশেষে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মনসনের মৃত্যু হইলে হেষ্টিংস্ অতিরিক্ত ভোট দিয়া তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবার সুবিধা পাইলেন।

নূতন কাউন্সিলর-গণের বিরোধিতা

নন্দকুমার :—হেষ্টিংসের বিপক্ষদিগের মধ্যে ফ্রান্সিস্‌ই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। তিনি প্রকাশ্যভাবে হেষ্টিংসের নীতি ও কার্য্যাবলীর বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সিস্ ও তাঁহার বন্ধুগণের মনোভাব কাহারো নিকট গোপন ছিল না। তাঁহারা পরোক্ষভাবে গবর্ণর জেনারেলের শত্রুগণকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। হেষ্টিংসের শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে উৎকোচ ও তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে নন্দকুমার নামে একজন প্রতিষ্ঠাশালী উচ্চ-বংশীয় ব্রাহ্মণের অভিযোগই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। হেষ্টিংস্ ইহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, কিন্তু কাউন্সিলে তাহার প্রমাণ

সার ফিলিপ ফ্রান্সিস্

অভিযোগ

উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলেন। দুই পক্ষের আনীত অভিযোগ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমারের নামে জাল করিবার অভিযোগ উপস্থিত করেন। সুপ্রীম কোর্টে জুরির সাহায্যে তাঁহার বিচার হইল। বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয় (১৭৭৫ খৃঃ)। নন্দকুমারের প্রতি যে সুবিচার করা হয় নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নন্দকুমারের ফাঁসি

গবর্ণমেণ্ট ও সুপ্রীম কোর্টঃ—রেগুলেটিং এ্যাক্টে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সুস্পষ্ট নির্দ্ধারিত না থাকায় শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টের সহিত এই বিচারালয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। বিচারপতিরা মনে করিতেন, তাঁহাদের ক্ষমতা অসীম, তাই তাঁহারা সর্ব্বশ্রেণীর লোকের উপর ক্ষমতা পরিচালনা করিতে চাহিলেন। এমন কি তাঁহারা গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলকে পর্য্যন্ত আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করিলেন। অবশেষে হেষ্টিংস্ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ৬৫০০ পাউণ্ড বেতনে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করিয়া এই শোচনীয় দ্বন্দ্বের অবসান করেন। স্থির হইল যে ইংলণ্ডের ডিরেক্টরগণ এই ব্যবস্থা অনুমোদন না করিলে প্রধান বিচারপতি তাঁহার বেতনের টাকা ফেরত দিবেন।

বিরোধ ও তাহার প্রতিকার

প্রথম ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ ঃ—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইএর গবর্ণর ও কাউন্সিল মরাঠা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরাঠা শক্তি একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। বালাজী বাজীরাওএর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মাধবরাওএর নেতৃত্বে শীঘ্রই এই জাতি পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন পেশবার বয়স তখন বেশি নহে, তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ বা রাঘোবা পদে পদে তাঁহার প্রতিকূলতা করিতেছিলেন।

প্রথম মাধবরাও

দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া রাঘোবা মরাঠা জাতির চিরশত্রুদের সহিত মিত্রতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বয়সে নবীন হইলেও পেশবা মাধবরাও হতাশ হইলেন না। তিনি রাঘোবার সকল চক্রান্ত পণ্ড করিয়া বিদ্রোহীদলের উপর স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। তিনি হায়দর আলিকে দুইবার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন এবং নাগপুরের উদ্ধত রাজার দর্প চূর্ণ করিয়া উত্তর ভারতে মরাঠা প্রভুত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য একদল পরাক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সেনানায়কগণ রাজপুত ও জাঠদের নিকট চৌথ আদায় করিলেন এবং দিল্লী অধিকার করিলেন। মহাদাজী সিন্ধিয়া প্রমুখ কয়েকজন সর্দ্দার রোহিলাদিগের প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন। কিন্তু রোহিলা রাজ্য আক্রমণের পূর্ব্বেই নবীন পেশবার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পুণায় ফিরিয়া যাইতে হইল (১৭৭২ খৃঃ)।

মাধবরাওএর মৃত্যু

মাধবরাওএর পরে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশবা হইলেন। মাধবরাও রাঘোবাকে শান্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু নারায়ণরাও পিতৃব্যের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। রাঘোবাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তাঁহার ষড়যন্ত্রে বালক নারায়ণরাও আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন (১৭৭৩ খৃঃ)।

ইহার পরে রাঘোবা যখন পেশবা হইলেন, তখন কেহই আপত্তি করিতে সাহস পাইল না। কিন্তু কয়েকমাস পরেই জানা গেল যে নারায়ণরাওএর বিধবা পত্নী অন্তঃসত্ত্বা। তখন রাজ্যের একদল প্রতিপত্তিশালী লোক সেই অ-জাত সন্তানের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাঘোবার বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক রাঘোবাকে পদচ্যুত করিতেই হইবে। ইহাও স্থির হইল যে নারায়ণরাওএর

রঘুনাথরাও বা রাঘোবা

পত্নীর গর্ভে যদি পুত্র না হইয়া কন্যা জন্মে, তাহা হইলেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে পেশবা করা হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ নারায়ণরাওএর বিধবা পত্নী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। নবজাত বালকের নাম হইল মাধবরাও নারায়ণ। তাঁহার নাবালক কাল পর্য্যন্ত অভিভাবক নিয়োগ করিয়া রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা হইল। যে যুবক ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে রাঘোবার প্রতিপক্ষগণ জয়ী হইয়াছিল, তাঁহার নাম নানা ফড়নবীশ। ইনি পাণিপথের মহাযুদ্ধে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

নানা ফড়নবীশ

রাজ্য হইতে বিতাড়িত রঘুনাথ অবশেষে বোম্বাইএ ইংরেজদিগের শরণ লইলেন। বোম্বাইএর ইংরেজগণের মরাঠাদিগের সহিত শত্রুতা ছিল না। তাঁহারা কেবল রাজ্য-লোভেই রাঘোবার পক্ষাবলম্বন করিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে সন্ধি হইল, রাঘোবা ইংরেজদিগকে বোম্বাইএর নিকটস্থ সাল্‌সেটি ও বেসিন প্রদান করিতে এবং যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় বহনে সম্মত হইলেন।

সুরাটের সন্ধি

অতঃপর কর্ণেল কিটিং ক্ষুদ্র একদল সৈন্য লইয়া গুজরাটে প্রবেশ করেন। কিন্তু এই সময়ে কলিকাতার কর্তৃপক্ষ যুদ্ধে বাধা প্রদান করিলেন। হেষ্টিংস্ নিজে সুরাটের সন্ধি অনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকৃত সন্ধি উপেক্ষা করিয়া কর্ণেল আপ্‌টনকে পুণায় প্রেরণ করিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর নামক স্থানে আবার সন্ধি হইল। ইহা দ্বারা ইংরেজগণ সাল্‌সেটি পাইলে রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা বোম্বাইএর কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হইল না।

পুরন্দরের সন্ধি

তাঁহারা সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া রাঘোবাকে আশ্রয় দিলেন। এই সময় ডিরেক্টরগণ বোম্বাই সরকারের কার্য্য সমর্থন করিলেন, সুতরাং পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করা দূরে থাকুক, মরাঠাদিগের হাতে পরাজিত হইয়া ইংরেজ সেনাপতিকে অত্যন্ত অপমানজনক শর্ত্তে সন্ধি করিতে হইয়াছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াড়গাঁওএর চুক্তিতে ইংরেজগণ রাঘোবাকে মরাঠাদের হস্তে সমর্পণ করিতে এবং অধিকৃত স্থান সমূহ প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইহার পরেই ওয়াড়গাঁওএর চুক্তি অস্বীকার করিয়া ইংরেজেরা পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতি গডার্ডের অধীনে একদল সৈন্য মধ্যভারতের পথে পশ্চিম উপকূলে উপনীত হইল। গডার্ড প্রথমে কয়েকবার মরাঠাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও পুণার পথে পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি পপ্‌হাম সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিলেন। ইহার পরে মহাদাজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সলবইএর সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে রাঘোবাকে বার্ষিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা হইল, ইংরেজগণ মাধবরাও নারায়ণকেই পেশবা স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁহারা সাল্‌সেট লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সিন্ধিয়াকে অন্যত্র কিছু জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইল।

ওয়াড়গাঁওএর সন্ধি

সেনাপতি গডার্ড

সলবই সন্ধি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহিষ্‌র যুদ্ধঃ—১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে নিজাম বৃটিশের বিরুদ্ধে দক্ষিণের দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংঘবদ্ধ করিবার আয়োজন করিলেন। মরাঠাগণ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা সাগ্রহে নিজামের সহিত যোগদান করিলেন। হায়দর আলিও ইংরেজদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা ভুলিতে পারেন

নাই, সুতরাং তিনিও ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ইংরেজগণ মহিসূরের অধীনস্থ ফরাসী উপনিবেশ 'মাহে' অধিকার করায় হায়দর আলি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইউরোপে এই সময় ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং ভারতবর্ষের বৃটিশ সৈন্যদল ফরাসী উপ-নিবেশগুলি দখল করিলেন। হায়দর আলি বলিলেন যে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত মাহে অধিকার করিয়া ইংরেজগণ তাঁহার অপমান করিয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই নিজাম যুদ্ধে বিরত হইলেন, কিন্তু হায়দর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাকী অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি বেইলীর সৈন্যদলকে তিনি একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। অবশেষে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে পোর্টো নোভো নামক স্থানে হায়দর ইংরাজ সেনাপতি কুটের হস্তে পরাজিত হইলেন। ইহার পরে মহিষূর সৈন্য পুনরায় কর্ণেল ব্রেথওয়েটের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ফরাসী নৌ-সেনাপতি সাফ্রেন তাঁহার নৌ-বাহিনী লইয়া ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই বৎসরেই হায়দরের মৃত্যু হইল।

কারণ

ঘটনা

হায়দরের মৃত্যু

স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে হায়দর আলি ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বিরোধ বিসম্বাদে বিচ্ছিন্ন কু-শাসনপীড়িত ক্ষুদ্র মহিসূরকে তিনি ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ পরিশ্রমী

ভারতীয় ইতিহাসে হায়দরের স্থান

শাসনকর্ত্তার সহিত সাধারণের দেখা সাক্ষাতের বাধা ছিল না। লেখাপড়া না জানিলেও তিনি নিজেই শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি সাহসী, দূরদর্শী ও উৎসাহী সেনাপতি ছিলেন। হায়দর কখনও পরাজয়ে নিরাশ হন নাই। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন, বৃটিশের প্রতি তাঁহার মনোভাবে কোথাও অস্পষ্টতা ছিল না। আভ্যন্তরীণ শাসনের কঠোরতা সত্ত্বেও মহিষূরে তাঁহার নাম প্রশংসা ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইত।

টিপু স্থলতান ও মাঙ্গালোর সন্ধি

হায়দরের মৃত্যুতে সংগ্রামের অবসান হইল না। তাঁহার পুত্র টিপু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুস্‌কে সদলবলে বন্দী করেন। কিন্তু সেই বৎসরেই ইউরোপ হইতে শান্তির সংবাদ আসিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বন্দী বিনিময় ও পরস্পরের অধিকৃত রাজ্য প্রত্যর্পণের চুক্তিতে মাঙ্গালোরে ইংরেজ সরকারের সহিত টিপু স্থলতানের সন্ধি হয়।

হেষ্টিংসের আর্থিক অসুবিধা

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসরকাল ভারতে ইংরেজদিগকে আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠোর প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই সময় সামান্য একটি ভুল করিলেও তাহা মারাত্মক হইতে পারিত। সেই সঙ্কট সময়ে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দ্বারা হেষ্টিংস্ এই নবজাত শক্তিকে আসন্ন বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড তখন তাহার প্রাচীন শত্রু ফ্রান্স ও স্পেনের এবং আমেরিকার উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, সুতরাং ইংলণ্ড হইতে হেষ্টিংসের অর্থ অথবা সৈন্য সাহায্যের আশা ছিল না। এদিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধের ফলে বাংলার ধনভাণ্ডার শূন্যপ্রায়। সুতরাং যেমন করিয়া হউক অর্থসংগ্রহ করিতে না পারিলে

আর চলিতেছিল না। এই উৎকণ্ঠায় হেষ্টিংসের তখন আর ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ রহিল না।

বারাণসীর চৈৎসিংহ :—বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের প্রতি হেষ্টিংসের আচরণ অনাবশ্যক কঠোরতা ও অনুচিত রূঢ়তায় কলঙ্কিত।

পূর্ব্ব কথা

চৈৎসিংহ অযোধ্যার নবাবের অধীনে একজন করদ রাজা বা জমিদার ছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যের আধিপত্য কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। কোম্পানির সহিত তাঁহার এইরূপ চুক্তি হয় যে চৈৎসিংহ যে পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে কর দিবেন সে পর্য্যন্ত কোম্পানি কোন কারণে তাঁহার উপর অন্য কোন প্রকারের দাবি করিতে পারিবেন না, অথবা কাহাকেও তাঁহার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিতে কিংবা শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। তথাপি হেষ্টিংস্ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজার নিকট অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করিলে তিনি যথাসময়ে তাহা দিয়াছিলেন। ইহার পরে বার বার এইরূপ দাবি চলিতে লাগিল। অবশেষে হেষ্টিংস্ তাঁহাকে একদল অশ্বারোহী সৈন্য সরবরাহ করিতে বলিলেন। রাজা তদনুযায়ী ক্ষুদ্র একদল অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু হেষ্টিংস্ চৈৎসিংহের তথাকথিত শৈথিল্যের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা জরিমানা করিলেন। এই জরিমানা আদায়ের জন্য গবর্ণর জেনারেল নিজেই বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং চৈৎসিংহকে বন্দী করিলেন। রাজার এই অপমানে তাঁহার প্রজাপুঞ্জ ক্রুদ্ধ হইয়া কোম্পানির সিপাহীদিগকে হত্যা করিল। এই বিদ্রোহ সহজেই দমন হইয়াছিল। চৈৎসিংহ গোয়ালিয়রে পলায়ন করিলেন। বাৎসরিক চল্লিশ লক্ষ টাকা করদানের প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার রাজ্য তাঁহার একজন আত্মীয়কে দেওয়া হইল।

চৈৎসিংহের গ্রেপ্তার

বিদ্রোহ

অযোধ্যার বেগম ঃ—অযোধ্যার নবাবের রাজকোষের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া নবাব ইংরেজদিগকে তাঁহার প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে পারিতেছিলেন না। হেষ্টিংস্ যখন প্রাপ্য টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন নবাব বলিলেন তাঁহার মাতা ও পিতামহীর যে টাকা আছে তাহা না পাইলে তাঁহার পক্ষে ইংরেজের টাকা পরিশোধ করা অসম্ভব। হেষ্টিংস্ যে কেবল নবাবকে বেগমদিগের টাকা আদায় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন তাহা নহে, ঐজন্য ফৈজাবাদে একদল ইংরেজ সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছিলেন। অর্থের জন্য বেগমদিগের খোজা রক্ষীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল।

অযোধ্যার বেগমের কাহিনী

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের নূতন ভারতীয় আইন প্রবর্ত্তিত হইলে হেষ্টিংস্ আর ভারতবর্ষে থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পিটের ভারত আইন (১৭৮৪ খৃঃ) ঃ—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়াম পিটের উদ্যোগে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্টে এক নূতন ভারত আইন গৃহীত হয়। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ভারত-শাসন ক্ষমতা কোম্পানির নিকট হইতে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের হস্তে হস্তান্তরিত হয়। ভারতবর্ষের সামরিক ও অসামরিক সমুদয় ব্যাপারে কর্ত্তৃত্বভার একটি বোর্ডের উপর অর্পিত হয়। এই বোর্ড ছয়জন সভ্য লইয়া গঠিত হইল এবং বোর্ড অব কণ্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ্ নামে অভিহিত হইল। প্রকৃতপক্ষে বোর্ডের সভাপতিই সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের শাসনভার গবর্ণর জেনারেল ও তিনজন সদস্য সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র মন্ত্রণা সভার উপর অর্পিত হইল। তাঁহারা অধীনস্থ তিনটি প্রদেশের (বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই) যুদ্ধ, শান্তি, অর্থ ও বৈদেশিক ব্যাপারের

বোর্ড অব কণ্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ্

সমুদয় কার্য্যভার পরিচালনের জন্য দায়ী হইলেন। এইরূপে লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্টের কতকগুলি ত্রুটি দূর হইল এবং শাসন সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারও তাঁহাদের দায়িত্ব স্বীকার করিলেন।

হেষ্টিংসের বিচার :—স্বদেশে ফিরিবার পর পার্লামেণ্টে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কু-শাসনের অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। সুদীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া এই অভিযোগের বিচার চলিতে থাকে। কিন্তু বিচারে হেষ্টিংস্ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন। বিচারে অব্যাহতি পাইলেও এই অশান্তিতে তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া গেল এবং জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি নিভৃতে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হেষ্টিংসের চরিত্র :—হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব অদ্যাপি একেবারে লুপ্ত হয় নাই; সুতরাং তাঁহার মনুষ্যত্ব, রাজনীতি ও শাসন-প্রতিভা সম্পর্কে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা সহজ নহে। কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাকে সমর্থন করা কঠিন। রোহিলা যুদ্ধে এবং চৈৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদিগের ব্যাপারে তাঁহার আচরণ কখনই সমর্থন-যোগ্য নহে। মুর্শিদাবাদ পরিদর্শন কালে মণিবেগমের নিকট হইতে দেড় লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি যে তাঁহার চাকুরীর শর্ত্তভঙ্গ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হেষ্টিংসের শত্রুপক্ষের বিদ্বেষ যতই নিন্দার্হ হউক, পিট ও ডাণ্ডাসের ন্যায় ধীর ও বিচক্ষণ অমাত্যেরাও যে পার্লামেণ্টে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই, সে কথা ভুলিলে চলিবে না।

নিন্দনীয় কার্য্যাবলী

হেষ্টিংসের ঔদ্ধত্য ও অসহিষ্ণুতার ফলেই সম্ভবতঃ তাঁহার বিরুদ্ধ-পক্ষের আক্রোশ অত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে যে বহু অসুবিধা ও প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করিতে হইত তাহা

আবশ্যক। হেষ্টিংস্ অক্লান্ত পরিশ্রমী ও অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। তিনি নিজে যেমন বিদ্বান্ ছিলেন তেমনি অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। জনৈক লেখক তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "হেষ্টিংসের বঙ্গদেশের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। বাংলা ও ফার্সি ভাষায়ও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কোম্পানির অনুগত কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীরূপে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। রাজস্বের কাজে কিন্তু তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল না; তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন এ বিষয়ে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। শাসনকার্য্যে, জিলা সংগঠন ব্যাপারে তাঁহার যে উৎসাহ ও কর্ম্মকুশলতা দেখা যাইত তাহার তুলনায় রাজস্ব সম্পর্কে তাঁহার বন্দোবস্তের ফল বড়ই শোচনীয়।"

সার জন ম্যালকম তাঁহার বিরুদ্ধ-সমালোচক নহেন। তিনিও লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা তাঁহার একান্ত গুণগ্রাহী তাঁহারা হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত সততার প্রশংসা করিলেও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, তখনকার শাসন-পদ্ধতি নানা প্রকারে কলুষিত ছিল।"

ইতিহাসে হেষ্টিংসের স্থান

কিন্তু এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভারতের ইউরোপীয় রাজ-পুরুষগণের মধ্যে তিনি চিরদিনই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। জলপথে সাফ্রেন ও স্থলপথে মরাঠা, নিজাম ও হায়দর আলি কর্ত্তৃক ইংরেজগণ যখন আক্রান্ত, তখন তিনিই এদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। রবার্ট লর্ড ক্লাইভের ন্যায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্বদেশ-সেবাও চিরস্মরণীয়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ম্যাক্‌ফারসন্ হইতে ময়রা পর্য্যন্ত ভারতশাসকগণের বৃত্তান্ত ; মহিযূর ও মরাঠা সাম্রাজ্যের পতন

কর্ণওয়ালিস্ (১৭৮৬-৯৩ খৃঃ) ঃ—হেষ্টিংসের ভারতবর্ষ ত্যাগের পর কাউন্সিলের প্রবীণ সদস্য ম্যাক্‌ফারসন্ অস্থায়ীভাবে গবর্ণর জেনারেলের কাজ করেন।



কর্ণওয়ালিস্

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বড়লাট বা গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ-বংশজাত এবং সরল আচরণ ও সততার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে বৃটিশ কর্ম্মচারীদের সুনাম নানা কারণে নষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ প্রধানতঃ শাসন সংস্কারের জন্যই লর্ড কর্ণওয়ালিসের ন্যায় সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন। কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা হাতে থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাট অপেক্ষা তাঁহার কাজ অনেক সহজ হইয়াছিল। কাউন্সিলের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে তিনি নিজ

কর্ণওয়ালিসের কর্ম্ম সমস্যা

কর্ণওয়ালিসের সুবিধা

ইচ্ছামত কার্য্য করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। একাধারে তিনি প্রধান সেনাপতি ও গবর্ণর জেনারেলের কাজ করিতেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ভারত আইনে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিয়া ভারতীয় রাজ্যগুলির সহিত সদ্ভাব স্থাপনের নীতি অনুমোদিত হইয়াছিল, কিন্তু চারি বৎসর অতীত হইতে না হইতেই লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। এই যুদ্ধে কোম্পানির রাজ্য আরও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

কারণ

তৃতীয় ইঙ্গ-মহিষূর যুদ্ধ ঃ—কর্ণওয়ালিস্ নিজামের নিকট একখানি পত্রে ইংরেজের মিত্রগণের যে তালিকা দিয়াছিলেন, মহিষূরের নাম তাহাতে ছিল না। সুতরাং টিপু সুলতান স্বভাবতঃই ইংরেজদিগের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ইংরেজদের একজন পুরাতন মিত্র, সুতরাং টিপু যখন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন কর্ণওয়ালিস্ ইহাকে যুদ্ধ-ঘোষণা বলিয়াই ধরিয়া লইলেন। নিজাম ও মরাঠারা কেহই মহিষূরের শাসনকর্ত্তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না ; সুতরাং কর্ণওয়ালিসের সহিত তাঁহারাও টিপুর বিরুদ্ধে যোগদান করিলেন। তৎপর সমবেত মিত্রশক্তি মহিষূর আক্রমণ করিলেন কিন্তু শীঘ্র আশানুরূপ জয়লাভ করা সম্ভব হইল না। কর্ণওয়ালিস্ নিজে এই যুদ্ধ পরিচালনা করা সত্বেও ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে টিপু পরাজয় স্বীকার করেন নাই। অবশেষে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া টিপুকে সন্ধি করিতে হইল। ক্ষতিপূরণের টাকার জামীনস্বরূপ সুলতানের দুই পুত্রকে

ত্রিশক্তির সন্ধি

সন্ধি

গবর্ণর জেনারেলের শিবিরে পাঠাইতে হইয়াছিল। সন্ধির সর্ত্তানুসারে মহিষূর রাজ্যের যে অংশ পাওয়া গিয়াছিল তাহা মিত্রশক্তিত্রয় ভাগ করিয়া লইলেন।

শাসন-সংস্কারঃ—সামরিক গৌরব অপেক্ষা শাসন সংস্কারের জন্যই লর্ড কর্ণওয়ালিসের নাম ভারতীয় ইতিহাসে অধিকতর স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি দেখিলেন অল্প বেতনের কর্ম্মচারিগণ নানারূপ অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করেন। এই দুর্নীতি দূর করিবার জন্য তিনি কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। যে কোন প্রকারের অবৈধ উপার্জ্জন নিষিদ্ধ হইল। এইরূপে এক সঙ্গে কোম্পানির কর্ম্মচারীদের মর্য্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি এবং শাসনের কলঙ্ক দূর হইল, তৎসঙ্গে উপযুক্ত লোক নিয়োগেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দুর্নীতি প্রতিকার

শাসনের সুবিধার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস্ প্রত্যেক প্রদেশকে কতকগুলি জিলায় বিভক্ত করিলেন। অপরাধীর শাস্তিদানের কতকগুলি আদিম বর্ব্বর প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে দেশের প্রচলিত পুরাতন আইনে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। তিনি রাজস্ব ও বিচার বিভাগ পৃথক্ করিয়া দিলেন এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের জন্য স্বতন্ত্র আদালত স্থাপন করিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত পূর্ব্বের ন্যায় দুই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ আদালত রহিয়া গেল। দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য একজন বৃটিশ জজ ও তাঁহার সাহায্যের জন্য একজন হিন্দু পণ্ডিত ও একজন মুসলমান কাজি লইয়া প্রত্যেক জিলায় জিলা আদালত গঠিত হইল। জিলা আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের মাঝামাঝি চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয় স্থাপিত

জিলার শাসন-সংস্কার

আইন অদালত

হইয়াছিল। প্রাদেশিক বিচারালয়গুলিতে তিনজন করিয়া বৃটিশ জজ থাকিতেন। তাঁহাদের সাহায্যার্থে হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ কয়েকজন দেশীয় কর্ম্মচারী থাকিতেন। এই চারিটি প্রাদেশিক আদালতের বিচারকগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন জিলার ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন।

কলেক্টর

কলেক্টর বা রাজস্ব সংগ্রাহকগণের বিচার-ব্যাপারে কোনও ক্ষমতা ছিল না। পুলিশ বিভাগ জিলা কোর্টের জজের অধীনে পরিচালিত হইত। জিলার জজকেই ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশের কার্য্যের সুবিধার্থে প্রত্যেক জিলা কতকগুলি থানা বা পুলিশ কেন্দ্রে বিভক্ত হইল।

থানা ও দারোগা

কর্ণওয়ালিস্ ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করিতেন না এবং তাহাদিগকে কখনও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন নাই। কিন্তু উপযুক্ত বৃটিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বেশি ছিল না। তিনি যে সকল শাসন-সংস্কার করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তাহার অনেকগুলি পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ভূমিকর-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা এখনও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও বারাণসীতে প্রচলিত রহিয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ—কর্ণওয়ালিস্ যখন শাসনভার গ্রহণ করেন তখন বাংলার ভূমিকরের ব্যবস্থা বড়ই বিশৃঙ্খল ছিল। তখনও সরকারী কর্ম্মচারীরা কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন না। জমিদারদিগের জমির উপর কোনও স্থায়ী স্বত্ব ছিল না। যে অধিক খাজনা দিতে সম্মত হইত তাহাকেই নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হইত। নূতন জমিদার অল্পকালের মধ্যে বেশি লাভ করিয়া লইবার জন্য প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করিয়া অর্থ আদায় করিতেন। সুতরাং ইহাতে কৃষকদের

রাজস্ব আদায়ের পূর্ব্ব প্রথা

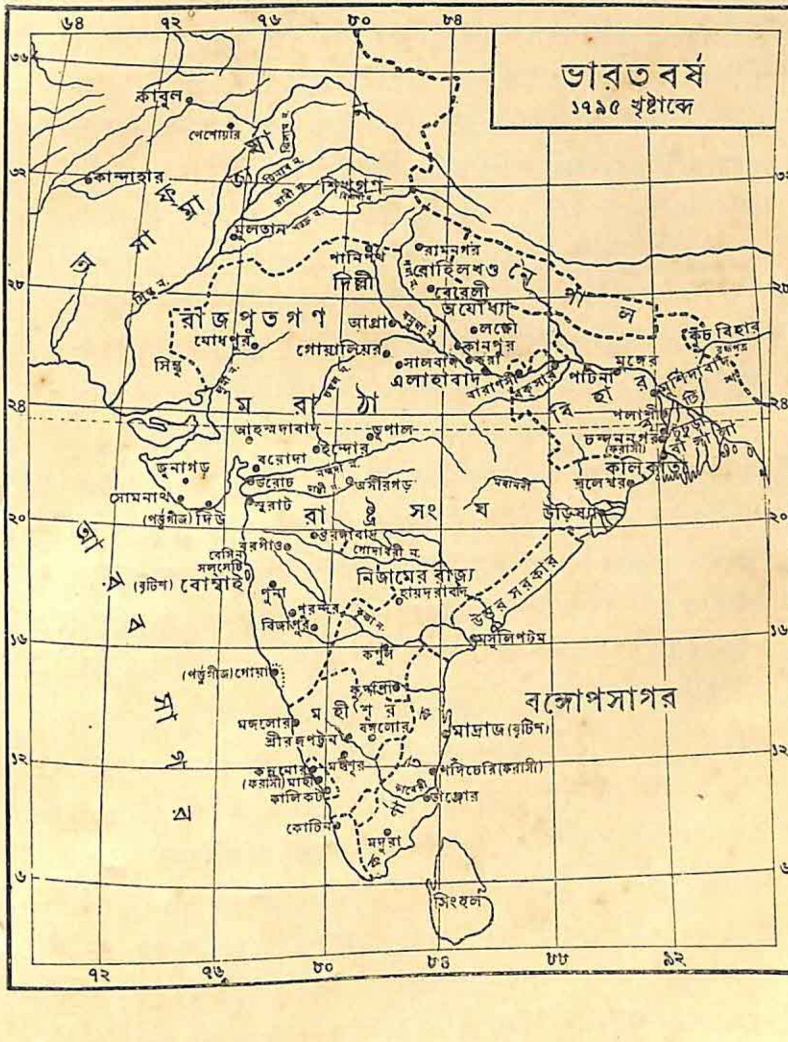
দোষ-ত্রুটি

দুরবস্থার সীমা ছিল না। জমিদারের অত্যাচারে অনেক সময় কৃষিক্ষেত্র অকর্ষিত পড়িয়া থাকিত। ইহার ফলে জমির মূল্য কমিয়া যাইতে লাগিল। কেবল তাহাই নহে—দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোভীর দল অসম্ভব রাজস্ব দানের প্রতিশ্রুতিতে জমিদারী ইজারা লইত, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা দিয়া উঠিতে পারিত না। সুতরাং প্রতি বৎসর কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইবে, তাহারও কোন স্থিরতা ছিল না। গবর্ণমেণ্টের প্রধান আয় ভূমিকর, তাহাতে এইরূপ অনিশ্চয়তা থাকিলে শাসন পরিচালনে নানারূপ বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ইংলণ্ডের জমিদারবংশের লোক ছিলেন, তাঁহার নিজের দেশে জমিদারগণ জমির বংশগত মালিক। সুতরাং বাংলাদেশেও তিনি সেই প্রথা উপযোগী হইবে মনে করিয়া জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) করিতে চাহিলেন। তিনি প্রত্যেক জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য স্থির করিয়া দিলেন, এবং যতকাল নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সময় মত দেওয়া হইবে ততকাল জমিদারগণের স্বত্ব অব্যাহত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-গুণ :—কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-গুণ সম্পর্কে অনেক মতভেদ আছে। এই প্রথা যে একেবারে ত্রুটীহীন নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা জমিদারগণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় নাই। কৃষকের পরিশ্রমলব্ধ লাভের অংশ এবং বাজার দরের তারতম্যে যে

প্রজা অপেক্ষা জমিদারের সুবিধা


ভারতবর্ষ
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে
কাবুল
পেশোয়ার
কান্দাহার
মুলতান
শিখগণ
পানিপথ
দিল্লী
রামনগর
রোহিলখণ্ড
বেরেলী
অযোধ্যা
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
আগ্রা
রাজপুতগণ
যোধপুর
গোয়ালিয়র
সিন্ধু
এলাহাবাদ
বারাণসী
বক্সার
পাটনা
মুঙ্গের
কুচবিহার
মুর্শিদাবাদ
পলাশী
চন্দননগর
(ফরাসী)
কলিকাতা
বালেশ্বর
আহমদাবাদ
ভূপাল
ইন্দোর
বরোদা
জুনাগড়
ভরোচ
অসীরগড়
সোমনাথ
সুরাট
(পর্তুগীজ) দিউ
উড়িষ্যা
ঔরঙ্গাবাদ
গোদাবরী ন.
নিজামের রাজ্য
হায়দরাবাদ
(বৃটিশ) বোম্বাই
পুনা
বিজাপুর
মসুলিপটম
কর্ণুল
(পর্তুগীজ) গোয়া
বঙ্গোপসাগর
মঙ্গলোর
শ্রীরঙ্গপট্টন
বঙ্গলোর
মাদ্রাজ (বৃটিশ)
পণ্ডিচেরি (ফরাসী)
(ফরাসী) মাহী
কালিকট
তাঞ্জোর
কোচিন
মদুরা
সিংহল
৬৪
৭২
৭৬
৮০
৮৪
৮৮
৯২
৩৬
৩২
২৮
২৪
২০
১৬
১২
৮

লাভ হইত তাহা জমিদারেরা বিনা চেষ্টায় বিনা অর্থব্যয়ে পাইয়া থাকিতেন। এদিকে গবর্ণমেণ্ট জমিদারী বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না বলিয়া অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য অন্যান্য শ্রেণীর লোক-দিগকে নানাপ্রকার কর দিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রথম প্রথম জমিদার সম্প্রদায় এই ব্যবস্থায় বিশেষ উপকৃত হন নাই। নূতন আইনের অর্থ বুঝিতে না পারায় যথাসময়ে অনেকেরই খাজনা বাকী পড়ে, সুতরাং তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে নূতন আইন দ্বারা প্রজার স্বার্থ বহুপ্রকারে রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। মোটের উপর অন্যান্য প্রদেশের প্রজা অপেক্ষা বাংলার প্রজাপুঞ্জের অবস্থা অনেকটা ভাল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বঙ্গদেশে প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় রাজস্বের পরিমাণ অনেকটা স্থির হইয়া গেল। সে সময় প্রয়োজন হইলেই বাংলার রাজস্ব দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজকে সাহায্য করিতে হইত, সুতরাং কর্ণওয়ালিসের এই বন্দোবস্তে কোম্পানির কম সুবিধা হয় নাই।

পরবর্ত্তী উন্নতি

নূতন সনন্দঃ—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আরও ২০ বৎসরের জন্য ইংলণ্ডের সরকারের নিকট হইতে নূতন সনন্দ পাইলেন। ভারতীয় ব্যবসায়ে তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল। কেবল সাধারণ ইংরেজ ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর ৩০০০ টন ওজনের মাল চালান দিবার অনুমতি পাইলেন। কর্ণওয়ালিসের সমর্থন ব্যতিরেকে এই সময়ে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিত কিনা সন্দেহ।

সনন্দের মিয়াদ বৃদ্ধি

কর্ণওয়ালিসের চরিত্রঃ—কর্ণওয়ালিস্ অসাধারণ প্রতিভাবান্ পুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন নাই, তাঁহার সততা ও শাসন-সংস্কারের

আন্তরিকতা দ্বারাই তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। উৎকোচ ও অন্যান্য দুর্নীতি রহিত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের প্রতিভায় যাহা সম্ভব হয় নাই, কর্ণওয়ালিসের নির্ম্মল সততায় তাহা অনেক পরিমাণে সম্ভব হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয়।

কর্ণওয়ালিসের কৃতিত্ব

সার জন শোর (১৭৯৩-৯৮ খৃঃ) ঃ—লর্ড কর্ণওয়ালিসের পরে কোম্পানির অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী সার জন শোর গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ তিনি গবর্ণর জেনারেলের পদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্যে তিনি তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। গুরুতর রাজনৈতিক প্রয়োজনেও তিনি পিটের ভারত সম্বন্ধীয় আইনের নির্দ্দেশ অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। দেশীয় রাজন্যবর্গের কলহ বিবাদে তিনি হস্তক্ষেপ না করিয়া ঔদাসীন্য নীতি (Policy of Non-intervention) অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবশ্য কখনও যে তিনি এই নীতির অন্যথা করেন নাই, এমন নহে। কোম্পানির অনুগত মিত্র অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তিনি নবাবের অন্তিম ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করেন, এবং নবাবের ভ্রাতা সাদত আলির সহিত নূতন ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকেই নবাব ঘোষণা করেন। সাদত আলি ইংরেজদিগকে এলাহাবাদ ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে শান্তিপ্রিয় শোরের আমলেও ভারতে বৃটিশ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঔদাসীন্য নীতি

অযোধ্যার নবাবের সহিত নূতন সন্ধি

মরাঠা সাম্রাজ্য ঃ—মরাঠাগণ যখন হীনবল নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তখন সার জন শোর উদাসীন ছিলেন বলিয়া তাঁহার

তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। সলবইএর সন্ধিতে মহাদাজী সিন্ধিয়া উত্তর ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দুর্ব্বল বাদশাহকে তিনি যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া অতি শীঘ্রই হিন্দুস্থানে একটি নূতন মরাঠা সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। মহাদাজী সিন্ধিয়া ইউরোপের নানা দেশ হইতে আগত ভাগ্যান্বেষী সৈনিকদিগকে লইয়া শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। তিনি মরাঠাদিগের প্রাচীন যুদ্ধ-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নূতন ব্যবস্থার ফলে তিনি তাঁহার মুসলমান ও হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীকে শীঘ্রই পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ নানা ফড়নবীশ পুণা শাসন করিতেছিলেন। মহাদাজী তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী লইয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন। মুখে বলিলেন নবীন পেশবাকে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যই তিনি পুণায় যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশী হোলকরের সহিত মহাদাজীর কর্ম্মচারীদের বিরোধ বাধিল। তারপর দুই দলে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে সিন্ধিয়ার শিক্ষিত সেনাদলের নিকট হোলকর পরাজিত হইলেন। কিন্তু দক্ষিণাপথে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্ব্বেই ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ মহাদাজীর মৃত্যু হয়। তাহার পরে তাঁহার দত্তক পুত্র দৌলতরাও মহাদাজীর বিশাল রাজ্য ও বিরাট সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। ইহার এক বৎসর পরে মলহর রাও হোলকরের পুত্রবধূ অহল্যাবাইএর মৃত্যু হইলে তুকোজী হোলকর ইন্দোরের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তুকোজী একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার কুশলতা ছিল না বলিলেই চলে।

মহাদাজী সিন্ধিয়ার উত্তর বিজয়

হোলকরের সহিত সংঘর্ষ

নিজাম ও মরাঠাগণ ঃ—মহাদাজীর মৃত্যুর পরে নানা ফড়নবীশের

আর তেমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। মরাঠা সাম্রাজ্যে সে সময়ে তাঁহার মত প্রভাব আর কাহারও ছিল না। নিজামের সহিত পেশবার বহুদিন হইতেই মনোমালিন্য চলিতেছিল। যদিও তৃতীয় পক্ষের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য এই দুই শক্তি কখনও কখনও মিলিত হইতেন, তথাপি তাঁহাদের পুরাতন অনৈক্য কিছুতেই দূর হয় নাই। মরাঠাগণ 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী'র দাবি লইয়া যে কোনও সময়ে নিজামের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিতে পারিতেন। মরাঠাগণ বলেন যে এই সময়ে নিজামই যুদ্ধের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরেজগণ বলেন, নানা ফড়নবীশের অসীম ক্ষমতা-লিপ্সাই এই সংগ্রামের প্রধান কারণ। খর্ডা নামক স্থানে সম্মিলিত মরাঠা সৈন্যের নিকট নিজাম সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন (১৭৯৫ খৃঃ)। পরাজিত নিজামকে প্রায় অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে হইল। বড়লাট শোর যদি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ফল হয়ত অন্যরূপ হইত।

খর্ডা বা কুর্দ্দালার যুদ্ধ

পুণায় গোলমালঃ—খর্ডার যুদ্ধে নিজামের শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তিনি আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। তরুণ পেশবা মাধবরাও নারায়ণ, নানা ফড়নবীশের কঠোর অভিভাবকত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশবা হইলেন, কিন্তু তিনি যেমন দুর্ব্বল তেমনি দুষ্টপ্রকৃতি ছিলেন। মরাঠা সাম্রাজ্যের পতনের পথ তিনি পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি (১৭৯৮-১৮০৫ খৃঃ)ঃ—১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সার জন শোর কর্ম্মত্যাগ করিলে আর্ল মর্ণিংটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। মার্কুইস্ ওয়েলেস্‌লি নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি যখন বৃটিশ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন

ফরাসীদিগের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ করাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। পেশবা, সিন্ধিয়া, হোল্‌কর এবং নিজাম ইঁহাদের সকলেরই ফরাসী কর্ম্মচারী পরিচালিত শক্তিশালী সেনাদল ছিল এবং মহিষূরের টিপু সুলতানও ফরাসীগণতন্ত্রের একজন প্রধান মিত্র ছিলেন। দেশীয় সৈন্যদলে ফরাসী প্রভাব বিনষ্ট করিয়া বৃটিশ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য লর্ড ওয়েলেস্‌লি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং বশ্যতামূলক মৈত্রীর (Subsidiary Alliance) সাহায্যে তিনি এই সঙ্কল্প সাধনে উদ্যোগী হইলেন।

ওয়েলেস্‌লির লক্ষ্য

তাঁহার এই নূতন নীতি যেমন স্পষ্ট তেমনি সরল। এই ব্যবস্থা অনুসারে বৃটিশ সরকার ভারতীয় মিত্রদিগের রাজ্য বহিঃশত্রু ও গৃহশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক আশ্রিত রাজ্যে বৃটিশ সৈন্য রাখিবার বাবস্থা হইল এবং ইহাদের সর্ব্ববিধ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রত্যেক আশ্রিত রাজাকে তাঁহার রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। বশ্যতামূলক মৈত্রীর চুক্তি অনুসারে আশ্রিত রাজাদের কোন বিদেশী শক্তির সহিত সন্ধি বিগ্রহের স্বাধীনতা রহিল না। স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি পাইলেন। অত্যন্ত দুর্ব্বল রাজা ব্যতীত কেহই স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারেন না। তাই হীনবল নিজাম সর্ব্বপ্রথমে এই অধীনতামূলক মিত্রতায় সম্মত হইলেন।

অধীনতামূলক মিত্রতা

মহিষূরের পতন :—মহিষূরে টিপু সুলতানের সহিত এই সময় মরিসাস দ্বীপের ফরাসী শাসনকর্ত্তার পত্রালাপ চলিতেছে জানিয়া ওয়েলেস্‌লি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নিজামের পন্থা

অবলম্বন করিয়া টিপু বৃটিশের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেই তাঁহার রাজ্যরক্ষা হইত, কিন্তু তিনি অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষাকল্পে বীরের মত যুদ্ধ করিয়া টিপু সুলতান দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে মহিষূরে মুশ্লিম রাজত্ব বিলুপ্ত হইল।

শ্রীরঙ্গপত্তনের পতন ও টিপুর মৃত্যু

টিপুর চরিত্র ঃ—টিপু সুলতান একাধারে বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি সাহসী, বীর, ন্যায়নিষ্ঠ নরপতি এবং অক্লান্তকর্ম্মা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেকালের রাজাদের ব্যক্তিগত জীবনের কলঙ্ক-কলুষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। নির্ম্মল চরিত্র ও পবিত্র জীবনের আদর্শই তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিত। তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না। বৈদেশিক রাজনীতি পর্য্যালোচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার সমকালীন ভারতীয় নৃপতিগণ অপেক্ষা তাঁহার আসন অনেক উর্দ্ধে। ফ্রান্স ও তুরুষ্ক দেশে তিনি দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আফগানিস্থানের জামান শাহের সহিত তাঁহার পত্রালাপ ছিল। তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন ইংরেজ লেখক তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার জনপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অনেকে আবার তাঁহাকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী, ধর্ম্মান্ধ ও অনুদার রাজা বলিয়া মনে করেন। মাঝে মাঝে উগ্র প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেলেও টিপু স্বভাবতঃ নির্দ্দয় ছিলেন না। মুসলমান ধর্ম্মানুরাগী হইয়াও তিনি হিন্দু মন্দির সংস্কারে অর্থদান করিয়াছেন, কিন্তু পিতার ন্যায় তাঁহার রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি অথবা সূক্ষ্ম বিবেচনা ছিল না। সংস্কারের নামে অনেক সময়েই তিনি অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন সাধনে মত্ত হইতেন। কতকটা উদ্ধত প্রকৃতির বলিয়া পরাজয় স্বীকার তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইত, তাই

স্বাধীনতা ত্যাগের পরিবর্ত্তে জীবন বিসর্জ্জনই তিনি শ্রেয় বলি মনে করিয়াছিলেন।

মহিষূর বিভাগ ঃ—টিপুর মৃত্যুর পরে মহিষুরের উপকূল প্রদেশ ইংরেজগণ অধিকার করিয়া লইলেন। নিজামের রাজ্য-সন্নিহিত স্থান সমূহ তাঁহাকে দেওয়া হইল। অবশিষ্ট অংশে প্রাচীন হিন্দুবংশের একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। কিন্তু নিজামের অংশ কার্য্যতঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিল। মহিষুর এখনও চারিদিকে বৃটিশ রাজ্য পরিবেষ্টিত।

পুরাতন হিন্দুবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

অন্যান্য রাজ্যাধিকার ঃ—পিটের ভারত আইনে স্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল যে ভারতবর্ষে আর রাজ্য বিস্তার করা হইবে না। কিন্তু ওয়েলেস্‌লির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বৃটিশ প্রভুত্ব বিস্তারে শাসক ও শাসিত উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। এইজন্য নূতন রাজ্য অধিকারের সুযোগ তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সুরাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজাকে পেন্সন দিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করা হইল। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটকের নবাব ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁহার রাজ্য হারাইলেন। অযোধ্যা রাজ্যের আয়তনও কমাইয়া দেওয়া হইল। সার জন শোরের মনোনীত নবাব সাদত আলির বিরুদ্ধে কু-শাসনের অভিযোগ সত্ত্বেও তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল না। তাঁহার নিকট হইতে দোয়াব নামে প্রসিদ্ধ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমৃদ্ধ প্রদেশ গ্রহণ করা হইল। সেই সঙ্গে বর্ত্তমান গোরক্ষপুর ও রোহিলখণ্ড বিভাগও ইংরেজের হস্তগত হইল।

সুরাট ও তাঞ্জোর

কর্ণাটক ও অযোধ্যা

মিশর ও পারস্য ঃ—ওয়েলেস্‌লি প্রাচ্যদেশে ফরাসী প্রভাব খর্ব্ব

করিবার অভিপ্রায়ে পারস্যের শাহের দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত শান্তি স্থাপিত হইলেও ওয়েলেস্‌লি ভারতবর্ষের ফরাসী উপনিবেশ কয়েকটি ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহার ফলে আবার যখন এই দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন আর ভারতবর্ষে ফরাসীদের দাঁড়াইবার জায়গাও রহিল না।

ফরাসী প্রভাব বিনাশ

মরাঠা সাম্রাজ্য :—মরাঠা সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের মৃত্যুর সঙ্গে মরাঠা রাজ্যের সৌভাগ্য অন্তর্হিত হইল। মরাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিভাবান্ নায়কেরা একে একে প্রায় সকলেই গত হইয়াছিলেন। মহাদাজী সিন্ধিয়া, মলহররাও হোলকর এই সময় জীবিত ছিলেন না। তাঁহাদের বংশধরগণ গৃহবিবাদে শক্তি ক্ষয় করিতে লাগিলেন। ইন্দোর সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে দৌলতরাও সিন্ধিয়া তথায় আপনার প্রভুত্ব স্থাপনের সুযোগ পাইলেন। কিন্তু তুকোজীর পুত্র যশোবন্তরাও হোলকর অত্যল্প কালের মধ্যে তাঁহার বংশের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং শীঘ্রই সিন্ধিয়া ও হোলকরের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ আরম্ভ হইল।

নানা ফড়নবীশের মৃত্যু

যশোবন্তরাও হোলকর

বেসিনের সন্ধি :—ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা দুর্ব্বল পেশবা মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তুলিলেন। যশোবন্তরাওএর ভ্রাতৃহত্যার প্রতিহিংসা লইবার জন্য যশোবন্ত সসৈন্যে দক্ষিণ আক্রমণ করেন এবং সিন্ধিয়া ও পেশবার সম্মিলিত সৈন্যদলকে পুণার অনতিদূরে পরাজিত করেন। বাজীরাও রাজধানী হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। তখন যশোবন্তরাও

বাজীরাওএর পলায়ন

বিনায়করাওকে* পেশবার মস্‌নদে অভিষিক্ত করেন। বাজীরাও এতকাল লর্ড ওয়েলেস্‌লির আনুগত্যমূলক মিত্রতা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু এবারে দেখিলেন বৃটিশের শরণ গ্রহণ ব্যতীত তাঁহার উপায়ান্তর নাই। তাই ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধি-সূত্রে পেশবা বৃটিশের অধীনস্থ মিত্র হইলেন এবং একদল বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যে পুণায় ফিরিয়া গিয়া পুনরায় পেশবাপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। পরাক্রান্ত মরাঠা সর্দ্দারগণ বৃটিশ প্রভুত্ব স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা প্রকাশ্যে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অপদার্থ পেশবা শীঘ্রই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গোপনে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট সময়েও মরাঠা সর্দ্দারগণ সম্মিলিতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিলেন না। সিন্ধিয়া ও বেরারের ভোঁসলা-বংশীয় রাজা যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, হোলকর তখনও নিরপেক্ষ ছিলেন। অবশেষে যখন তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বৃটিশ সৈন্যের নিকট সিন্ধিয়া ও বেরারের রাজা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছেন।

বৃটিশের বিরুদ্ধে মরাঠা নৃপতিগণের সংগ্রাম

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ (১৮০৩-১৮০৫ খৃঃ):—ওয়েলেস্‌লি সংগ্রামের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। বেসিনের সন্ধির ফলে ইংরেজদের অনেকগুলি সুবিধা হইয়াছিল। গবর্ণর জেনারেলের ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেস্‌লির নেতৃত্বে একদল শক্তিশালী বৃটিশ সৈন্য পূর্ব্বেই পেশবার রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল। লর্ড লেকের নেতৃত্বে অপর এক দল সৈন্য উত্তর ভারতে সিন্ধিয়ার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। সিন্ধিয়ার অধীনস্থ

আর্থার ওয়েলেস্‌লি

লেক্‌

* রাঘোবার পোষ্য পুত্র অমৃতরাওএর পুত্র।

ইউরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার নেতৃহীন শিক্ষিত সেনাবাহিনী বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। আর্থার ওয়েলেস্‌লি আসাই নামক স্থানে সিন্ধিয়া ও বেরার-নাগপুর রাজ ভোঁসলার সম্মিলিত সৈন্যদলকে পরাভূত করেন। ভোঁসলার বাহিনী আরগাঁওএ পুনরায় পরাজিত হইল। ইতিমধ্যে দিল্লী ও আগ্রা সিন্ধিয়ার হস্তচ্যুত হইল এবং উত্তরভারতে তাঁহার সৈন্যদল দিল্লী ও লাসোয়ারীতে লেক্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। তখন আর শান্তি স্থাপন করা ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর রহিল না। দেবগাঁওএর সন্ধিতে নাগপুরের রাজা ইংরেজের হাতে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিয়া অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন। সিন্ধিয়াও ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সুরজী অঞ্জনগাঁওএ সন্ধি করিলেন। ইংরেজদিগের সহিত সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ নিজাম বেরার প্রদেশ ও আহম্মদনগর পাইলেন। পাঁচ মাসের যুদ্ধে বিরাট মরাঠা সাম্রাজ্য বৃটিশের পদানত হইল।

আসাই

আরগাঁও

লাসোয়ারী

দেবগাঁওএর সন্ধি

সুরজী অঞ্জনগাঁওএর সন্ধি

যশোবন্তরাও হোলকর এতদিন যুদ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এইবারে তিনি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইলেন। মরাঠাদের পুরাতন রণনীতি অবলম্বন করিয়া তিনি কর্ণেল মন্‌সনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই দীগের যুদ্ধে তাঁহার ভাগ্য বিপর্য্যয় হইল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সেনাপতি লেক্ যখন ভরতপুর দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন

হোলকর

দীগের যুদ্ধ

না তখন মরাঠাদের মধ্যে আবার একটু আশার সঞ্চার হইল। যাহা হউক ভরতপুরের রাজা বৃটিশের সহিত সন্ধি করিলেন এবং ওয়েলেস্‌লির ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার পরে বৃটিশ নীতি পরিবর্ত্তনের ফলে হোলকরও কোনক্রমে নিশ্চিত বিনাশ হইতে রক্ষা পাইলেন।

ভরতপুর অবরোধ

লর্ড ওয়েলেস্‌লির স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন :—ওয়েলেস্‌লির নীতির ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার হইলেও কোম্পানির অজস্র অর্থব্যয় হইতে লাগিল। সুতরাং বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণর জেনারেলের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুমোদন করিলেন না। যখন মন্‌সনের পলায়ন এবং ভরতপুরে লর্ড লেকের পরাজয়ের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিল, তখনই তাঁহার প্রতি স্বদেশে ফিরিবার আদেশ প্রেরিত হইল।

ওয়েলেস্‌লির সাফল্য :—ভারতবর্ষ শাসনে লর্ড ওয়েলেস্‌লি অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মহিষুর রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং মরাঠাশক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাইভ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সেই সাম্রাজ্য আশু বিনাশ হইতে রক্ষা করেন, এবং ওয়েলেস্‌লি তাহার পরিসর বৃদ্ধি করেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি অনেক সময়ই উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিতেন কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে তাঁহার কার্য্যই ঠিক হইতেছে, তাঁহার উপরওয়ালাদের আদেশ ঠিক নহে। যদিও যুদ্ধ এবং কূট রাজনীতি লইয়া তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি শাসন-সমস্যা সম্পর্কেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত যে একটি বিশাল দেশ শাসন সম্ভব নহে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং

বৃটিশ-প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত

সিভিলিয়ানদিগের শিক্ষাদানের জন্য তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহারই পরামর্শক্রমে ইংলণ্ডেও বৃটিশ কর্ম্মচারীদিগের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপিত হইল। যে সকল ইংরেজ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ওয়েলেস্‌লির নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ (১৮০৫ খৃঃ) ঃ—যুদ্ধ বিগ্রহের কুফল দূর করিয়া ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপনের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে পুনরায় ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিবার তিন মাস পরেই গাজিপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে কাউন্সিলের প্রবীণ সদস্য সার জর্জ্জ বার্লো অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।

কর্ণওয়ালিসের মৃত্যু

সার জর্জ্জ বার্লো (১৮০৫-১৮০৭ খৃঃ) ঃ—বার্লো কর্ণওয়ালিসের নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং হোলকরের সহিত অতিশয় উদার শর্ত্তে সন্ধি করিলেন। পরাজিত মরাঠা সর্দ্দার যে কেবল শুধু তাঁহার হৃত রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন তাহা নহে, রাজপুতানায়ও তাঁহার প্রাধান্য ও অধিকার অব্যাহত রহিল। বিগত যুদ্ধে রাজপুত রাজগণ ইংরেজদের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদিগকে পুনরায় হোলকরের কবলে ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত হয় নাই।

হোলকরের সহিত সন্ধি

লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৩ খৃঃ) ঃ—১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইবার পূর্ব্বে লর্ড মিণ্টো বিলাতের বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া তিনি এই নূতন পদ গ্রহণ করেন। ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে শান্তির নীতি অবলম্বন করিতে বলিলেন। সে সময় ইংরেজগণ ফরাসীদের আশঙ্কায় সর্ব্বদাই ত্রস্ত থাকিতেন এবং

ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতিতে এই ভীতির পরিচয় পাওয়া যাইত।

আফগানিস্থান ও পারস্যে দূত প্রেরণ

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নূতন গবর্ণর জেনারেল পারস্থ ও আফগানিস্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বৃটিশ দূত আফগানিস্থানের রাজধানীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ে কাবুলের অভিযান ব্যর্থ হয়। পারস্থে প্রেরিত দূতগণের চেষ্টাও সফল হইল না। কাবুল ও পারস্থের দৌত্য ব্যর্থ হইলেও মিণ্টো লাহোরের শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত যে সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

রণজিৎ সিংহ ঃ—১৭৯২ খৃষ্টাব্দে যখন রণজিতের পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়স মাত্র বারো বৎসর। আহম্মদ শাহের মৃত্যুর



রণজিৎ সিংহ

পূর্ব্বকথা

কিয়ৎকাল পরে তাঁহার পৌত্র জমান শাহ কাবুল ও পঞ্জাবে পিতামহের অধিকার প্রাপ্ত হন। রণজিৎ তাঁহার সাহায্য করিলে জমান শাহ প্রীত হইয়া রাজা উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকেই লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। রণজিৎ তখন মাত্র ১৯ বৎসরের যুবক। শিখগণ এই সময় বিভিন্ন দল বা 'মিস্‌ল'এ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্জাবে তখন শান্তি অথবা শৃঙ্খলা ছিল না। রণজিৎ সিংহ দেখিলেন নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার ইহাই সর্ব্বোত্তম সুযোগ। ইহার অনতিকাল পরেই তিনি আফ্‌গান

প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া ক্রমশঃ পঞ্জাব ও কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার করেন। সৈন্যদিগকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত তিনি সুদক্ষ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ইংরেজদিগের নিকট বাধা না পাইলে শতদ্রু নদীর দক্ষিণেও তাঁহার প্রাধান্য স্থাপিত হইত। এই সময় স্থানীয় গোলযোগের এক সুযোগে রণজিৎ লুধিয়ানা অধিকার করিয়াছিলেন। শতদ্রুর এপারের শিখ রাজগণ তাঁহার ভয়ে বৃটিশের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। লর্ড মিণ্টো চার্লস্ মেটকাফকে রণজিতের দরবারে প্রেরণ করেন এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে ইংরেজদের সহিত লাহোররাজের 'মৈত্রী' স্থাপিত হইল। শতদ্রুর দক্ষিণ তীরের শিখদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া রণজিৎ প্রতিশ্রুতি দিলেন। লুধিয়ানায় বৃটিশ সেনা-নিবাস স্থাপিত হইল। এমনি করিয়া শতদ্রুর তীর পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রভাব বিস্তৃত হইল।

লুধিয়ানা অধিকার

'চির-মৈত্রী' সন্ধি

সামুদ্রিক অভিযানঃ—১৮১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী অধিকৃত মরিসাস ও বুরবন দ্বীপ আক্রমণ করা হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যকেন্দ্র যবদ্বীপ ইংরেজদের হস্তগত হয়। গবর্ণর জেনারেল নিজেই এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধশেষে একমাত্র মরিসাস ব্যতীত অপর সব দ্বীপগুলিই পূর্ব্ব মালিকদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল।

মরিসাস, বুরবন ও যবদ্বীপ

পুনরায় সনন্দ লাভঃ—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আবার নূতন সনন্দ পাইলেন। ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায় রহিত হইল, কিন্তু চীনে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার আরও কিছুকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার অবসান

লর্ড ময়রা (১৮১৩-২৩ খৃঃ) :—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আর্ল মিণ্টোর পরে আর্ল অব্ ময়রা ভারতে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ইতিহাসে তিনি মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস্ বা লর্ড হেষ্টিংস্ নামেই অধিক পরিচিত। নূতন গবর্ণর জেনারেল নিজেই একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, এবং ওয়েলেস্‌লির কাজ তিনিই সমাপ্ত করেন। কিন্তু মরাঠাদিগের সহিত সংঘর্ষের পূর্ব্বে তাঁহাকে হিমালয়ের দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

ইঙ্গ-গুর্খা যুদ্ধ (১৮১৪-১৬ খৃঃ) :—ক্লাইভের পলাশী বিজয়ের কিছুকাল পরেই পৃথ্বীনারায়ণের নেতৃত্বে গুর্খাগণ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নেপাল উপত্যকা ও কাটমণ্ডু অধিকার করিয়াছিলেন। ক্রমে গুর্খারাজ্যের দক্ষিণ সীমা আসিয়া বৃটিশ ভারতের উত্তর সীমান্ত রেখার সহিত মিলিত হইল। এই সীমানা সুনির্দ্দিষ্ট না থাকায় গুর্খাগণ অনেক সময়েই ইংরেজ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস্ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

গুর্খাশক্তির অভ্যুত্থান

গবর্ণর জেনারেল নিজেই এই যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং চারিটি বিভিন্ন স্থান হইতে একই সময়ে গুর্খারাজ্য আক্রান্ত হয়। গুর্খাসেনাপতি অমর সিং থাপা কিছুদিন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিবার পর ইংরেজসেনাপতি অক্টারলোনির নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তারপর অক্টারলোনি গুর্খা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। নেপালীগণ দেখিলেন আর যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই। তখন সগৌলিতে সন্ধি হইল।

অক্টারলোনি

এই সন্ধি অনুসারে গুর্খাগণ বর্ত্তমান কুমায়ুন, গাড়োয়াল জিলা এবং তরাইএর অধিকাংশ স্থান ইংরেজ সরকারকে ছাড়িয়া দিলেন। সিকিমে তাঁহাদের আর

সগৌলির সন্ধি

দাবি রহিল না এবং কাটমণ্ডুতে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট বা প্রতিনিধি রাখা স্থির হইল।

পিণ্ডারী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮ খৃঃ) ঃ—ইহার পরে লর্ড হেষ্টিংস্ পিণ্ডারী দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই নির্ম্মম লুণ্ঠনকারীদল নিরীহ জনসাধারণের ধনসম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাদের দলে ছিল। প্রতিবৎসর শরৎকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া তাহারা লুণ্ঠন কার্য্যের জন্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। ইহারা প্রায় কখনই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইত না, শত্রুসৈন্যের আগমনের সংবাদ পাইলেই পলায়ন করিত। সুতরাং তাহাদিগকে দমন করা সহজ ছিল না, অথচ তাহাদের উপদ্রবেরও বিরাম ছিল না। ইহাদের কয়েকজন নেতা অতিশয় শক্তিশালী হইয়াছিল। লর্ড হেষ্টিংস্ ইহাদিগকে দমনের পূর্ব্বে দেশীয় রাজাদের পরামর্শ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীদল প্রায় ধ্বংস হইল। পিণ্ডারীদের একজন প্রবীণ নায়ক, করিম খাঁ, ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। তাহাকে যুক্তপ্রদেশে ক্ষুদ্র একটি রাজ্য দেওয়া হয়। অন্যতম নেতা চিতু ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রধান পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁ পূর্ব্বেই ইংরেজদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তাহাকে টঙ্কের নবাবী দেওয়া হইল। এইরূপে হিংস্র বন্য পশু অপেক্ষাও ভয়ানক, যুদ্ধ অথবা মহামারী অপেক্ষা ভয়াবহ, সমাজ ও শৃঙ্খলা-বিধ্বংসী ভীষণ উপদ্রব হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা পাইল।

পিণ্ডারীদের পূর্ব্বকথা

করিম খাঁ ও চিতু

আমীর খাঁ

তৃতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৯ খৃঃ) ঃ—ইহার মধ্যে লর্ড

হেষ্টিংস্ আবার মরাঠাদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

যুদ্ধের কারণ

পেশবা সন্তুষ্টচিত্তে বৃটিশ প্রভুত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে গোপনে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রমাগতই তাঁহার ক্ষতি ও অপমান হইতে লাগিল। অবশেষে কোঙ্কন প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে কয়েকটি দুর্গের অধিকার ত্যাগ করিতে হইল এবং মরাঠা সাম্রাজ্যের নেতৃত্বপদও পরিহার করিতে হইল। কিন্তু প্রধান প্রধান মরাঠা সর্দ্দারগণ আপনাদের স্বাধীনতাহানির জন্য অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারাও পেশবার মত বৃটিশ প্রভুত্ব বিলোপ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

কির্কির যুদ্ধ

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্যসহ পেশবা সহসা কির্কির (খির্কি বা খাড়্‌কি) বৃটিশ দূতনিবাস আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আক্রমণ ব্যর্থ হইল।

সীতাবল্‌দি

কয়েক সপ্তাহ পরে নাগপুরে আপ্পা সাহেব সীতাবল্‌দিতে বৃটিশ রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন। হোলকরের সৈন্যদল মাহিদপুরে বিধ্বস্ত হইলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হোলকর তাড়াতাড়ি সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

মাহিদপুর, কোরেগাঁও, আষ্টি

কোরেগাঁও এবং আষ্টির যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া দ্বিতীয় বাজীরাও সার জন ম্যালকমের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন (১৮১৮ খৃঃ)। আপ্পা সাহেব পঞ্জাবে পলায়ন করেন কিন্তু কিছুকাল পরে রাজপুতানায় তাঁহার মৃত্যু হইল।

যুদ্ধের ফলঃ—বাজীরাও পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার সহিত

পেশবার বৃত্তি

পেশবা পদ লুপ্ত হইল এবং তাঁহার রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। পদচ্যুত পেশবাকে আট লক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি দিয়া বিদায় করা হইল; কানপুরের

নিকট বিঠুর নামক স্থানে তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন করিতে লাগিলেন। আপ্পা সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইল। নর্ম্মদার উত্তর তীরস্থ ভোঁসলা রাজ্যের অংশ বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইল। ভোঁসলা রাজ্যের একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে নাগপুরের গদীতে স্থাপন করা হইল। সাতারার সিংহাসনে শিবাজীর বংশধর প্রতাপসিংহকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

নাগপুর ও সাতারা

এইরূপে শতদ্রু হইতে ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বৃটিশ প্রভুত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। নামাবশেষ বাদশাহ ইংরেজের বৃত্তিভোগী হইলেন, তাঁহার আধিপত্যের অভিনয়টুকুও অবশেষে পরিত্যক্ত হইল। নিজাম বৃটিশ আশ্রিত, মরাঠা শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। দুর্ব্বল রাজপুতগণের নূতন সার্ব্বভৌম শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস, শৌর্য্য অথবা ইচ্ছা কিছুই ছিল না। নামে করদ রাজগণ সকলেই বৃটিশরাজের সমকক্ষ মিত্র, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা রহিল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস্ যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন, তখন ভারতে প্রকৃত স্বাধীন রাজ্য বলিতে রণজিৎ সিংহের পঞ্জাব এবং নেপালের গুর্খা রাজ্য ব্যতীত আর একটিও অবশিষ্ট ছিল না।

ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রাধান্য

30/6/38

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

ব্রহ্ম ও পঞ্চনদে সাম্রাজ্য প্রসার এবং সমাজ সংস্কার

এই যুগের বৈশিষ্ট্য :—১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্যের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। বৃটিশের বিজয় বাহিনী ইহার পূর্ব্বে শতদ্রু হইতে ব্রহ্মপুত্র এবং কর্ণফুলি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পর বৃটিশ ভারতের সীমান্ত এই নদীগুলি ছাড়াইয়া পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের আরাকান ও টেনাসেরিম এবং পশ্চিমে পঞ্চনদের পরপারে স্থলেমান ও কীর্থর পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। পররাষ্ট্র-সম্পর্কীয় নীতিরও আমূল পরিবর্ত্তন সূচিত হইতে লাগিল। ফরাসী-সম্রাট্ বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে এশিয়ায় ফরাসী আধিপত্য স্থাপনের আশা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ফরাসীর স্থলে রুশগণ প্রবল হইয়া উঠিল। এই নবশক্তির অভ্যুত্থানে ইংরেজেরা শঙ্কিত হইলেন। কারণ, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত রুশিয়ার প্রভাব ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছিল। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই যুগে সামাজিক ও অন্যান্য অনেক বিষয়েই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সমাজসংস্কার ও শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে বেণ্টিঙ্ক ও ডালহৌসীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। লর্ড এলেনবরার আমলে দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ হয়। দেশীয়

শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্রের পরপারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার

রুশ ভীতি

সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষার উন্নতি

নৃপতি শাসিত বহু জনপদ বৃটিশ শাসনাধীনে আনিয়া ডালহৌসী আসমুদ্র হিমাচল ভারতখণ্ডে বৃটিশ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি সিপাহী বিদ্রোহের প্রবল ঝটিকার মধ্যেও অটল রহিল। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের অপ্রতিহত শাসন এ দেশ-বাসিগণ প্রায় সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

সমগ্র ভারতে বৃটিশাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা

লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮২৩-২৮ খৃঃ) ঃ—লর্ড হেষ্টিংসের পরে লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল বা সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার শাসনকালের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ ও ভরতপুর অধিকার।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪-২৬ খৃঃ) ঃ—আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আলোম্প্রা নামে একজন নৃপতি ব্রহ্মদেশে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠেন। তদ্বংশীয়গণের শাসনাধীনে ব্রহ্মদেশের আধিপত্য চারিদিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। ১৮২১-২২ খৃষ্টাব্দে আসাম ব্রহ্মের পদানত হইল। রাজ্যের পর রাজ্যজয়ের আশায় উৎফুল্ল হইয়া ব্রহ্মের রাজা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস্‌কে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের অধিকার ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আসাম ও আরাকানের বিদ্রোহীদল বৃটিশের আশ্রয় লইয়া বৃটিশাধিকৃত ভারত হইতেই ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণের আয়োজন করিতেছিল। ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরেজদের বিরোধের ইহাও একটি কারণ। ব্রহ্মদেশের সেনানায়কগণ বঙ্গদেশ জয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইংরেজগণ সর্ব্বপ্রথমে আসাম হইতে ব্রহ্ম রাজ্যের সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং পরে রেঙ্গুণ অধিকার করিলেন। ব্রহ্মসেনাপতি মহাবন্দুল শত্রু দমনে

ব্রহ্মের অভ্যুদয়

বৃটিশের রেঙ্গুণ অধিকার

অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু ডোনবিউ নামক স্থানে গুলীর আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃটিশ সৈন্যদল তখন মান্দালয়ের দিকে অগ্রসর হইল। ব্রহ্মরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

ইয়ান্দাবোর সন্ধি

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইয়ান্দাবোর সন্ধিতে তাঁহাকে আরাকান, টেনাসেরিম, আসাম, কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও মণিপুর ছাড়িয়া দিতে হইল এবং ব্রহ্মের রাজধানী আভা শহরে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি (রেসিডেণ্ট) রাখা স্থির হইল। ইহা ছাড়া ব্রহ্মের রাজার নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইল।

আসাম, আরাকান ও টেনাসেরিম অধিকার

ভরতপুর অধিকার (১৮২৬ খৃঃ):—ব্রহ্মযুদ্ধের প্রারম্ভে কয়েক স্থানে ইংরেজের পরাজয়ে একদল লোক মনে করিলেন বৃটিশ শাসনের দিন হয়তো শেষ হইয়া আসিতেছে, তাই ভারতের সামন্তরাজগণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইল। ভরতপুরের রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জনসাল রাজকুমারকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেই সিংহাসন দাবি করেন। গবর্ণর জেনারেল বুঝিতে পারিলেন যে এইরূপ অন্যায় আচরণ সহ্য করা সামন্তরাজ এবং বৃটিশরাজ কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর নহে। তিনি সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে সমর্থন করাই স্থির করিলেন। লর্ড কম্বারমিয়ারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড কম্বারমিয়ারের আক্রমণে সেই মহাদুর্গ বিধ্বস্ত হইল। দুর্জ্জনসাল নির্ব্বাসিত হইলেন।

দুর্জ্জনসালের দুরাশা

ইংরেজের ভরতপুর অধিকার

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খৃঃ) ঃ—লর্ড আমহার্ষ্টের 'পর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সাত বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ভারতে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। শাসনসংস্কার, সাম্রাজ্যপ্রসার, সমরোদ্যম প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, ওয়েলেস্‌লি, ডালহৌসী প্রভৃতির ন্যায় কৃতী ছিলেন না, কিন্তু অমঙ্গলকর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধান রহিত করিয়া ভারতের কল্যাণ সাধনে তাঁহার ন্যায় দৃঢ়তা ও সদাশয়তা আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই। এই কারণেই ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া আছে।



লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

বেন্টিঙ্কের শাসন

আর্থিক ব্যবস্থা ঃ—লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক শাসনভার গ্রহণ করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করিলেন। রাজপুরুষগণের অনেকের বেতন হ্রাস ও ভাতা কমাইয়া দেওয়া হইল। আয়-বৃদ্ধির জন্য মালবে উৎপন্ন আফিমের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। মাদ্রাজ ও আগ্রায় জমির নূতন বন্দোবস্তের ফলে রাজকোষে যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার সময় কর্ত্তৃপক্ষ বাংলার

বেতন ও ভাতা হ্রাস

আফিম

জমির বন্দোবস্ত

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" নীতির অনুসরণ করেন নাই। সার টমাস্ মন্‌রোর তত্ত্বাবধানে ১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাদ্রাজে জমির বন্দোবস্ত হয়। এই প্রদেশে রায়ত্‌ওয়ারী প্রথা অনুসৃত হইয়াছিল, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য রায়ত্ এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সরাসরি চুক্তিতে জমি দেওয়া হইত। বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশের আগ্রা অঞ্চলে সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসরের চুক্তিতে ভূমি-রাজস্ব স্থির করা হইল। এক্ষেত্রে গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিক অথবা তাহাদের প্রতিনিধিদের সহিত চুক্তি করা হইয়াছিল।

প্রাদেশিক কোর্টের অবসান

বিচার ব্যবস্থাঃ—কলিকাতার বাহিরে প্রাদেশিক কোর্ট বা আদালতগুলি তুলিয়া দিয়া জিলার কলেক্টরগণের হস্তে বিচার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইল। বিচারালয়ে পারস্য ভাষার স্থলে দেশীয় ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়। কর্ণওয়ালিসের শাসনসংস্কারের ফলে ভারতীয়গণ বিচার ও শাসন বিভাগে উচ্চপদ লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া বেন্টিঙ্ক ভারতীয়দিগের জন্য সবজজের পদ সৃষ্টি করেন। ভারতীয় বিচারকগণের বেতন বৃদ্ধি করা হইল, এবং তাঁহাদের এলাকাও বিস্তৃত হয়। এই সংস্কারের ফলে বিচারকার্য্য অল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইল।

রাজকার্য্যে ভারতীয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি

পররাষ্ট্র নীতিঃ—নূতন বড়লাট সীমান্তস্থিত রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া শান্তিতে কালযাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। রুশ প্রভাব প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সিন্ধুর আমীরগণ এবং রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিয়া রুশগণ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের

আমীরের সহিত সন্ধি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত রাজপুরুষগণ সর্ব্বদাই ইহাদের আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকিতেন।

ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুযায়ী তিনি সাধারণতঃ বৃটিশ-আশ্রিত রাজ্য সমূহে ঔদাসীন্য-নীতি (Policy of Non-intervention) অবলম্বন করিয়া চলিতেন। আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া অযোধ্যাদি প্রদেশের কু-শাসনও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সব ব্যাপারেই 'যা হয় হউক' বলিয়া একেবারে উদাসীন থাকাও তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। এই নিমিত্ত

কাছাড় ও কুর্গ অধিকার

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কাছাড় অধিকার করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ীভাবে মহিষুর রাজ্য বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কুর্গকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লন। কিন্তু সাম্রাজ্য-বিস্তার তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল না। সাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্যই তিনি এই সকল জনপদে বৃটিশ শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কার :—সতীদাহ নিবারণ এবং ঠগী দমনে বেন্টিঙ্কের নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সতীর আসল অর্থ পতিব্রতা সাধ্বী রমণী। সেকালে যে সকল হিন্দু বিধবা মৃত

সতীদাহ নিবারণ
১৮২৯ খৃঃ

পতির জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করিতেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে 'সতী' বলা হইত। সতীদাহ প্রথা সাধারণের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সাতশত হিন্দু রমণী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এই নির্ম্মম অনুষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই কু-প্রথা রহিত

করিয়া দিলেন। যাহারা এই আদেশ অমান্য করিবে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকগণ এই লোকহিতকর অনুষ্ঠানে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ঠগী দমন :—"ঠগ" নামে পরিচিত দস্যুদল অসতর্ক পথিকদিগকে শ্বাসরোধ করিয়া অথবা বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়া তাহাদের লুণ্ঠিত অর্থে জীবন ধারণ করিত। কোঙ্কন ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই ইহাদের গতিবিধি ছিল। ইহাদের অনেকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ এবং চিহ্ন থাকিত ; সেগুলি অপর কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। বেণ্টিঙ্ক ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য সার উইলিয়াম শ্লীম্যান্‌কে নিযুক্ত করিলেন। ছয় বৎসরের মধ্যে শ্লীম্যান্ হাজার হাজার "ঠগের" প্রতি উপযুক্ত দণ্ড-বিধান করিয়া ভারতের রাজপথ নিষ্কণ্টক ও পথিকগণের ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা (১৮৩৫ খৃঃ) :—সরকারী উচ্চপদ-লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন ও সমাজ সংস্কার—এ সকলই সু-শিক্ষার উপর নির্ভর করে। বেণ্টিঙ্ক এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনের শেষ বৎসর নূতন ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বিত হয়। ভারতে কি শিক্ষার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য এবং সরকারী কর্ম্মে কি ভাষার ব্যবহার সঙ্গত, তাহা লইয়া দুইটি ভিন্ন মতাবলম্বিদলের মধ্যে এই সময়ে ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়। একদল পণ্ডিত এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষপাতী হইলেন, অপর দল প্রাচ্য শিক্ষা-পদ্ধতির মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্। কিন্তু প্রথমোক্ত দলেরই পরিশেষে জয়লাভ হয়। এই জয়লাভের মূলে প্রধানতঃ ছিলেন

পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুমোদন

ব্যবহার-সচিব লর্ড মেকলে ; তাঁহারই উপদেশানুযায়ী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, অতঃপর শিক্ষার জন্য যে সরকারী অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহা একমাত্র ইংরেজি শিক্ষার প্রচারের জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ভারত সরকারের নব শিক্ষাপদ্ধতি ভারতে যুগান্তর উপস্থিত করিল। ইহার ফলে এদেশে রাজকার্য্যে ও সাহিত্যক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার প্রচলন হইল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অবাধ প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়। ভারতীয়দের সরকারী উচ্চপদে নিয়োগের পথও নব শিক্ষার ফলে সুগম হইল। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাও এই সময়েই হইয়াছিল।

১৮৩৩ অব্দের সনন্দ :—উপরে যে অভিনব শিক্ষানীতির কথা বিবৃত হইয়াছে তাহা এক হিসাবে ১৮৩৩ অব্দে লব্ধ কোম্পানির সনন্দের অবশ্যম্ভাবী ফল। ঐ বৎসর বিলাতের পার্লেমেণ্ট মহাসভা কোম্পানিকে যে নূতন সনন্দ দান করেন তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় যে, ভারত-বাসীই হউক বা ইংলণ্ডেশ্বরের অন্য যে কোন প্রজাই হউক সকলেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উচ্চপদ লাভে অধিকারী হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উচ্চপদ প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জ্জন নব শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য। চীন দেশে বাণিজ্য করিবার যে একচেটিয়া অধিকার কোম্পানির ছিল তাহা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের নূতন সনন্দ অনুযায়ী উঠিয়া যায়। পূর্ব্বে শাসন-তন্ত্রের প্রধান রাজপুরুষকে 'বঙ্গের গবর্ণর-জেনারেল' বলা হইত। নূতন সনন্দ অনুযায়ী তাঁহার উপাধি পরিবর্ত্তন করিয়া 'ভারতের গবর্ণর-জেনারেল' আখ্যা প্রবর্ত্তিত হইল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা লুপ্ত হইল। আগ্রাকে গবর্ণর শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উক্ত

ভারতের গবর্ণর-জেনারেল

প্রদেশের শাসনভার একজন লেফ্‌টন্যান্ট গবর্ণরের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। গবর্ণর-জেনারেলের শাসন পরিষদে একজন ব্যবহার-সচিব নিযুক্ত করিয়া সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক লর্ড মেকলেই উহার প্রথম ব্যবহার-সচিব নির্ব্বাচিত হইলেন।

আইন-সচিব (Law Member)

বেণ্টিঙ্ক যুগের মনীষিগণের পরিচয় :—ভারতের সামাজিক উন্নতিবিধানে এবং জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যে সকল প্রখ্যাতনামা পুরুষ আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই লর্ড বেন্টিঙ্কের সমসাময়িক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি সমাজ সংস্কারকগণের অগ্রণী এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অপরাপর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ডেভিড্‌ হেয়ার ও হেন্‌রী ভিভিয়ান ডিরোজিওর নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গে নবশিক্ষা পদ্ধতির যাঁহারা অগ্রদূত ছিলেন, ইঁহারা তাঁহাদের অন্যতম; এই সময়েই আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌ জেনারেল এসেমব্লিজ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউশন নামক বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন; কর্ণেল টড্‌ রাজস্থানের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া যশস্বী হন। বাংলা সাহিত্যে রাজস্থানের ইতিহাসের প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত। হোরেস হেম্যান উইল্‌সন্‌ ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রচার করেন। ভারতের উপাসক সম্প্রদায়-গুলির ইতিহাসও তিনি লিখিয়াছিলেন। বাংলার গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রধানতঃ এই ইতিহাস অবলম্বন করিয়া তাঁহার অমর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়

আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌

সার চার্লস্‌ মেটকাফ্‌ (১৮৩৫-৩৬ খৃঃ) :—লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। সার চার্লস্‌ মেটকাফ্‌ আগ্রা প্রদেশের নূতন

গবর্ণর হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনিই অস্থায়ীভাবে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান তাঁহার শাসনকালের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। অতঃপর লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করা হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড (১৮৩৬-৪২ খৃঃ) :—বড়লাট পদে নিযুক্ত হইবার তিন বৎসর পরে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধের ফলে কেবল যে তাঁহার নিজের যশ ম্লান হইল তাহা নহে, ইংলণ্ডের এক বিশাল-বাহিনী আফ্‌গানিস্থানের প্রান্তরে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইংরেজ-প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু এই বিপৎপাতের জন্য বড়লাট মুখ্যতঃ দায়ী নহেন। লর্ড পামারষ্টোন এই সময় ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন; প্রধানতঃ তাঁহারই রুশ-ভীতির ফলে এই যুদ্ধ ঘটে। কিছুকাল হইতে মধ্য এশিয়ায় রুশিয়ার শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের দরবারে রুশ প্রভাব প্রবল হইয়া উঠে। রুশিয়ার এইরূপ শক্তি বৃদ্ধিতে বৃটিশের উদ্বেগের ফলেই লর্ড বেন্টিঙ্ক সিন্ধুদেশের আমীরদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৩৭ অব্দে রুশদিগের প্ররোচনায় পারসিকেরা আফ্‌গানিস্থানের হিরাট আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়; ইহাতে ইংরেজদের মনে দারুণ শঙ্কা উপস্থিত হইল। লর্ড পামারষ্টোন ভাবিলেন ভারতসাম্রাজ্যের আসন্ন বিপদ উপস্থিত। তিনি ইহার প্রতিবিধানের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে যত্নবান্ হইতে পরামর্শ দেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আফ্‌গানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত সখ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার বার্ণেস্‌কে দূতরূপে

প্রথম আফ্‌গান যুদ্ধ
১৮৩৯-৪২ খৃঃ

রুশ প্রতিরোধ নীতি

দোস্ত মহম্মদ

কাবুলে প্রেরণ করেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে মহারাজা রণজিৎ সিংহ যদি আফ্‌গানদিগকে পেশোয়ার শহর প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হন তবে আমীর বৃটিশের সখ্যাবদ্ধ হইতে প্রস্তুত, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড শিখরাজের বিরাগভাজন হইতে সাহসী হইলেন না। ফলে দোস্ত মহম্মদ রুশিয়ার এক দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে তাড়াইয়া তাঁহার স্থানে বৃটিশের আজ্ঞাধীন কোন আফ্‌গান নায়ককে বসাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কাবুলের ভূতপূর্ব্ব নরপতি শাহ সুজা এই সময় লুধিয়ানায় বৃটিশের বৃত্তিভোগী হইয়া বাস করিতেছিলেন। বড়লাট তাঁহাকেই পছন্দ করিলেন ; শাহ সুজা, রণজিৎ সিংহ এবং ইংরেজ এই তিন পক্ষ মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন (১৮৩৮ খৃঃ)

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি

যুদ্ধারম্ভ :—প্রথমে মিত্রশক্তির জয়লাভ হইল। কান্দাহার, গজনী এবং কাবুল তাঁহাদের অধিকারে আসে। দোস্ত মহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার স্থানে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিজয় গৌরবে অভিষিক্ত করা হইল। কিন্তু আফ্‌গানগণ শাহ সুজাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না। তাঁহার রাজত্ব বৃটিশ সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। স্বাধীনতাপ্রিয় আফ্‌গানগণ স্বতঃই বৈদেশিকদের প্রতি গভীর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত। বিদেশী সৈনিকগণের নীতিবিরুদ্ধ আচরণের ফলে তাহাদিগের প্রতি সাধারণের বিদ্বেষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল।

শাহ সুজার রাজ্যাভিষেক ১৮৩৯ খৃঃ

এই বিদ্বেষের ফলে কাবুলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত জনতা আলেকজাণ্ডার বার্ণেস্‌কে তাঁহার গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করে (১৮৪১ খৃঃ)) বৃটিশ রাজপুরুষগণ এই দারুণ বিপদের সময় কিছুমাত্র সাহস ও

বৃটিশ রাজপুরুষগণের কার্য্য-কুশলতার অভাব

কার্য্যকুশলতা দেখাইতে পারিলেন না। তখনও বৃটিশ সেনা কাবুল দুর্গ অধিকার করিয়া মিত্রবল না আসা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ স্থানত্যাগ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। বৃটিশের কাবুলস্থিত অমাত্য ম্যাক্‌নাটন দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর সহিত এক অপমানকর সন্ধি স্থাপন করিয়া বসিলেন। ইহার পর ম্যাক্‌নাটন আকবর খাঁর সহিত সাক্ষাৎকার কালে নিহত হন।

বৃটিশ নায়কগণ তখন গোলাবারুদ সব ত্যাগ করিয়া একরূপ নিরস্ত্র হইয়াই তুষারাচ্ছন্ন দুর্গম প্রান্তরের মধ্য দিয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দারুণ শীতে ও আফ্‌গানদের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে ক্রমশঃ হীনবল হইয়া তাঁহারা ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বৃটিশ সৈন্যের ধ্বংস

আকবর খাঁ ক্রুদ্ধ আফ্‌গানদিগকে শান্ত করিতে পারেন নাই। আফ্‌গান প্রান্তরের বিপদসঙ্কুল পথে ফিরিয়া আসিবার কালে বৃটিশ সৈন্য ও অনুচরবর্গের সংখ্যা প্রায় ১৬,৫০০ ছিল। ইহাদের মধ্যে ১২০ জন আকবর খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে। আর বাকি সব পথে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কেবল ডাঃ ব্রাইডন নামক এক ব্যক্তি জালালাবাদে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের এই শোচনীয় কাহিনী শুনাইয়াছিলেন।

লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-৪৪ খৃঃ):—আফ্‌গান যুদ্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এতদূর ভগ্নোদ্যম হইয়াছিলেন যে লর্ড এলেনবরা ১৮৪২ অব্দে বড়লাটের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ধ্বংসাবশিষ্ট বৃটিশ সৈন্যের আফ্‌গান-ভূমি ত্যাগই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু পরাভবের কলঙ্ক লইয়া পলায়ন সকলের মনঃপূত হইল না; অবশেষে গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার হইতে নট এবং পেশোয়ার হইতে পোলককে যুদ্ধে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। বৃটিশবাহিনী গজনী নগর

এবং দুর্গ বিধ্বস্ত করিল; আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা কাবুলের প্রকাণ্ড বাজার উড়াইয়া দেওয়া হইল। বৃটিশ সেনা অতঃপর বিজয়গর্ব্বে ভারতে ফিরিয়া আসিল; লর্ড এলেনবরা তাহাদিগকে অত্যধিক জাকজমকের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। দোস্ত মহম্মদকে কাবুলে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। শাহ সুজা ইতিমধ্যেই শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

সিন্ধুদেশ জয় (১৮৪৩ খৃঃ) :—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সিন্ধু দেশ তালপুরের আমীর বা মীরগণের দ্বারা শাসিত হইতেছিল। বহুদিন হইতে বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি এইদেশের দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। ১৮০৯ ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আমীরদিগের সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সিন্ধুভূমি হইতে ফরাসী প্রভাব বিলুপ্ত করিয়া দেন। বেণ্টিঙ্ক আমীরদিগের সহিত এক সন্ধি করেন। তাহাতে স্থির হয় যে হিন্দুস্থানের বণিক ব্যবসায়িগণ সিন্ধুদেশে বিনা বাধায় ব্যবসায় করিতে পারিবেন। কিন্তু সামরিক আয়োজনের জন্য সিন্ধুজনপদে রণতরী প্রভৃতি প্রেরণ নিষিদ্ধ থাকিবে।

তালপুরের আমীরগণ

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে অক্‌ল্যাণ্ড সিন্ধুদেশে একজন প্রতিনিধি (Resident) রাখিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বের সন্ধি ভঙ্গ করিয়া এক নূতন সন্ধির প্রবর্ত্তন করা হয়, তাহাতে সিন্ধুদেশকে স্পষ্টরূপেই বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হইল এবং একদল সৈন্য রাখার যাহা খরচ তাহা আমীরদিগের নিকট হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে ইংরেজরাজের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন বলিয়া আমীরদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

প্রতিনিধি নিয়োগ

বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীনে সিন্ধুদেশ

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস্ নেপিয়র রাজনৈতিক ও সামরিক বিধি ব্যবস্থা করিবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সিন্ধুদেশে প্রেরিত হন। নেপিয়র এমন ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন যেন তিনিই সিন্ধুদেশের প্রকৃত মালিক। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হইয়া দুর্দ্দান্ত বালুচি যোদ্ধৃগণ ইংরেজ প্রতিনিধির আবাসস্থল আক্রমণ করিল (১৮৪৩ খৃঃ)। তখন রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মিয়ানী এবং দাবো নামক স্থানে দুইটি যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদল জয়লাভ করে। আমীরগণ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং সিন্ধুজনপদ বৃটিশ এলাকাভুক্ত হইয়া গেল।

সিন্ধুদেশ নেপিয়র

বালুচি বিদ্রোহ

মিয়ানী ও দাবো

সিন্ধুদেশ জয়

গোয়ালিয়র সংগ্রাম (১৮৪৩ খৃঃ) :—১৮১৭-১৯ খৃষ্টাব্দের মরাঠা যুদ্ধের অবসানে যে সকল দেশীয় রাজ্য শতদ্রু নদের দক্ষিণস্থিত ভারত-খণ্ডে বর্ত্তমান ছিল তন্মধ্যে সিন্ধিয়া বংশ শাসিত, চল্লিশ সহস্র সৈনিক সুরক্ষিত, গোয়ালিয়র রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সিন্ধিয়া অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিলে এক বালককে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসান হয়। এই বালকের অভিভাবক নিয়োগ সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইল এবং গোয়ালিয়রের বিশাল সেনাদলে অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। লর্ড এলেনবরা দেখিলেন যে এই বৃহৎ গোয়ালিয়র বাহিনী যদি পঞ্জাবের শিখদের সহিত যোগদান করে, তাহা হইলে ইহাদের সম্মিলিত শক্তিকে দমন করা ইংরেজদিগের পক্ষে কঠিন হইবে। তিনি এই মিলনের সম্ভাবনা দূরীভূত করিবার জন্য চম্বল নদীতীরে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাজপুর এবং পনিয়ারের রণক্ষেত্রে সিন্ধিয়ার সৈন্যদল

মহারাজপুর ও পনিয়ার

পরাজিত হইল। গোয়ালিয়রের শাসনভার এক অমাত্য সভার উপর অর্পিত হইল এবং স্থির হইল যে এই সভা স্থানীয় বৃটিশ প্রতিনিধির পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য্য পরিচালন করিবেন। রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয় এবং কতিপয় বৃটিশ সেনানায়কের অধীনে একটি সৈন্যদল গঠিত হইল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮ খৃঃ) ঃ—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলেনবরা বিলাতে ফিরিয়া যাইবার আদেশ পাইলেন। ইহার পরে সার হেন্‌রী (পরে লর্ড) হার্ডিঞ্জ ভারতের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি একজন বিচক্ষণ যোদ্ধ,পুরুষ ছিলেন।

আভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ—বড়লাট পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইনি দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে শিশুহত্যা ও সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং খন্দদিগের মধ্যে যাহাতে নরবলি প্রথা উঠিয়া যায়, তাহার জন্যও বিশেষ আয়াস স্বীকার করেন। শিক্ষার উন্নতি বিধানে ইনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই মহৎকার্য্যে সাফল্য লাভের জন্য ভারত সরকার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের মনীষিগণের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

সামাজিক সংস্কার

প্রথম শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬ খৃঃ) ঃ—আভ্যন্তরীণ সংস্কার অপেক্ষা যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যই হার্ডিঞ্জ অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের দুর্জ্জয় শিখজাতির পরাভবই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধি অনুসারে মহারাজ রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর দক্ষিণস্থিত শিখরাজ্যগুলি জয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধির ফলে রণজিতের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে শতদ্রুর উভয় তীরবর্ত্তী শিখদিগকে

রণজিৎ সিংহ

একত্রিত করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। সে আশা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। তথাপি তিনি একেবারে ভগ্নোদ্যম হইলেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হায়দারুর যুদ্ধে তিনি আফ্‌গানদিগকে পরাজিত করেন। দশ বৎসর পরে নাওসেরার নিকটস্থিত থেরির মহাযুদ্ধেও তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার শিখদিগের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আসে এবং শূরশ্রেষ্ঠ হরিসিংহ নালওয়ার সুযোগ্য হস্তে সীমান্ত প্রদেশের রক্ষাভার অর্পিত করা হয়। বিজয়দৃপ্ত শিখদিগের আক্রমণের উদ্দাম বেগ আফ্‌গান সীমান্ত ছাড়াইয়া সিন্ধুদেশে পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরেজেরা আবার রণজিৎ সিংহের অজেয় বাহিনীর গতিরোধ করেন। বারংবার সাম্রাজ্য বিস্তারে ভগ্ন-মনোরথ হইলেও রণজিৎ জীবনসায়াহ্নে যে রাজ্যে অপ্রতিহত ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, উহার পরাক্রম এবং ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি দূরদূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রণজিৎ শুধু একটা সাম্রাজ্যই স্থাপন করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি যে দুর্দ্ধর্ষ খাল্‌সা সৈন্যদল সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা স্ববশে আনিতে বৃটিশ-সিংহের বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই মহাবীর মানবলীলা সম্বরণ করেন। তখন রাজ্যে দারুণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজধানীর অমাত্যবর্গ রাষ্ট্রশাসনে অক্ষম হইলেন এবং খাল্‌সা সৈন্যগণ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রণজিতের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে পিতৃ সিংহাসনে স্থাপিত করা হয় এবং রাণী ঝুন্দা বা ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে খাল্‌সাবাহিনীর নায়কগণই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য চালাইতেছিল। লাহোরের অমাত্যগণ ইহাদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। শেষে ইঁহারা স্থির

খাল্‌সা সৈন্যদল

যুদ্ধের কারণ

করিলেন যে সৈন্যগণকে বৃটিশ রাজ্য আক্রমণে প্রোৎসাহিত করাই শ্রেয়ঃ, কারণ ইংলণ্ডের সহিত সমরে হয় ইহারা বিনষ্ট হইবে নচেৎ নূতন রাজ্যজয়ের আনন্দে ইহাদের দুর্দ্দমনীয় সংগ্রামস্পৃহা নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু শিখগণ যে কেবল লাহোর দরবারের প্ররোচনাতেই তাহাদের প্রবল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এইরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। তাহারা ভাবিয়াছিল যে ইংরেজেরা তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে উদ্যত। ইংরেজদিগের কয়েকটি কার্য্যের জন্য শিখদিগের এই বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়। শতদ্রু নদের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ইংরেজগণ নৌকা তৈয়ারী করিতেছিলেন। মূলতানের দিকে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে সিন্ধুদেশে একদল সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছিল এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের দুর্গ সমূহে দলে দলে নূতন সৈন্যের সমাবেশ হইতে লাগিল। এই বিপুল সমরায়োজন শিখদিগের নিকট অবিদিত রহিল না। সুতরাং যখন লাহোর দরবার জন্মভূমির এই আসন্ন বিপদের কথা খাল্‌সাগণকে বুঝাইয়া দিলেন, তখন তাহারা স্বতঃই ভাবী আক্রমণকারীদিগের রাজ্যে সমরানল প্রজ্বালিত করিতে অগ্রসর হইল। এইরূপে প্রথম শিখ যুদ্ধের আরম্ভ হয়। চারিটি যুদ্ধ হইল—প্রথমটি মুদ্‌কীতে, দ্বিতীয়টি ফিরু শহর, ফিরোজ শহর বা ফিরোজশায়, তৃতীয়টি আলিওয়ালে এবং চতুর্থটি সোব্রাওঁতে।

মুদ্‌কী (১৮৪৫ খৃঃ) :—মুদ্‌কীতে যে দারুণ সংগ্রাম হইল, তাহাতে অগণিত লোকক্ষয় হয়। ইংরেজবাহিনী শিখ সৈন্যের প্রবল আক্রমণে বিচলিত হইল। কিন্তু শেষে ভীষণ যুদ্ধের পর শিখ সৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিল। অমাত্য লালসিংহের অযোগ্যতার জন্যই এই পরাজয় ঘটিয়াছিল।

ফিরোজশা (১৮৪৫ খৃঃ) :—এই ঘটনার পরে ইংরেজগণ ফিরোজশাতে শিখদিগের পরিখা-বেষ্টিত সেনানিবেশ আক্রমণ

করিলেন। শিখেরা অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। দলে দলে ইংরেজসৈন্য অগ্রসর হইতে গিয়া প্রতিহত হইল। ইংরেজদিগের প্রচুর বলক্ষয় হইয়াছিল। কিন্তু শিখ সেনাপতি তেজসিংহ হঠাৎ রণস্থল পরিত্যাগ করায় শিখদিগের আবার পরাজয় হইল। যদি মোখমচাঁদ বা হরিসিংহের ন্যায় সাহসী এবং রণদক্ষ সেনানী এই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন, তাহা হইলে ইহার ফল বোধ হয় অন্যরূপ হইত।

আলিওয়াল এবং সোব্রাওঁ (১৮৪৬ খৃঃ) ঃ—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রণজুরসিংহ মজীথিয়ের অধীনে শিখেরা শতদ্রু নদ অতিক্রম করিল এবং আলিওয়াল নামক স্থানে ইংরেজদিগের সহিত এক ভীষণ যুদ্ধে খাল্‌সা সৈন্য পুনরায় পরাজিত হইল। শিখ সৈন্যদলের অধিকাংশ তখন সোব্রাওঁর সুরক্ষিত গড়ে অবস্থান করিতেছিল। কুয়াসার অন্ধকারে ইংরেজেরা শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিল। এবারও শিখদিগের পরাজয়ের কারণ শিখ সৈন্যাধ্যক্ষদিগের অভাবনীয় অকর্ম্মণ্যতা, যাহার গূঢ় রহস্য অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত।

লাহোর এবং অমৃতসরের সন্ধি (১৮৪৬ খৃঃ) ঃ—যুদ্ধাবসানে বৃটিশ বাহিনী নৌ-সেতুর উপর দিয়া শতদ্রু পার হইল। ইংরেজেরা লাহোরের নিকট শিবির স্থাপন করিলেন এবং শিখ-সর্দ্দারদিগকে সমবেত করিয়া সন্ধি ঘোষণা করেন। এই সন্ধির শর্ত্তানুযায়ী শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী জালন্ধর দোয়াব এবং শিখ মহারাজের শতদ্রুর বামদিকস্থ ভূ-সম্পত্তি বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ কিছু টাকা নগদ ও কিছু টাকা কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য বিক্রয় করিয়া দিতে হইল। শিখ সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইল। গোলাব সিংহ নামে লাহোর রাজসরকারের অধীনস্থ এক শাসনকর্ত্তা কাশ্মীর ক্রয় করিলেন।

গোলাব সিংহ

অমৃতসরে এক নূতন সন্ধি হইল, তাহাতে গোলাব সিংহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে ক্রীত প্রদেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল।

ভাইরোওয়ালের সন্ধি
অমাত্য-সভা

কিছুদিন পরে লাহোর দরবারের সহিত আর একটি সন্ধি হইল। এই সন্ধিতে পঞ্জাবে একদল বৃটিশ সৈন্য এবং রাজকার্য্যের জন্য একটি অমাত্য-সভা গঠন স্থির হয়। প্রকৃত পক্ষে লাহোরের বৃটিশ প্রতিনিধিই সর্ব্বে-সর্ব্বা হইলেন।

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খৃঃ) :—লর্ড হার্ডিঞ্জের পর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার রাজ্য-শাসন কাহিনী বিবৃত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির উল্লেখ কর্ত্তব্য :—(১) বাহুবলে পররাষ্ট্র জয় ; (২) রাজ্য "অপবর্ত্তন" বা "স্বত্ব বিলোপ নীতি" (Doctrine of Lapse) অনুসারে সামন্ত রাজ্য গ্রহণ ; (৩) অন্যান্য উপায়ে রাজ্যাধিকার ; (৪) আভ্যন্তরীণ সংস্কার।

ডালহৌসী পঞ্জাব ও পেগু এই দুইটি প্রদেশ বাহুবলে জয় করিয়া-ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে দুইটি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এই দুই যুদ্ধ দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খৃঃ) এবং দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৫২ খৃঃ) বলিয়া খ্যাত।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খৃঃ) :—পঞ্জাবে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপনে শিখেরা সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। যদিও ইংরেজের সহিত সংগ্রামে তাহাদের অপরিমিত বলক্ষয় হইয়া-ছিল, তথাপি তাহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত মনে করে নাই। শিখবীরগণের মনে হইয়াছিল যে তাহাদের লাঞ্ছনার জন্য বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণই দায়ী। ইহারা পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল বটে,

যুদ্ধের কারণ

কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের লোকের শ্রদ্ধা হারাইল। রাণীমাতা ঝিন্দনের প্রতি কঠোর ব্যবহার অসন্তোষের অগ্নিকে এমনি করিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল যে উহা যে কোন মুহূর্ত্তে বিরাট আকার ধারণ করিয়া মহাপ্রলয় সংঘটিত করিতে পারে। এই আশঙ্কা যে অমূলক নহে তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল। মূলতানের শাসনকর্ত্তা মূলরাজের সহিত লাহোরের অমাত্যবর্গের বিরোধ হওয়াতে তিনি পদত্যাগ করেন। লাহোর দরবার এই পদত্যাগ মঞ্জুর করিলেন। খাঁ সিংহ নামক মূলতানের নূতন শাসনকর্ত্তা দুইজন ইংরেজ কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে যখন

মূলরাজ

মূলতানে পৌছিলেন, তখন ইংরেজ কর্ম্মচারী দুইটি নিহত হন। এই ব্যাপারে মূলরাজ সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। লাহোরের কর্ত্তৃপক্ষ রাজা শেরসিংহের অধীনে একদল সৈন্য মূলতানে পাঠাইলেন। তাহারা কিন্তু বিদ্রোহীদের

মহারাণী ঝিন্দন

সহিত মিলিত হইল। মহারাণী ঝিন্দনের প্ররোচনায় সমগ্র পঞ্জাবে অসন্তোষের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং শিখ সর্দ্দারগণ রণসাজে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। পেশোয়ার পাইবার লোভে শিখদিগের পুরাতন শত্রু আফ্গানরা শিখদিগের পক্ষে যোগদান করিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে লর্ড ডালহৌসী ঘোষণা করিলেন,—"শিখ জাতি যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, তাহাদিগের সমর-সাধ অবশ্যই মিটিবে।" লর্ড গফের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য ইরাবতী নদী অতিক্রম করিল। শিখ সেনাপতি শেরসিংহ তখন রামনগরে শিবির ফেলিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল।

চিলিয়ান্ওয়ালার যুদ্ধ

শেরসিংহ কামান ও যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জাম লইয়া চিলিয়ান্ওয়ালা নামক দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইলেন। এখানে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৩ই

জানুয়ারি, ১৮৪৯ খৃঃ)। সৈনিক ও সেনানায়ক লইয়া বৃটিশের ২,৪০০ লোক, কয়েকটি কামান ও তিনটি পতাকা নষ্ট হইল। কিন্তু ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারি ইংরাজেরা মূলতান জয় করিতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর লর্ড গফ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাটে শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন (২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯ খৃঃ)। এইবারে শিখ সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ১২ই মার্চ্চ শেরসিংহ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং শিখগণ বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করিল। ২৯শে মার্চ্চ লর্ড ডালহৌসী এক ঘোষণা পত্রদ্বারা পঞ্জাব ইংরেজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। দলীপ সিংহ নিজে এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিলেও তাঁহাকে উহার ফলভোগ করিতে হইল। তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার জন্য বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।

মূলতান জয়

গুজরাটের যুদ্ধ

ইংরেজ অধিকারে পঞ্জাব

দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৫২ খৃঃ):—বৃটিশ বণিকদের সহিত ব্রহ্মবাসীর সদ্ভাব ছিল না। বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিগণও ব্রহ্মদেশে অপমানিত হইয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ডালহৌসীর কার্য্য-তৎপরতার ফলে অল্পকাল মধ্যেই যুদ্ধের বিরাম এবং বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধে ইংরেজেরা যে ভ্রম করিয়াছিলেন, এবারে আর তাহা হইল না। বিজয়ী বৃটিশসৈন্য একে একে মার্ত্তাবান্, রেঙ্গুণের বিখ্যাত প্যাগোডা, বেসিন, প্রোম এবং পেগু অধিকার করিল। বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট যথাবিধি সন্ধি করিতে অস্বীকৃত হইলে, ইংরেজেরা ঘোষণাদ্বারা পেগু প্রদেশ বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। পেগু বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইলে ভারত সাম্রাজ্যের পূর্ব্বদিকের সীমানা

ব্রহ্মদেশ অধিকার

সাল্‌উইন্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বঙ্গোপসাগর-কূলে সর্ব্বত্র বৃটিশের জয়-পতাকা উড্ডীন হইল।

স্বত্বভ্রংশনীতি (Doctrine of Lapse) :—ভারত সরকারের অনুমোদিত উত্তরাধিকারীর অভাবে আশ্রিত ও অনুগৃহীত সামন্ত রাজ্যের স্বত্ব সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত, এই নীতি অনুসারে লর্ড ডালহৌসী অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য বৃটিশ অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে দেশীয় নৃপগণের শাসন অপেক্ষা বৃটিশ শাসন প্রজাবর্গের পক্ষে কল্যাণকর। তাই তিনি প্রচার করিলেন যে বৃটিশের আশ্রিত এবং অনুগৃহীত কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে সেই রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে। সরকার বাহাদুর অনুমোদন না করিলে কোন রাজ্যে দত্তক পুত্রের স্বত্ব স্বীকৃত হইবে না। এই নীতি অনুসারে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য বৃটিশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল ; কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব্ব নৃপগণের বৃত্তি ও পদমর্য্যাদা সম্বন্ধেও এরূপ ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় বাজীরাওএর দত্তক পুত্র নানাসাহেব সম্বন্ধে বলা হইল যে তাঁহার পিতাকে যে মাসহারা দেওয়া হইয়াছিল উহা তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মান ; তাঁহার অবর্ত্তমানে ঐ মাসহারা তাঁহার উত্তরাধিকারী পাইবেন না।

নানাসাহেব

"প্রজার হিতার্থে রাজ্যাধিকার" :—লর্ড ডালহৌসী অন্য উপায়েও অনেক দেশীয় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। "স্বত্ব-ভ্রংশ" নীতির উল্লেখ না করিয়া বেন্টিঙ্কের ন্যায় কেবলমাত্র "প্রজার মঙ্গল" এই অজুহাতে তিনি কয়েকটি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে দেশীয় "কু-শাসন" অপেক্ষা বৃটিশ শাসনই অধিক মঙ্গলদায়ক। কু-শাসনের জন্যই অযোধ্যার নবাব বাহাদুরের বিস্তীর্ণ জনপদ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ

অযোধ্যা অধিকার

রাজ্যান্তর্গত করা হইল। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়।

সিকিম, সম্বলপুর এবং বেরার :—দুইটি বৃটিশ প্রজার উপর অত্যাচার করার অপরাধে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিকিম রাজ্যের কিয়দংশ ভারত গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়া লইলেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত সম্বলপুরের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সম্বলপুর বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। দক্ষিণাপথে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার রাজ্যে

বেরার হস্তগত

একদল বৃটিশ সৈন্য প্রতিপালনের ব্যয়ের নিমিত্ত কোম্পানিকে যে টাকা দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা সময়মত দিতে পারেন নাই বলিয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধি হয়, তাহাতে নিজাম তাঁহার পূর্ব্ব ঋণের পরিবর্ত্তে বেরার প্রদেশটি বৃটিশ সরকারকে সমর্পণ করেন।

আভ্যন্তরীণ শাসন :—যুদ্ধাদির আয়োজন ব্যাপারে লর্ড ডালহৌসী যেমন দক্ষ ছিলেন, শাসন ব্যাপারেও তাহা হইতে কিছু কম ছিলেন না। তিনি সেকেলে কার্য্য-পদ্ধতি বদ্‌লাইয়া শাসন-বিভাগের সবিশেষ উন্নতিবিধান করেন। রাস্তা তৈয়ারী, রেলপথ নির্ম্মাণ এবং পয়ঃপ্রণালী খনন দ্বারা যাহাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি

পূর্ত্ত বিভাগ

পূর্ত্ত বিভাগের (Public Works Department) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময় প্রথম ভারতীয় রেলপথ নির্ম্মিত হয় এবং গঙ্গার বিখ্যাত খাল খনন সম্পূর্ণ হয়। তিনি লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া বিলাত হইতে

সস্তা ডাকটিকিট ও টেলিগ্রাফ

ভারতে জলপথে গমনাগমনের সুবন্দোবস্ত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ অর্থাৎ বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহন এবং অল্প ডাক মাশুলে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার

সময়ে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক যত্নে এই নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণে যাহাতে সম্পত্তি নষ্ট না হয় বড়লাট তাহারও ব্যবস্থা করেন। বাংলা প্রদেশ সুশাসনের জন্য একজন লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বা ছোটলাট নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সার চার্ল্‌স্‌ উড্‌ বিলাত হইতে তাঁহার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিষয়ক আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞাপত্র অনুযায়ী শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি পুনরায় এক সনন্দ পান, ইহাই তাঁহাদের শেষ সনন্দ। বিলাতে ডিরেক্টর বা পরিচালক সভার গঠন পরিবর্ত্তিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা উচ্চ রাজকার্য্যে (সিভিল সার্ভিস) কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ায় স্বজন পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া গেল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক আজ্ঞাপত্র

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ

লর্ড ডালহৌসীর কার্য্যের সমালোচনা ঃ— লর্ড ডালহৌসী ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমরায়োজন ও রাজ্যজয় ব্যাপারে তিনি অসাধারণ শক্তি ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। তিনিই ভারতের অভ্যন্তরে বৃটিশ আধিপত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন। শাসন বিভাগে তিনি যে সকল সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে যে আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি ক্ষমতাপ্রিয় ও কর্তৃত্বাভিমানী ছিলেন, কাহারও সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ ঘটিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। সামন্ত রাজ্যগুলি অধিকারকালে দেশীয় লোকের মতামত তিনি বড় গ্রাহ্য করেন নাই ; তাঁহার পরবর্ত্তী

শাসনকর্ত্তার সময়ে যে ভীষণ সমরানলে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল সেই ব্যাপারে ডালহৌসীর দায়িত্ব বড় কম নহে।

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-৬২ খৃঃ) ঃ—লর্ড ডালহৌসীর পর লর্ড ক্যানিং ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। এদেশে আসিয়া ইনি সর্ব্বপ্রথমে যে কাজগুলি করেন, তাহার মধ্যে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৮৫৭ খৃঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিদ্যায়তন দেশের মধ্যে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিয়াছে তাহার প্রভাব অপরিমেয়। ভারতবাসী আগ্রহের সহিত প্রতীচ্যের দর্শন, সমাজবিধি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিল। ফলে এদেশে এক নব যুগের সূচনা হয় ; ঠিক এই সময়ে কিন্তু ভারতের প্রাচীন পন্থী জনমণ্ডলে বিদ্রোহের বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠে। অসন্তোষের প্রবল ঝটিকা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রবাহিত হইল। যে সাম্রাজ্য মহীরুহ ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাগণের বহু বৎসরব্যাপী চেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছিল তাহা এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইল। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া খ্যাত।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন



লর্ড ক্যানিং

সিপাহী বিদ্রোহের কারণঃ—সিপাহী বিদ্রোহের কারণ অনেকগুলি। ডালহৌসীর সামন্তরাজ্য কবলিত করার প্রয়াস, তাঁহার অনুমোদিত স্বত্বলোপ নীতি এবং দিল্লীর বাদশাহকে পুরাতন রাজধানী হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা, এ সমস্তই প্রাচীন রাজবংশীয়দিগের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। অসন্তোষের ভাব অযোধ্যায় বিশেষ করিয়া দেখা দেয়। সিপাহী সৈন্যদলের বহু লোক ঐ প্রদেশের অধিবাসী ছিল।

রাজনৈতিক কারণ

ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের ঈপ্সিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ ও শাসন-কর্ত্তৃত্বলাভের পথ ইংরেজের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রাচীন পন্থী ভারতীয়দিগের মধ্য হইতেই বাংলা, বিহার, অযোধ্যা ও গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশের অধিকাংশ সিপাহী সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহারা অনুমান করিতেছিল যে ভারতবর্ষকে এবং ভারতীয়দিগকে ইউরোপের ধর্ম্ম ও সভ্যতার অনুগামী করাই গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত সমাজ-সংস্কার ও নব শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

সামাজিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কারণ

পুণ্যধাম আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে ব্রহ্মাদি দেশে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় সিপাহীদিগের রাজভক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রুশিয়াবাসীদিগের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ, ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস, এবং সেনাদলের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসার লক্ষ্য করিয়া সিপাহীগণ মনে করিল এই সময়ে সহজেই ইংরেজদিগকে বিপর্য্যস্ত করা যাইতে পারে।

সামরিক কারণ

অবশেষে যখন এন্‌ফিল্ড রাইফেল নামক এক প্রকার বন্দুক প্রচলন করা হইল, যাহার টোটা পশু-চর্ব্বিতে প্রস্তুত, তখন অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শতদ্রু হইতে নর্ম্মদা তীর পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ড গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

চর্ব্বি-নির্ম্মিত টোটা

সিপাহী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য :—এই বিদ্রোহ মুখ্যতঃ সমরব্যবসায়ী সিপাহীদের ব্যাপার এবং প্রধানতঃ তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেবলমাত্র অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে ইহা জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করিয়াছিল। বিদ্রোহীদের পক্ষে কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী নায়কের আবির্ভাব হয় নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে বিশেষ ঐক্য ছিল না এবং তাহারা এমন সব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল যাহার বিফলতা অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র মধ্য-ভারতের বিদ্রোহীরা রণকৌশল এবং সুনেতৃত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিল। ইহাদের নায়ক নায়িকাগণের মধ্যে এক বীর রমণীর নাম সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয়। ইনি ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাই।

ঝাঁসির রাণী

বিদ্রোহের বিস্তার :—উত্তেজনার প্রথম প্রকাশ বারাকপুরে, কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে মীরাটেই ইহা গুরুতর ভাবে দেখা দিল। এখানকার সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী-দিগকে নিহত করিল। অনন্তর জেল অধিকার করিয়া এবং ইউরোপীয়-গণের যাহাকে কাছে পাইল তাহারই প্রাণ সংহার পূর্ব্বক দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইল। দিল্লীর মুসলমানেরা বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিল এবং নামে মাত্র বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিল।

বিপ্লুত জনপদের পরিধি :—বিদ্রোহ-বহ্নি শীঘ্রই উত্তর গাঙ্গেয় প্রদেশ ও মধ্য ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। দিল্লী, কাণপুর এবং লক্ষ্ণৌ নগরে ইহা ভয়াবহ ও রোমাঞ্চকর রূপ ধারণ করিল। নর্ম্মদার দক্ষিণে অসন্তোষের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা দেয় নাই। সার জন লরেন্স ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ পঞ্জাবের শিখ সর্দ্দারদিগকে সংযত রাখিয়া-ছিলেন। গোয়ালিয়রের সার দিনকর রাও, হায়দ্রাবাদের সার

শিখ ও গুর্খাদিগের রাজভক্তি

সালার জঙ্গ এবং নেপালের গুর্খাবীর সার জঙ্গ বাহাদুর—এই তিনজন ভারতবাসীর প্রযত্নে বিদ্রোহ-বহ্নি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

কাণপুর ঃ—শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের উত্তরাধিকারী নানাসাহেব কাণপুরের নিকট বিঠুরে বাস করিতেন। তিনি স্থানীয় বিদ্রোহী দলের নেতা হইয়া নিজেকে পেশবা বলিয়া প্রচার করিলেন এবং বৃটিশ সৈন্যাবাস আক্রমণ করেন। নিরাপদে এলাহাবাদে পৌছাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতিতে দুর্গরক্ষী সৈন্যেরা সপরিবারে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ইহারা যখন নৌকাযোগে নদী পার হইতেছিল তখন তাহাদিগের উপর অজস্র গুলিবর্ষণ করা হয়। পুরুষদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছিল ; স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগকে বন্দী করা হইল। নীল ও হাভেলক্ কাণপুরে আসিয়া এই অত্যাচারের দারুণ প্রতিশোধ লইলেন। কিন্তু ইঁহাদিগের আগমনের পূর্ব্বেই বন্দীদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়া কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

দিল্লী ঃ—বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা ছিল দিল্লী। ঐ নগর দখল করিয়া বিদ্রোহীদের কাবু করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। অম্বালা হইতে একদল বৃটিশ সেনা আসিয়া দিল্লীর সন্নিহিত পাহাড় অধিকার করিয়া সেখান হইতে নগরের উপর লক্ষ্য রাখিল। পঞ্জাব হইতে সার জন লরেন্স একদল নূতন সৈন্য পাঠাইলেন। নবাগত সৈনিকগণের মধ্যে নিকল্‌সন্ নামে একজন তেজস্বী যোদ্ধা এবং একদল শিখ ছিল। নিকল্‌সন্ দিল্লীর কাশ্মীর ফটক উড়াইয়া দিলেন। শহর ইংরেজদের অধিকারে আসিল। বিজয়ী নিকল্‌সন্ কিন্তু সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। হড্‌সন্ নামে একজন দুর্দ্দান্ত সৈনিকের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী বাদশাহ, তাঁহার দুই পুত্র এবং এক পৌত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া রাজকুমারগণকে গুলি করিয়া মারিল।

বাদশাহ রেঙ্গুণে প্রেরিত হইয়া তাঁহার অবশিষ্ট দিনগুলি বন্দীভাবে কাটাইয়াছিলেন।

লক্ষ্ণৌ :—সার হেন্‌রি লরেন্স কিছুকালের জন্য লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী (বৃটিশ প্রতিনিধির আবাস) রক্ষা করিয়া বিদ্রোহীর গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। অচিরে হাভেলক্ ও আউট্রাম সসৈন্যে রেসিডেন্সীতে প্রবেশ করেন কিন্তু তাঁহারা অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের সহিত বহির্গত হইতে পারিলেন না। কারণ সিপাহীরা দলে দলে সমবেত হইয়া চারিদিক্ ঘিরিয়া রহিল।

তাঁতিয়া তোপি (তাতিয়া টোপে) ও মধ্যভারতের বিদ্রোহ :—এই সময়ে অযোধ্যার দক্ষিণবর্ত্তী ভূখণ্ডের বিদ্রোহীরা তাঁতিয়া তোপির নেতৃত্বে কাল্পি হইতে অগ্রসর হইয়া কাণপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ উইণ্ড্‌হাম্‌কে পরাজিত করে; কিন্তু শেষে সার কোলিন্ ক্যাম্পবেল কর্ত্তৃক তাঁতিয়া তোপি বিতাড়িত হন। ইত্যবসরে তাঁতিয়া ঝাঁসির রাণীর সহিত যোগ দিয়া মধ্য-ভারতে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া দিয়াছিলেন। সার হিউ রোজ বেতোয়ার যুদ্ধে তাঁতিয়া তোপিকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিলেন এবং ঝাঁসি দখল করেন। রাণী এবং তাঁতিয়া গোয়ালিয়রের দিকে প্রস্থান করিলেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা বৃটিশের মিত্র ছিলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইল। সেনাপতি রোজ কালবিলম্ব না করিয়া দুইটি যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজিত করিয়াছিলেন। একটি যুদ্ধে ঝাঁসির রাণী পূর্ব্ব যুগের রাণী দুর্গাবতীর ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অসি হস্তে সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন (জুন, ১৮৫৮ খৃঃ)। পরবৎসর তাঁতিয়া শত্রুহস্তে ধরা পড়িলেন এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসী হইল। নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন এবং আর কখনও তাঁহাকে বৃটিশ রাজ্যে দেখা যায় নাই।

ঝাঁসির রাণীর মৃত্যু

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে শান্তি স্থাপন:—অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার ভার লইলেন সার কোলিন্ ক্যাম্পবেল। নেপালের সার জঙ্গ বাহাদুর একদল গুর্খা সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে লক্ষ্ণৌ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ অধিকারে আসিল; কিন্তু স্থানীয় তালুকদারেরা দুর্গম প্রদেশে অনেকদিন খণ্ডযুদ্ধ চালাইয়াছিল। জুন মাসে রোহিলখণ্ডে বেরেলী নগর অধিকৃত হওয়াতে উত্তর ভারতের যুদ্ধ বিগ্রহ এক রকম থামিয়া গেল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই সমগ্র ভারতে শান্তি ঘোষণা করা হয়।

কোম্পানি-রাজত্বের শেষ:—সিপাহী-বিদ্রোহ কোম্পানি-রাজত্বের অবসান ঘটাইল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতবর্ষের মত এত বড় একটা দেশের শাসনভার সামান্য বণিক্ সম্প্রদায়ের উপর ফেলিয়া রাখা আর যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। স্থির হইল যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর নিজ শাসনাধীনে যাইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে, ভারতবর্ষে যথাবিধি শান্তি ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আইন

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট মহাসভায় এক আইন পাশ হইল। ইহাতে বিধিবদ্ধ হইল যে, ভারতবর্ষের শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বরীর নিজ-হস্তে ন্যস্ত হইবে।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া

তাঁহার নামে রাজমন্ত্রীদিগের মধ্যে একজন বিশিষ্ট অমাত্য ভারত-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া পঞ্চদশ সদস্য সমন্বিত একটি সভার

সাহায্যে ভারতবর্ষের শাসন-সংরক্ষণ কার্য্য পরিচালনা করিবেন। গবর্ণর জেনারেল "রাজ-প্রতিনিধি" (Viceroy) উপাধিতে ভূষিত হইবেন। এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নূতন বলা যায় না। কারণ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ সভার (Board of Control) সভাপতি হিসাবে যিনি প্রকৃতপক্ষে ভারত শাসন করিতেন তিনিও ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন একজন মন্ত্রীই ছিলেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনে ভারতবর্ষ রাজ-প্রতিনিধি

Pitt's India Act - 1784 P. 321

মহারাণীর ঘোষণা-পত্র (The Queen's Proclamation) ১লা নভেম্বর, ১৮৫৮ খৃঃ :—লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদে এক বিরাট দরবার করিয়া প্রচার করিলেন যে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঘোষণা-পত্রকে ভারত-বাসীদিগের মহাসনন্দ (Magna Carta) বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা জনসাধারণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে জানান হইল যে অতঃপর ন্যায়বিচার, সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ কামনা, ধর্ম্ম এবং সামাজিক ব্যাপারে নিরপেক্ষতা ও উদারতা রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র হইবে; রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি ও তাঁহাদের স্বত্ব ও মর্য্যাদারক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা মানিয়া লওয়া হইবে, নানা ছলে সামন্তরাজ্য গ্রহণ নীতি পরিহার করা হইবে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসিগণ যোগ্যতানুসারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন; বিদ্রোহে বৃটিশ প্রজা হত্যা ব্যাপারে প্রত্যক্ষরূপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর সকলকেই রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে।

ষষ্ঠ খণ্ড

বর্ত্তমান ভারত

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

নবতন্ত্র প্রবর্ত্তন ও বৃটিশাধিরাজ্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি

(১৮৫৮-৮০ খৃঃ)

এই সময়ের বিশেষত্ব :—ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীনে যাওয়ার পর প্রথম বাইশ বৎসরকে আমরা রাষ্ট্রতন্ত্রের পুনঃসংস্কার ও বৃটিশ সার্ব্বভৌম শাসনের পূর্ণ অভিব্যক্তির কাল বলিতে পারি। বিদ্রোহের ঝড় থামিয়া গিয়াছিল। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রজাপুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি, শাসন-যন্ত্রের পুনর্গঠন, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছিল। এই সময়ের শেষার্দ্ধে অখণ্ড ভারতবর্ষে একচ্ছত্র মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সহিত ভারতের সামন্ত রাজগণের ও বৃটিশাধিকৃত জনপদবাসী প্রজাবর্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল ; কিন্তু এই সকল নূতন রকমের বিধি ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান সত্ত্বেও ভারতের দুঃখ দৈন্য ঘুচিল না। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ভারতাকাশ ছাইয়া ফেলিল। দুঃস্থ প্রজাবর্গের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য সরকার বাহাদুর ও গণ্যমান্য অনেক লোক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সর্ব্বত্র সফল হয় নাই। ফলে বহুলোকের প্রাণহানি হইয়াছিল।

একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা

দুর্ভিক্ষ

প্রথম রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-৬২ খৃঃ) :— বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিবার সময় ক্যানিং সাহস ও পৌরুষের সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম ধৈর্য্য ও সুস্থিরতার পরিচয় দিয়াছিলেন; সেইজন্যই তিনি পরিণামে জয়লাভ করেন। তাঁহার দেশীয় লোকেরা অনেকে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "করুণানিধি ক্যানিং" বলিয়া বিদ্রূপ করিত, কিন্তু রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি অস্থিরচিত্ততার পরিচয় দেন নাই বলিয়া আজও ভারতবাসীর নিকটে ঐ বিদ্রূপাত্মক উপাধিই তাঁহার সম্মানের পরিবর্দ্ধন করিতেছে।

"দয়ালু ক্যানিং"

শান্তি প্রতিষ্ঠা :—রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবার পর কয়েকমাস ক্যানিংএর শান্তিস্থাপন করিতেই কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি আশ্রিত রাজা মহারাজাদিগকে অভয় দিয়া ঘোষণা করিলেন যে ভবিষ্যতে দত্তকপুত্রের স্বত্ব অস্বীকার করিয়া বা অন্য কোন ছলে দেশীয় রাজ্য আর বৃটিশ অধিকারভুক্ত করা হইবে না।

স্বত্বভ্রংশ নীতির অবসান

সমর বিভাগে নূতন ব্যবস্থা :—বিদ্রোহের পর বৃটিশ সৈনিকের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তোপখানার ভার বৃটিশ কর্ম্মচারীদের সম্পূর্ণ অধীনে রাখা হইল।

আভ্যন্তরীণ শাসন :—এই সময়ে আরও কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইল। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে "খাজনা আইন" পাশ হয়। বাংলায় নীল চাষের ব্যাপারে যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত তাহা দমন করিবারও ব্যবস্থা হইল। এই বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নামক নাট্যগ্রন্থ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহার-সচিব

খাজনা আইন

নীলকরদিগের অত্যাচার

মেকলে যে সকল বিধি-নিয়মের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন, ১৮৫৯-৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সেগুলির প্রচলন হইল। ইহার মধ্যে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবৎসর পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট বা মুখ্য বিচারালয় ও সদর আদালতগুলি সংযুক্ত হইয়া "হাই কোর্ট" নামে খ্যাত হইল এবং প্রত্যেক বৃহৎ প্রদেশেই একটি করিয়া হাই কোর্ট স্থাপিত হইল। ঐ বৎসরেই ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সমূহে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বে-সরকারী সভ্য মনোনয়নের ব্যবস্থা হইল।

আইন সংস্কার

হাই কোর্ট ১৮৬১ খৃঃ

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল আইন

সিপাহী বিদ্রোহ এবং উহার পরবর্ত্তী নূতন সামরিক ব্যবস্থার ফলে সরকার বাহাদুরের বহু টাকা ঋণ হইয়াছিল। ঐ ঋণ শোধ এবং রাজকোষ পূরণের জন্য রাজস্ব-সচিব উইল্‌সন্ আয়ব্যয় সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন ; তাহার মধ্যে আয়কর (Income Tax) প্রবর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান। উইল্‌সনের পর লেইং রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত হন এবং তিনি কারেন্সি নোট অর্থাৎ কাগজের মুদ্রার প্রচলন করেন।

আয়ব্যয় সংস্কার

লর্ড এল্‌গিন (১ম) (১৮৬২-৬৩ খৃঃ) :—লর্ড ক্যানিংএর পরে লর্ড এল্‌গিন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। এদেশে আসিবার অল্পকাল পরেই হিমালয়ের একস্থানে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সার জন লরেন্স (১৮৬৪-৬৯ খৃঃ) :—সিপাহী বিদ্রোহের সময় নববিজিত পঞ্জাব প্রদেশে যিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন সেই সার জন লরেন্স ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এল্‌গিনের পরে স্থায়ী বড়লাট নিযুক্ত হইলেন।

আফ্‌গানিস্থান সম্পর্কে ঔদাসীন্য নীতি :—আফ্‌গান-আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে কাবুলের সিংহাসন লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে সার জন লরেন্স হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই নীতি "বিজ্ঞোচিত তূষ্ণীম্ভাব" (Masterly Inactivity) বলিয়া খ্যাত। আমীরের প্রিয় পুত্র শের আলি যখন বিজয়ী হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন বড়লাট তাঁহাকে কাবুলের আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

ভুটান যুদ্ধ :—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভুটান যুদ্ধে "তূষ্ণীম্ভাব নীতি"র কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। হিমালয়ের পূর্ব্বখণ্ডে ভুটিয়াদের বাস। ইহারা উত্তর বাংলা ও আসামের কতকগুলি বৃটিশাধিকৃত জনপদ আক্রমণ করে এবং ইঁহাদের হস্তে বৃটিশ দূত অপমানিত হন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই দুর্ব্ব্যবহারের শাস্তি বিধানের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভুটিয়ারা দেওয়ানগিরির যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। ঐ সন্ধি অনুসারে দুয়ার জনপদ বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হইল এবং উহার পরিবর্ত্তে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভুটিয়াদিগকে বাৎসরিক একটা বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হইলেন।

দেওয়ানগিরির যুদ্ধ

দুর্ভিক্ষ এবং জনহিতকর ব্যবস্থা :—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় এবং ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ড ও রাজপুতানাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এতাদৃশ দুর্ব্বিপাক প্রতিকারের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন সুব্যবস্থা না থাকায় ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় হইল। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ বিপত্তি না ঘটে তাহার জন্য লরেন্স একটি জলসেচন বিভাগ খুলিলেন এবং নিয়ম করিয়া দিলেন

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, ১৮৬৬ খৃঃ

জলসেচন বিভাগ

যে অন্নাভাবে মৃত্যু হইতে প্রজাবর্গের রক্ষণে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদা বাধ্য থাকিবেন।

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২ খৃঃ) ঃ—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী "রক্ষণশীল" দলভুক্ত লর্ড মেয়োকে অতঃপর ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

পররাষ্ট্রনীতি ঃ—কার্য্যভার গ্রহণের পরেই নূতন বড়লাট আম্বালায় একটি দরবার করিয়া আফ্‌গানিস্থানের আমীর শের আলিকে যথাবিধি সম্বর্দ্ধনার দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন।

আম্বালা দরবার

সুয়েজ খাল ও বৃটিশ রাজপুত্রের ভারত ভ্রমণ ঃ—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ দুইটি ঘটনার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংলণ্ড ও ভারতের ভাগ্য যে সূত্রে গ্রথিত তাহা এই দুইটি ব্যাপারে আরও দৃঢ় হইয়াছিল। আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে সুয়েজ খাল খনিত হওয়ায় ভারত হইতে ইংলণ্ডে যাইবার পথের দূরত্ব কমিয়া যায় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারত ভ্রমণে আসিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত বৃটিশ রাজবংশের প্রীতির বন্ধন অধিকতর দৃঢ়ীভূত করিয়া দেন।

প্রাদেশিক চুক্তি

আভ্যন্তরীণ শাসন ঃ—লর্ড মেয়ো রাজস্ব সংস্কার দ্বারা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই "প্রাদেশিক চুক্তি"র (Provincial Contract) প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে খরচের জন্য কেন্দ্রস্থ রাজকোষ হইতে কিছু অর্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্বতন্ত্র তহবিলের ব্যবস্থা করেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ঐ তহবিল হইতে খরচ চালাইবেন এবং নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতির জন্য দায়ী থাকিবেন। প্রাদেশিক

গবর্ণমেণ্টের ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে পৃথক্‌ভাবে শাসন করিবার ক্ষমতা এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। এই ক্ষমতা ১৯১৯ ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারের ফলে বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মেয়ো কৃষি-বিভাগ স্থাপন এবং রাস্তা, রেলপথ ও পয়ঃপ্রণালী খননাদির দ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময় বঙ্গে প্রথম লোক গণনার সূত্রপাত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আন্দামান পরিদর্শনে গিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জনৈক পাঠান কয়েদীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

মেয়োর হত্যা

লর্ড নর্থব্রুক্ (১৮৭২-৭৬ খৃঃ) :—পরবর্ত্তী বড়লাট কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন, কিন্তু দেশীয় নৃপতিগণের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। শের আলি তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে অভয় দিতে অস্বীকৃত হইলেন। ফলে আফ্‌গানিস্থানের সহিত বৃটিশের হৃদ্যতা শিথিল হইয়া পড়িল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদার গাইকোয়াড় মল্‌হর রাওকে কু-শাসনের অপরাধে সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে সয়াজীরাও নামে তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় শিশু আত্মীয়কে সিংহাসন অর্পণ করা হইল।

বৈদেশিক সম্বন্ধ

গাইকোয়াড় সিংহাসনচ্যুত

১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ (পরে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসেন। তিনি এদেশে আসিয়া বিপুল সমাদর ও রাজোচিত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

যুবরাজের ভারত ভ্রমণ

রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা :—লর্ড নর্থব্রুক্ বিচক্ষণতা সহকারে

রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা :—লর্ড নর্থব্রুক্ বিচক্ষণতা সহকারে অবাধ বাণিজ্যের নীতি চালাইয়াছিলেন। বহির্দ্দেশাগত পণ্যদ্রব্যের শুল্ক অনেক কমাইয়া দিয়া ভারত হইতে দেশান্তরে প্রেরিত পণ্যের করও তিনি বহুল পরিমাণে উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অবাধ বাণিজ্য

লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০ খৃঃ) :—অতঃপর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বিকন্‌স্‌ফীল্ড (ডিস্‌রেলী) লর্ড লিটনকে বড়লাট পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতে পাঠাইলেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর চক্রবর্ত্তীত্ব ঘোষণা :—বিলাতের রক্ষণশীল দল এই সময়ে বিকন্‌স্‌ফীল্ডের নেতৃত্বে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ও বাদ্‌শাহী জাঁকজমকের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নূতন বড়লাট সর্ব্বতোভাবে এই নীতির অনুবর্ত্তন করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বিকন্‌স্‌ফীল্ড একটি আইন পাশ করিলেন, তাহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে "কাইজার-ই-হিন্দ" অর্থাৎ ভারতের রাজরাজেশ্বরী উপাধিতে ভূষিত করা হইল। লর্ড লিটন এদেশে আসিবার কিছুকাল পরেই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের গৌরবমণ্ডিত রাজধানী দিল্লী নগরীতে একটি বিরাট দরবার করিয়া ঐ নূতন উপাধি ঘোষণা করিলেন। ভারতীয় নৃপতি ও মহাসামন্তগণ সমবেত হইয়া সম্রাজ্ঞীর মহামান্য প্রতিনিধির বশ্যতা স্বীকার করেন। ভারতের রাজন্যগণ পূর্ব্বে কার্য্যতঃ বৃটিশ আধিপত্য মানিয়া লইলেও নামে সমকক্ষ মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এখন সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহারা বৃটিশরাজের সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীত্ব স্বীকার করিয়া যথোপচারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেলেন।

মহারাণীর সম্মান

দিল্লীর দরবার
১৮৭৭ খৃঃ

১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ :—দিল্লীতে যখন মহাসমারোহে দরবার হইতেছিল, তখন ভারতের অন্য এক প্রান্তে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া সমগ্র ভূখণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দক্ষিণ ভারতে এমন ভীষণ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছিল যে ঐরূপ দারুণ দুর্দ্দৈব পূর্ব্বে অন্যত্র কোথাও পরিদৃষ্ট হয় নাই। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের শৈথিল্যের ফলে বায়ান্ন লক্ষের অধিক লোক এই সময় কালগ্রাসে পতিত হয়। এইরূপ বিপত্তি ভবিষ্যতে আর যাহাতে ঘটিতে না পারে, তজ্জন্য লর্ড লিটন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে একটি দুর্ভিক্ষ নিবারণী তদন্ত সভা (Famine Commission) গঠিত করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি অনুসন্ধানের ফলাফলের বিবৃতি (Report) দাখিল করেন; এই রিপোর্ট অনুসারেই অদ্যাপি দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের বন্দোবস্ত হইয়া আসিতেছে।

রাজস্ব ও অবাধ বাণিজ্য :—লর্ড লিটন ভারতে অবাধ বাণিজ্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের যে অন্তরায় ছিল অর্থ-সচিব ষ্ট্রাচি বিভিন্ন প্রদেশ সীমায় শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা রহিত করিয়া সেই সব প্রতিবন্ধক দূর করিয়াছিলেন এবং বহু পণ্যদ্রব্যের উপর হইতে কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। মোটা কাপড়ের উপর যে কর নির্দ্ধারিত ছিল, বড়লাট সাহেব নিজের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা তাহাও তুলিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিকে আয় এবং ব্যয়ের কয়েকটি অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়া রাজস্ব ব্যাপারে লর্ড মেয়ো প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বাধীনতার বহুল প্রসার করা হয়।

প্রদেশ সীমায় শুল্ক আদায় রহিত

পীড়ন ও প্রসাদন নীতি :—ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে রাজদ্রোহমূলক লেখা বন্ধ করিবার জন্য লর্ড লিটন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দেশীয়

ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র-বিষয়ক আইন (Varnacular Press Act) বিধিবদ্ধ করেন। "অস্ত্র-আইনে"র দ্বারা লাইসেন্স অর্থাৎ অনুজ্ঞাপত্র ব্যতীত অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

দেশীয় সংবাদপত্র আইন

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনন্দে বলা হইয়াছিল যে কোন লোককে কেবল মাত্র তাহার জাতির জন্য কোন সরকারী চাকুরি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। লর্ড লিটন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে "ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস" নামে একশ্রেণীর উচ্চবেতনভোগী ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীর স্থষ্টি করিয়া ঐ প্রতিজ্ঞাকে কথঞ্চিৎ কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করেন।

"ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস"

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-৮০ খৃঃ):—রুশিয়া ও আফগানিস্থানের দিক হইতে যে বিপদের আশঙ্কা ছিল, লর্ড লিটন তাহা দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। আফগানিস্থানের আমীর শের আলি লর্ড নর্থব্রুকের নিষ্করুণ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং রুশগণ যখন মধ্য এশিয়ায় রাজ্য-বিস্তার করিতেছিল, তখন তিনি তাহাদিগের সহিত সখ্য স্থাপনে অভিলাষী হন। লর্ড লিটন আমীরকে শত্রু মধ্যে গণ্য করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কোয়েটা দখল করেন এবং হিরাট ও কান্দাহার জুড়িয়া একটি বৃটিশাশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তাঁহার মনে উদয় হয়। শের আলি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আচরণে বিরক্ত হইয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রুশ দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন; কিন্তু ইংরেজ দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর যুদ্ধ ঘোষিত হইল। ইংরেজ সেনা তিনটি পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আমীর তুর্কীস্থানে পলায়ন করিলেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। শের আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁর সহিত গণ্ডামকে ইংরেজদের এক সন্ধি

কোয়েটা দখল

গণ্ডামকের সন্ধি

হয় (১৮৭৯ খৃঃ)। এই সন্ধি অনুসারে ইয়াকুব খাঁ পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইংরেজের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন। কাবুলে যাইবার কতকগুলি গিরিপথ ইংরেজের দখলে ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিজ দরবারে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি থাকিবার অনুমতি দিলেন।

পুনরায় যুদ্ধ

কয়েক মাস পরেই বৃটিশ রাজদূত সার লুই ক্যাভানরী নিহত হইলেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেনাপতি রবার্টস্ চরসিয়াতে আফগানদিগকে পরাভূত করিয়া ইয়াকুবকে নির্ব্বাসিত করিলেন। কাবুলের অধিবাসিগণ বিশেষ ভাবে দণ্ডিত হইল। লর্ড লিটন আফগানিস্থানকে বিভক্ত করিয়া কান্দাহারে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন স্থির করিলেন; ইতিমধ্যে উদারমতাবলম্বী গ্লাড্ষ্টোন্ মন্ত্রী হইয়া রক্ষণশীলদলের আফগান নীতি পরিহার করিলেন; সুতরাং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

স্বায়ত্ত শাসনের সূচনা ও জাতীয়তার উন্মেষ

লর্ড রিপণ (১৮৮০-৮৪ খৃঃ):—ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বীদের অধিনায়ক মহামতি গ্লাড্ষ্টোনের যোগ্য শিষ্য লর্ড রিপণ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে

রিপণের উদার শাসন

লর্ড লিটনের পর ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি শান্তি ও স্বায়ত্তশাসনে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা আফগান জাতিকে

দমন করিয়া ভারতের "বৈজ্ঞানিক সীমান্ত" অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত আধিপত্যবিস্তারে উদ্যত হইয়াছিলেন। রিপণ এইরূপ "অগ্রসর নীতি"র উপাসক ছিলেন না। তিনি নিরতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং ভারতের শাসনপ্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা উদার ও লোক-চিত্তাকর্ষক করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শাসন-সংস্কার তখন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতের সুধীবর্গ এই



লর্ড রিপণ

ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়

সময় স্বদেশে ইংলণ্ডের অনুরূপ স্বায়ত্ত-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশায় উদ্‌গ্রীব। তাঁহারা সংখ্যায় কম হইলেও তাঁহাদের শক্তি অসাধারণ ছিল। ভারতবাসীদিগের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিবার জন্য রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃগণ লর্ড রিপণের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদের সময় কয়েকটি সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লর্ড রিপণ ভারতবাসীর প্রকৃত হিতকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের আত্মতন্ত্রলাভের পথ সুগম করিবার নিমিত্ত স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। বিংশ শতাব্দীতে ভারত-সচিব লর্ড মর্লি এবং মিঃ মণ্টেগুর কল্যাণে রিপণ-প্রবর্ত্তিত উদার শাসনপদ্ধতির বহুল প্রসার সাধিত হয়।

আফগান যুদ্ধের শেষ :—নূতন বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণের প্রারম্ভেই আফগানিস্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ইয়াকুব খাঁ নির্ব্বাসিত হইলে দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আফ্‌জল খাঁর তনয় আবদুর

রহমান ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিলেন। লর্ড রিপণ অবিলম্বে এই নূতন আমীরের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। দুইটি শর্ত্তে আবদুর রহমানের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হইল। (১) তিনি বৃটিশ ভিন্ন আর কোন বৈদেশিক জাতির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন না; এবং (২) পিষিণ জেলাটি ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই সময়ে শের আলির আয়ুব খাঁ নামে এক পুত্র নূতন আমীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। কান্দাহার

মাইওয়ান্দ

এবং হেল্‌মণ্ড নদীর মধ্যস্থিত মাইওয়ান্দ নামক স্থানে একদল বৃটিশ সৈন্য আয়ুবের হাতে পরাজিত হইল। কিন্তু সার ফ্রেডরিক (পরে লর্ড) রবার্টস্ কাবুল হইতে কান্দাহারে গমনপূর্ব্বক আয়ুবের সৈন্যকে নগরের বাহিরে

যুদ্ধে ফল

হারাইয়া দিয়া পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইলেন। অনন্তর আবদুর রহমান আয়ুবকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিয়া আফগানিস্থানের অবিসংবাদিত রাজা হইয়া বসিলেন। লর্ড রিপণ এই সময়ে ঐ দেশ হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া আনিবার হুকুম দিলেন।

যদিও এই যুদ্ধে অত্যন্ত লোকক্ষয় ও অর্থনাশ হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে যে কিছু ফল পাওয়া যায় নাই, এমন নহে। খেলাতের খাঁ বৃটিশ অধীনে আসিলেন, বৃটিশ বেলুচিস্থান (বালুচিস্তান) নামে একটি নূতন প্রদেশ সৃষ্ট হয়; কোয়েটাতে সৈন্য রাখিবার স্থায়ী ব্যবস্থা হইল; এবং বোলান নামক গিরিপথ ইংরেজদিগের দখলে আসে। আফগানিস্থানে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে রুশিয়ার চক্রান্ত এইরূপে নিষ্ফল হইল।

মহীশূর প্রত্যর্পণঃ—আফগানিস্থানে শান্তি স্থাপিত হইবার পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্য পুনরায় হিন্দু রাজবংশের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাঃ—লর্ড রিপণের নাম যে আজও এদেশে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার আভ্যন্তরীণ সংস্কার। দেশের লোক-সংখ্যা এবং সামাজিক অবস্থা জানিবার জন্য ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের লোক গণনা করা হয়। এদেশের কারখানাগুলির শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যাহারা শিশু তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য কারখানা আইন (Factory Act) পাশ করা হয়। ভারতীয় কৃষকদিগের অভাব-অভিযোগও উপেক্ষা করা হয় নাই। ভূমি-রাজস্ব ও কৃষি-বিভাগ পুনর্গঠন করা হয় এবং যাহাতে চাষবাসের উন্নতি হয় এবং কৃষিজাতদ্রব্য সাধারণে প্রদর্শিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। বাঙ্গালার কৃষকদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত "প্রজা-স্বত্ব-আইনের" খস্‌রা প্রস্তুত হয়। এই আইন লর্ড ডফ্‌রিণের সময় বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লবণের শুল্ক হ্রাস হওয়ায় দরিদ্রদিগের কিঞ্চিৎ সুবিধা হয় এবং ঐ বৎসর কার্পাসবস্ত্রের মাশুল রদ এবং প্রায় সকল পণ্যদ্রব্যের শুল্ক রহিত হওয়ায় লর্ড নর্থব্রুক্ প্রবর্ত্তিত এবং লর্ড লিটন বর্দ্ধিত অবাধ বাণিজ্য আরও প্রসারতা লাভ করে। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদ-পত্রের সংযমনার্থ যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, লর্ড রিপণ ঐ বৎসর সেই আইন তুলিয়া দেন এবং এই নিয়ম করেন যে, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি রাষ্ট্র-শাসন সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে অবাধে আলোচনা করিতে পারিবেন। দেশীয় লোক যাহাতে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে

লোক গণনা

কারখানা আইন

কৃষির উন্নতি

লবণের শুল্ক হ্রাস

অবাধ বাণিজ্য

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান

অভিজ্ঞ হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কয়েকটি নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করা হইল। পূর্ব্বে প্রাদেশিক রাজধানীর পৌর সভা (মিউনিসিপালিটি) গুলিতে নাগরিকগণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল উহাই কয়েকটি আইন দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিল। এই নূতন আইন "লোকাল গবর্ণমেণ্ট এ্যাক্ট" অর্থাৎ স্থানীয় শাসন-বিধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই আইন প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে বহু নূতন পৌর এবং জানপদ (Rural) সমিতি স্থাপিত হইল। এই সকল সমিতির হস্তে স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজপথ সংরক্ষণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের ভার দেওয়া হইল। দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহ দান, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিবিধান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রচার প্রভৃতির নিমিত্ত একটি শিক্ষা তদন্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। অবশেষে ব্যবহার-সচিব ইল্‌বার্ট একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হয় যে অতঃপর দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার করিতে পারিবেন। এই পাণ্ডুলিপি "ইল্‌বার্ট বিল" বলিয়া খ্যাত। ইউরোপীয়েরা ক্ষিপ্ত হইয়া এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন; শেষে এই আপোষ হয় যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বিচারের সময় স্বজাতীয় জুরী অর্থাৎ অপরাধ নিরূপণার্থ নির্ব্বাচিত জনসভার সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

"হাণ্টার কমিশন"

"ইল্‌বার্ট বিল"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ ভারত ত্যাগ করেন। তাঁহার ন্যায় প্রজারঞ্জক শাসনকর্ত্তা ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাসে বিরল। বিলাত যাইবার প্রাক্কালে এদেশবাসিগণ তাঁহাকে শত শত অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়া অন্তরের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

লোকপ্রিয় রিপণ

লর্ড ডফ্‌রিণ (১৮৮৪-৮৮ খৃঃ) ঃ—লর্ড রিপণের পর লর্ড ডফ্‌রিণ ভারতে বড়লাট হইয়া আসিলেন।

আফগানিস্থানের সীমা নির্দ্ধারণ ও আমীরের সহিত মিত্রতা ঃ—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার আফগানিস্থান সম্পর্কে সুব্যববস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। রুশিয়ার সহযোগে আফগানিস্থানের উত্তর সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি সীমা-নির্দ্ধারণ সমিতি গঠিত হয়। আমীরের সহিত সখ্য দৃঢ়তর করিবার জন্য বড়লাট তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া রাওলপিণ্ডিতে এক দরবার করিলেন এবং সাদর অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তার দ্বারা আমীরকে পরিতুষ্ট করিলেন। এই সময়ে পঞ্জদেহ্‌ নামক স্থানে আফগান এবং রুশ সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু আমীরের সদ্বিবেচনা ও বিচক্ষণতার ফলে সংগ্রামের আশঙ্কা দূরীভূত হয়।

পঞ্জদেহ্‌

তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮৮৫ খৃঃ) ঃ—উত্তর পশ্চিমে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইল বটে কিন্তু এই সময়েই ভারতের পূর্ব্বদিকে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রহ্মরাজ থীব ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে ফরাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এবং ইংরেজ বণিকগণ তাঁহার অত্যাচারে বিব্রত—এইরূপ অভিযোগ ভারত সরকারের নিকট পৌছিল। বড়লাট ব্রহ্মরাজের নিকট হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বৃটিশ সেনাপতি প্রেণ্ডারগাষ্ট ইরাবতীর পথে অগ্রসর হইয়া মান্দালয় অধিকার করেন (১৮৮৫ খৃঃ)। ব্রহ্মরাজ তখন আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে রত্নগিরিতে নির্ব্বাসিত করা হইল। উত্তর ব্রহ্মদেশ ইংরেজ অধিকারে আসিল (১৮৮৬ খৃঃ)। তবে দুর্গম প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোদ্ধদলের সহিত আরও কিছুদিন খণ্ডযুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসন:—লর্ড ডফ্‌রিণ ভূমি-সম্পর্কীয় আইন পরিবর্ত্তিত করিয়া কৃষকদিগের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে একটি রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ সমিতি (Public Service Commission) গঠিত হইয়াছিল। এই তদন্ত-সভার সদস্যেরা যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার ফলে পূর্ব্বের ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস্ তুলিয়া দিয়া প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রবর্ত্তন করা হয়। এই প্রস্তাব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে কার্য্যকরী হয়।

“এইচিশন্ কমিশন্”

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব:—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। সেই উপলক্ষে লর্ড ডফ্‌রিণ ভারতের সর্ব্বত্র খুব সমারোহের সহিত “স্বর্ণ” জুবিলী উৎসব (Golden Jubilee) সম্পন্ন করেন। ভারতের সকল শ্রেণীর লোক সমভাবে যোগদান করিয়া এই উৎসবকে সফল করিয়া তুলিয়াছিল।

কংগ্রেস আন্দোলন:—যে বৎসর পঞ্চনদ, নররক্তে রঞ্জিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল এবং বিশাল ব্রহ্মরাজ্যের বিজয়-পতাকা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল, সেই বৎসরেই ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন শক্তি দেখা দিল; ইহাই ভারতের জাতীয় মহাসম্মিলনী (Indian National Congress)। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে ইহার প্রথম অধিবেশন হয় এবং ইহার সর্ব্ব প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন বাঙ্গালী ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের নেতারা প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব অভিযোগের কথা গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন এবং আত্ম-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হইবার দাবি করিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের প্রভাব দেশের উচ্চ-নিম্ন সকল স্তরের লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কংগ্রেসের নেতাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধীর ও শান্তচেতা, তাঁহাদের প্রতি

ভারতের জাতীয় সম্মিলনী

লর্ড ডফ্‌রিণের্‌ সহানুভূতির অভাব ছিল না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমানে যে ভূখণ্ড যুক্তপ্রদেশ বলিয়া পরিচিত সেই স্থানে একটি ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। অন্যান্য যে সকল সংস্কার বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার সময় বিধিবদ্ধ হয়।

লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪ খৃঃ) :—লর্ড ডফ্‌রিণের পরে লর্ড ল্যান্সডাউন ভারতে বড়লাট হইয়া আসেন। নূতন বড়লাট সীমান্ত প্রদেশে "প্রভাব-মণ্ডল" (Sphere of Influence) বিস্তার নীতির পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক বড় রাজ্যের সীমান্তে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি থাকা কর্ত্তব্য, যাহার শাসনভার ঐ বৃহৎ রাজ্য গ্রহণ করিবে না, অথচ বৈদেশিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবে। এই মত অনুসারে সীমান্তবাসীদিগের সম্বন্ধে লর্ড ল্যান্সডাউন "অগ্রসর-নীতি" (Forward Policy) অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে সিকিম, লুসাই পর্ব্বত, চীন পাহাড় এবং সান্‌রাজ্যে বৃটিশ প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল।

অগ্রসর-নীতি

মণিপুর—আসামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত মণিপুর রাজ্যের সেনাপতিকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। আসামের চীফ কমিশনার (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা) মিঃ কুইন্‌টন ইহার একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য মণিপুরে যান, কিন্তু তিনি সেখানে নিহত হন। অবিলম্বে ইহার প্রতিশোধ লওয়া হয়। অনন্তর একটি বালককে সিংহাসনে বসাইয়া একজন বৃটিশ প্রতিনিধি রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ব্যবস্থা :—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের শাসনভার ইংরেজগণ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। গিল্‌গিট্‌ উপত্যকার অন্তর্গত নগর এবং হুঞ্জও ইংরেজের দখলে আসিল। খেলাতের খাঁকে এই সময়ে সিংহাসন পরিত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়।

কাশ্মীর, গিল্‌গিট্‌ ও খেলাৎ

সীমান্তে বৃটিশের এইরূপ রাজ্য-বিস্তার নীতি লক্ষ্য করিয়া আফগানিস্থানের আমীর আবদুর রহমান শঙ্কিত হইলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সার মর্টিমার ডুরাণ্ড এক আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া আমীরকে প্রসন্ন করেন। এই নিষ্পত্তি অনুসারে আমীরের রাজ্য-সীমানা সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বাৎসরিক বৃত্তির টাকা বাড়াইয়া দিলেন। চিত্রল প্রদেশ বৃটিশ সীমান্তর্গত বলিয়া ধরা হইল।

ডুরাণ্ড সন্ধি

শাসন ও সমাজ সংস্কার :—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সদস্যপদ লাভের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব (Secretary of State for India) লর্ড ক্রস্ এক নূতন আইন পাশ করিয়া সেই অধিকার আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেন। এই বিধান দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা-সমিতি, পৌর-সভা প্রভৃতি কতকগুলি সরকার-নির্দ্দিষ্ট সাধারণ সভা-সমিতিকে ব্যবস্থা-পরিষদের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সভ্যেরা যাহাতে আয়ব্যয় বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন এবং শাসন-সম্পর্কীয় কার্য্যাবলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যবস্থাপক সভা সম্পর্কীয় আইন, ১৮৯২ খৃঃ

এই সময়ের আরও দুইটি আইন প্রণিধানযোগ্য। কারখানাগুলিতে নারী শ্রমজীবিগণ যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ না করে, তাহার জন্য একটি "কারখানা আইন" পাশ হয়, এবং বাল্যবিবাহ-জনিত সামাজিক দোষ দূর করিবার নিমিত্ত "সহবাস-সম্মতি আইন" (Age of Consent Act) প্রচলিত হয়।

কারখানা আইন
সহবাস-সম্মতি আইন

টাকার মূল্য হ্রাস :—রূপার মূল্য কম হইয়া যাওয়ায় রজতমুদ্রার বিনিময় মূল্যও কমিয়া গেল। সুতরাং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। গবর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গের নিকট রাজস্ব বাবদ রৌপ্য-মুদ্রা গ্রহণ করিতেন ; কিন্তু বিদেশীয়দের ঋণ মহার্ঘ স্বর্ণ-মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হইত। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর ক্ষতি হইল। এই বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত, লর্ড ল্যান্স-ডাউন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে টাকশালে অবাধে রৌপ্য-মুদ্রা প্রস্তুত প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়া টাকার মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন।

টাকশাল বন্ধ

লর্ড এলগিন (২য়) (১৮৯৪-৯৯) :—ক্যানিংএর পরবর্তী রাজ-প্রতিনিধির পুত্র লর্ড এল্‌গিন লর্ড ল্যান্সডাউনের পর এ দেশে বড়লাট হইয়া আসেন। তিনি আমদানি শুল্ক পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। তদ্ভিন্ন ভারতীয় কলকার-খানায় প্রস্তুত দ্রব্যের উপর একটি শুল্ক বসান হয়। ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতায় দেশীয় কলকারখানাগুলির আত্মরক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। আফিমের ব্যবসায় হইতে গবর্ণ-মেণ্টের প্রচুর অর্থাগম হইত। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়ায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এক আফিম তদন্ত সমিতি (Opium Commission) গঠিত হয়। কিন্তু এই নীতিবিরুদ্ধ ব্যবসায় আস্তে আস্তে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইতেও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিলম্ব হইল।

নূতন কর

আফিম

পর-রাষ্ট্র সম্পর্কীয় ব্যাপার :—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে "পামির নিষ্পত্তি"র ফলে বক্ষু (Oxus) নদী রুশ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা বলিয়া গৃহীত হয়। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশ প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। চিত্রল বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি সুরক্ষিত সীমান্ত দুর্গে পরিণত হইল। এই সকল কারণে স্থানীয় আফ্রিদি প্রমুখ পার্ব্বত্য জাতিগুলির

চিত্রল

মধ্যে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সমরানল জ্বলিয়া উঠে। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিরা মালভূমিতে একদল বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হয়। দুই পক্ষের ভীষণ সংগ্রামের পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল।

তিরার যুদ্ধ

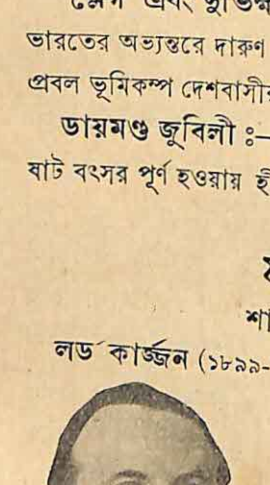
প্লেগ এবং দুর্ভিক্ষ :—সীমান্তে যখন ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল তখন ভারতের অভ্যন্তরে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। ইতিমধ্যে এক প্রবল ভূমিকম্প দেশবাসীর দুঃখকষ্ট আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

ডায়মণ্ড জুবিলী :—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ায় হীরক জুবিলী মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

শাসন সংস্কারের নবযুগ

লর্ড কার্জ্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খৃঃ) :—দ্বিতীয় লর্ড এল্‌গিনের পরে লর্ড কার্জ্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন।



লর্ড কার্জ্জন

লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতে আসেন তখন বিদ্যাবত্তা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার মত পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা তাঁহার সমকালীন ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কাহারও ছিল কি না সন্দেহ এবং তাঁহাকে যে ডালহৌসীর রাজনৈতিক শিষ্য বলা হয় তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি "উত্তর-পশ্চিম-

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ

সীমান্ত প্রদেশে"র সৃষ্টি করেন। পারস্যদেশে বৃটিশ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম বহু অর্থব্যয় করিয়া তিব্বতে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। বৃটিশ বাহিনী সহজেই লাসায় প্রবেশ করে। উহাতে সরকার বাহাদুরের মান বাড়িয়াছিল বটে কিন্তু রাজনৈতিক হিসাবে বিশেষ কিছুই সুবিধা হয় নাই।

তিব্বত অভিযান

সামন্তরাজ্যের সহিত সম্বন্ধঃ—দেশীয় রাজকুমারদিগকে যুদ্ধ-রীতি শিক্ষা দিবার জন্য লর্ড কার্জ্জন একটি সমর-শিক্ষার্থী রাজন্যবাহিনীর (Imperial Cadet Corps) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা দিবার শর্ত্তে নিজামের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বেরার প্রদেশটি গ্রহণ করেন

অভিজাতবর্গের সামরিক শিক্ষা

বেরার

শাসন-সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্য্যাবলীঃ—শাসন ব্যাপারে বড়লাট বহুবিধ সংস্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন। মহাজনের কবল হইতে কৃষকের জমি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পঞ্জাবে "ভূমি হস্তান্তর বিধি" (Punjab Land Alienation Act) নামে একটি আইন পাশ করা হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের মধ্যে আত্মনির্ভর ও মিতব্যয়িতা প্রসারের জন্য "কৃষি ব্যাঙ্ক" বা "সমবায় সমিতি" (Agricultural Banks or Co-operative Credit Societies) প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছিল। পুলিশ-বিভাগেরও সংস্কার সাধন করা হয়। কার্জ্জনের আয়-ব্যয়

পঞ্জাব "ভূমি হস্তান্তর আইন"

সমবায় সমিতি

শিল্প বাণিজ্য

পুলিশ

সম্বন্ধীয় সংস্কারগুলির মধ্যে লবণকর ও আয়করের হার কমান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে দরিদ্র জনসাধারণ উপকৃত হইয়াছিল।

লবণকর আয়কর

১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসীরা আন্তরিক শোক প্রকাশ করে। মহারাণী যে ভারতীয়দের নিকট শুধু তাহাদের দেশের শাসনকর্ত্রী বলিয়া সম্মানিত হইতেন তাহা নহে; তিনি তাহাদিগের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তম এড্ওয়ার্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন দিল্লীর দরবারে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ঘোষণা করেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু

অভিষেক দরবার ১৯০৩ খৃঃ

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের "বিশ্ববিদ্যালয় আইন" এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রসন্নমনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কারণ এই নূতন বিধানে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গবর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে রাখিবার চেষ্টা ছিল। তথাপি নূতন আইনে যে শুভফলপ্রসূ কোন বিধানই ছিল না এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। যদিও সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তীব্রভাবে এই নববিধির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি এই আইনের সাহায্যেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯০৪ খৃঃ

বঙ্গবিভাগাদি কয়েকটি ব্যাপারে কার্জ্জন বিচক্ষণতার পরিচয় দেন নাই। ইহাতে তিনি প্রজাবর্গের বিরাগভাজন হন। কন্‌ভোকেশনে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় বক্তৃতাকালে যখন তিনি

তাঁহার শ্রোতৃবর্গের এবং তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সত্যানুরাগ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তখন স্বভাবতই সকলে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

বঙ্গবিভাগ

শাসনের সুবিধার জন্য যখন কার্জ্জন বঙ্গ বিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে স্পষ্টভাবে শুনাইয়া দিল যে তিনি বাঙ্গালীর একতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক হিসাবে এই অভিযোগ সত্য, কারণ বঙ্গবিভাগের প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালার দুইটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধের সৃষ্টি হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ হইতে

জাতীয়তার বিকাশ

ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে এক নূতন যুগের আরম্ভ। এই সময়েই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে এবং বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি দেশনেতাদিগের অভ্যুদয় হয়। কার্জ্জন দেশের সম্মিলিত প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া এদেশের জাতীয়তাবাদীরাও বৃটিশ পণ্য-দ্রব্য বর্জ্জন করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসম্মিলনীতে দাদাভাই নৌরজী স্বরাজের দাবী করিয়াছিলেন। এই বারেই সর্ব্বপ্রথম ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্ভীকভাবে নিজেদের দাবীর কথা প্রচার করেন। আইন সঙ্গত আন্দোলন ব্যর্থ হইলে

বিপ্লবী দল

ক্ষুদ্র একটি বিপ্লবীদল রাজপুরুষদিগকে হত্যা করিয়া অভিলাষ সিদ্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

কার্জ্জন এদেশের জন্য যে সকল শাসন-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিই অন্যায্য বা অসন্তোষ-

প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ

কর নহে। ভারতীয় প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ যাহাতে রক্ষা পায় তাহার জন্য তিনি "প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ আইন" বিধিবদ্ধ করেন। সৈন্যদিগের উদ্ধত ব্যবহার হইতে সাধারণ লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার

বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কার্য্যকাল ফুরাইয়া গেলে, তিনি দেশে ফিরিয়া যান কিন্তু পুনরায় ভারতের শাসন-ভার পাইয়া এদেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা লর্ড এ্যাম্প্‌থিল অস্থায়িভাবে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পকাল পরেই সামরিক ও সাধারণ শাসন বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ লইয়া প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনরের সহিত কার্জ্জনের মতদ্বৈধ হয়; বিলাতের গবর্ণমেণ্ট কিচেনরের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সুতরাং বড়লাট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন; এ বিষয়ে কার্জ্জনের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইয়াছিল।

লর্ড এ্যাম্প্‌থিল

কার্জ্জনের পদত্যাগ

লর্ড মিণ্টো (২য়) (১৯০৫-১০ খৃঃ):—প্রথম লর্ড মিণ্টোর বংশধর দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো লর্ড কার্জ্জনের পর ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হন। নূতন রাজপ্রতিনিধি সরল ও নিরভিমানী যোদ্ধ্‌পুরুষ ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাদিগের সময় হইতে সঞ্চিত বহু রাজনৈতিক অশান্তি ও অসন্তোষ তাঁহাকে প্রশমিত করিতে হইয়াছিল। দেশব্যাপী চাঞ্চল্য দূরীভূত করিবার জন্য তিনি কয়েকটি অপ্রীতিকর আইনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার শাসনকাল সংস্কারের জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। নবজাত জাতীয় আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎপরিমাণে পূরণের নিমিত্ত তিনি ও ভারত-সচিব মর্লি ভারতীয়দিগকে কয়েকটি নূতন অধিকার দান করেন। নূতন ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আয়তন বৃদ্ধি করা হইল এবং বে-সরকারী সভ্যের সংখ্যা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল। ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় একজন ভারতবাসীকে সদস্য করিয়া লওয়া হইল এবং আমাদের বাংলাদেশের

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার

সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সর্ব্বপ্রথম সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনিই পরে রপুরের লর্ড সিংহ হইয়া বিহারের শাস কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রায়পুরের লর্ড সিং

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা (Executive Council) গুলিতেও একজন করিয়া ভারতীয় সদস্য লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই সংস্কার সকলের মনঃপূত না হওয়ায় রাজনৈতিক আন্দোলন সমানভাবেই চলিতে লাগিল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (২য়) (১৯১০-১৬ খৃঃ) ঃ—লর্ড মিণ্টোর পরে লর্ড হার্ডিঞ্জ (২য়) ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। ইনি পূর্ব্বতন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জএর (যিনি প্রথম শিখযুদ্ধ চালাইয়াছিলেন) পৌত্র।

সপ্তম এড্ওয়ার্ডের মৃত্যু

এই সময়ে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড পরলোক-গমন করিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় ইনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই ; তথাপি ইনি যুবরাজ অবস্থায় ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

সম্রাটের ভারত আগমন

১৯১১ খৃষ্টাব্দে নূতন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাজ্ঞী মেরীর সহিত ভারতে আগমন করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন বৃটিশ-নৃপতি ভারতে আসেন নাই। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের ক্ষুব্ধ প্রজাবর্গকে প্রসন্ন করিবার এই সুযোগ নষ্ট করেন নাই। সম্রাটের আজ্ঞানুসারে বঙ্গবিভাগ রহিত হইল, এবং শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠন করা হইল।

বঙ্গবিভাগ রহিত

আসাম প্রদেশ পূর্ব্ববৎ একজন চীফ্ কমিশনারের অধীন হইয়া গেল। ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। এই সময় শিক্ষার উন্নতিকল্পে কিছু টাকা বরাদ্দ করা

হয় এবং ভারতবাসীরা বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ "ভিক্টোরিয়া ক্রস্" পাইবার অধিকারী হইলেন। কোন কোন বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীর প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার হয় লর্ড হার্ডিঞ্জ তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের আরম্ভ

ইউরোপের সর্ব্বত্র যখন মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন ভারতবর্ষ বৃটিশরাজকে অর্থ ও লোক দিয়া সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

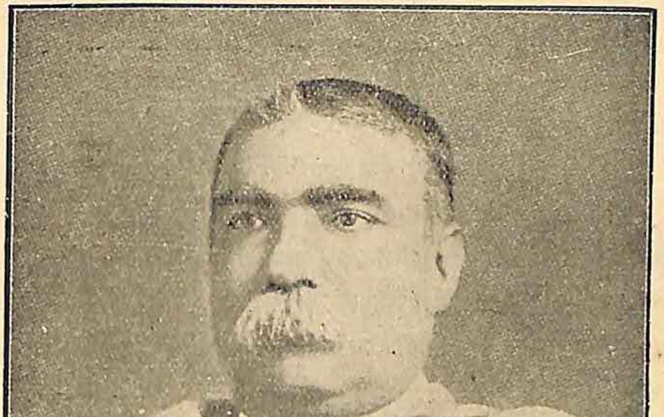
লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড (১৯১৬-২১ খৃঃ) :—লর্ড হার্ডিঞ্জের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতে আসিয়া উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন" নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ (এখন সার) মাইকেল স্যাড্‌লার এবং অন্যতম বিখ্যাত সদস্য ছিলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার সভা

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ এখানে কেবলমাত্র পরীক্ষা কার্য্য এবং নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন ভিন্ন অন্য কোন কাজ হইত না। কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের আইন বিধিবদ্ধ হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থলে এক বিরাট শিক্ষায়তন গড়িবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুসৃত হইয়াছিল। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা স্থির করিয়াছিলেন। এইজন্য বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডের সময়ে নূতন তদন্ত-সভা গঠিত হয়। এই সমিতি এক প্রকাণ্ড রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যাহার সংস্কারের জন্য এই সভা প্রধানতঃ গঠিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্তসমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

দেশের অবস্থা ; মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার :—১৯১৪-১৮



সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বহুপ্রকারে সাহায্য দান করিয়াছিল। ফলে ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীদিগের কয়েক-

জনকে "কিংস্ কমিশন" অর্থাৎ সম্রাট্ নিয়োজিত সেনানায়কের মর্য্যাদা অর্পণ করিয়া সম্মানিত করা হইল এবং বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ "ভিক্টোরিয়া ক্রস" উপহার দেওয়া হইল। দুইজন ভারতবাসী সাম্রাজ্যের সামরিক বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইলেন এবং ভারতবর্ষ "আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘে" (League of Nations) স্থান লাভ করিল। তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ ই. এস্. মণ্টেগু একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।

মহাযুদ্ধের পর ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা



মণ্টেগু

তিনি ভারতবর্ষের শাসনসংস্কার ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট মহাসভায় এমন একটি সুসংবাদ ঘোষণা করিলেন যে তাহাতে ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে একটা উল্লাসের সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু "রাউল্যাট্ আইন" নামে একটি দমন নীতি মূলক বিধান প্রবর্ত্তিত হইতেই ভারতবাসীর অসন্তোষের ভাব পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

রাউল্যাট্ আইন

পঞ্জাবের গোলযোগ যখন নিরতিশয় কঠোরতার সহিত প্রশমিত করা হয়, তখন ভারতবাসীর মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। এই সঙ্ক্ষোভের সময়েই তৃতীয় আফ্গান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহা বেশীদিন স্থায়ী হইল না, শীঘ্রই রাওলপিণ্ডির সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের অবসানে ইংলণ্ড-প্রমুখ বিজেতৃগণ তুর্কীদেশ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করেন, তাহার প্রতিবাদকল্পে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে "খিলাফৎ আন্দোলনে"র সৃষ্টি হইল এবং অমৃতসরের জালিয়ান্ওয়ালাবাগে গুলিবর্ষণে

পঞ্জাবে গোলযোগ
তৃতীয় আফ্গান যুদ্ধ

খিলাফৎ আন্দোলন

অসন্তুষ্ট হইয়া মহাত্মা গান্ধী "অসহযোগ আন্দোলন" আরম্ভ করিলেন। দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে "মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার" নামে প্রসিদ্ধ শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল।

মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলন

এই নব শাসন-পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বড়লাটের শাসন-পরিষদ বা কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় ভারতবাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয়; পূর্ব্বতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার স্থলে একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ (Council of State) এবং একটি ব্যবস্থাপক সমিতি (Legislative Assembly) গঠিত হইল। নূতন ব্যবস্থা পরিষদে দেশীয় লোকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যাধিক্য হইল। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদিগের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অর্দ্ধেক সভ্য ভারতবাসী হইবেন স্থির হইল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের ভার মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হয়। শান্তিরক্ষা, রাজস্ব প্রভৃতি বিভাগ পূর্ব্ববৎ প্রাদেশিক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তত্ত্বাবধানে রহিল। মন্ত্রীর হস্তে সমর্পিত বিভাগগুলি "হস্তান্তরিত বিভাগ" বলিয়া খ্যাত হইল। শাসনভার সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও বে-সরকারী মন্ত্রী এই দুই শ্রেণীর কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় নূতন প্রাদেশিক শাসন-পদ্ধতি "দ্বৈত-শাসন" (Diarchy) বলিয়া উক্ত হইয়াছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্য হইতে গবর্ণর কর্ত্তৃক মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতি ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ

মন্ত্রীর অধিকার হস্তান্তরিত বিভাগ

দ্বৈত-শাসন

মণ্টেগু প্রবর্ত্তিত শাসন-পদ্ধতি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যকামী রাজনৈতিক দলের তুষ্টিসাধন করিতে পারিল না। তাঁহারা বলিলেন যে ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও কেন্দ্রস্থ ব্যবস্থাপক সমিতির নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিতে পারেন এবং প্রাদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রকৃতপক্ষে জনমতানুবর্ত্তী করা হয় নাই। জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যের মতামত উপেক্ষা করিয়াও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্যের সাহায্যে মন্ত্রীরা তাঁহাদিগের চাকুরি বজায় রাখিতে পারিতেন। হস্তান্তরিত বিভাগ পরিচালনের জন্য এত কম টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল যে তাহা দিয়া দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি করা দুঃসাধ্য। অথচ বড়লাট এবং প্রাদেশিক লাটদিগের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মিগণ সেইজন্য নূতন ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন প্রবীণ নেতা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সহৃদয়তা প্রদর্শনের নিমিত্ত বঙ্গদেশবাসী লর্ড সিংহকে বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

নূতন শাসন পদ্ধতির দোষ-ত্রুটি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অধিনায়কতায় কংগ্রেসের মধ্যে একটি নূতন দলের সৃষ্টি হয়। তাঁহার অনুগামিগণ "স্বরাজপন্থী" নামে খ্যাত। তাঁহারা কোন কোন ব্যবস্থাপক সভার এবং মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ পৌরসভার অধিকাংশ সভ্যপদ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ্যদল

লর্ড রেডিং (১৯২১-২৬ খৃঃ) :— লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের পর লর্ড রেডিং ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। ইনি পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

পাইলে, লর্ড রেডিংকে ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। যুবরাজের ভারত ভ্রমণের ফলেও রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনন্তর মহাত্মা গান্ধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। লর্ড রেডিং যখন দেশে ফিরিয়া যান, তখন ভারত অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে; কিন্তু এ শান্তভাব প্রবল ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়।

যুবরাজের ভারতে আগমন

লবণ শুল্ক বর্দ্ধিত করিয়া লর্ড রেডিং এদেশবাসীর বিরাগভাজন হন। কিন্তু তাঁহার সময়ের অন্যান্য কয়েকটি শাসন-ব্যবস্থা এদেশের মঙ্গলের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে 'রাউল্যাট্ আইন' তুলিয়া দেওয়া হয়, ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে বিচার-বৈষম্য কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা হয়। এদেশীয় কলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর যে অন্যায় শুল্ক ছিল, তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ভারতে রাজকীয় নৌ-সেনাবিভাগ (Royal Indian Navy) গঠনের ব্যবস্থা করা হয়।

লর্ড রেডিংএর সংস্কার

লর্ড আরউইন্ (১৯২৬-৩১ খৃঃ):—পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড আরউইন্ যখন এদেশে আসিলেন, তখন রাজনৈতিক আকাশ পুনরায় মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। কারণ ভারতবাসীরা শুনিলেন যে কেবলমাত্র বৃটিশ সদস্য গঠিত একটি কমিশন শীঘ্রই ভারতে আসিতেছে এবং প্রধানতঃ ইঁহাদের প্রস্তাব অনুসারেই নূতন শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা হইবে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর লর্ড আরউইন্ ভারতবাসীর অসন্তোষ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত আশ্বাস প্রদান করিলেন যে শাসন সংস্কারের ফলে পরিণামে ভারত স্বশাসক বৃটিশ মহাজনপদ-

"সাইমন কমিশন"

নিচয়ের তুল্য মর্য্যাদা (Dominion Status) লাভ করিবে। লণ্ডনে বৃটিশ এবং ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের লইয়া "গোল-টেবিল বৈঠকের" পরে এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনেক শান্ত-ভাব ধারণ করিয়াছিল। কংগ্রেস গোড়ায় এই বৈঠকের সহিত কোন সহযোগিতা করে নাই, কিন্তু লর্ড আরউইন্ বিলাতে ফিরিবার পূর্ব্বে ভারতের বিশ্ব-বিশ্রুত নেতা মহাত্মা গান্ধীর সহিত একটি আপোষ নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গোল টেবিল বৈঠক

গান্ধী-আরউইন্ নিষ্পত্তি



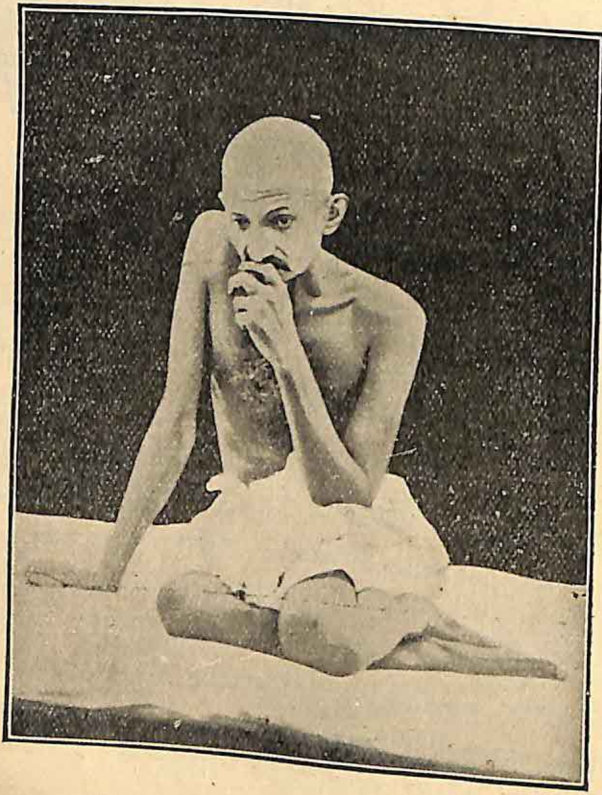
লর্ড আরউইন্

লর্ড উইলিংডন (১৯৩১-৩৬ খৃঃ) :—লর্ড আরউইনের পর লর্ড উইলিংডন এদেশের বড়লাট হইয়া আসিলেন। পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। শাসক ও শাসিতদিগের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিরোধ চলিতেছিল তাহা মিটাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর সহিত পুনরায় এক আপোষ মীমাংসায় উপনীত হন। কিন্তু এই চুক্তি শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না। অতঃপর ভারত সরকার দমন ও প্রসাদন এই "দ্বৈধ নীতি" (Dual Policy) অনুসরণ করিতে লাগিলেন—একদিকে আইন লঙ্ঘন ও সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ, অন্যদিকে প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য অব্যাহত চেষ্টা। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড আরউইন্ স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে ভারতে যে আশ্বাসবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের

দ্বৈধ নীতি

৬ই ফেব্রুয়ারী ভারত-সচিব সার সেমুয়েল হোর উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন। ঐ বৎসরেই আগষ্ট মাসে এক নূতন ভারত শাসন আইন (Government of India Act) বিধিবদ্ধ হইল। ইহা দ্বারা বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর আমূল সংস্কারের

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার বিধি



মহাত্মা গান্ধী

ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রচলিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে ভারত জুড়িয়া এক বিশাল "সংহত রাষ্ট্র" (Federation) প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলি এবং বৃটিশ ভারতের প্রদেশ সমূহ উভয়েই এই বিরাট রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভূত হইবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রসংহতি

দেরাদুনে ভারতীয় সামরিক শিক্ষালয় স্থাপন লর্ড উইলিংডনের শাসনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। উচ্চ সেতু নির্ম্মাণ, পয়ঃপ্রণালী খনন ও সংস্কার প্রভৃতি পল্লীবাসীর হিতকর অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির দিকে শাসক ও শাসিতগণের দৃষ্টি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতেছে। সিভিল এভিয়েসন (Civil Aviation) অর্থাৎ অসামরিক উদ্দেশ্যে আকাশপথে বিমান চালাইবার ব্যবস্থা দ্বারা যাতায়াত ও সংবাদ সরবরাহের সুবিধা করা নবযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নানাবিষয়ে দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ দুর্গতির কথাও ভুলিলে চলিবে না। প্রবল ভূমিকম্পের ফলে উত্তর বিহার, কোয়েটা এবং অন্যান্য কতিপয় ভূখণ্ড একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতীয় সামরিক শিক্ষালয় ও পল্লীসংস্কার

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বের পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইলে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহার রজত জয়ন্তী উৎসবের (Silver Jubilee) অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার কয়েক মাস পরেই ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী, সোমবার, সম্রাট্ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড (Edward VIII) নাম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই তিনি রাজপদ ত্যাগ করেন। অতঃপর

রজত জয়ন্তী ও সম্রাটের মৃত্যু

তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ষষ্ঠ জর্জ্জ নামে ইংলণ্ডের রাজমুকুট ধারণ করিয়াছেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

বর্ত্তমানযুগে শাসন-ব্যবস্থার ক্রম বিবর্ত্তন

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন

ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও জাতীয়তা বৃদ্ধিঃ—সিপাহী বিদ্রোহ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে এদেশের শাসন-ভার কোম্পানির নিকট হইতে ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। তদবধি বৃটিশ পার্লামেণ্টের অনুমোদন, এবং বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যতম সদস্য ভারত-সচিবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভারতের শাসনকার্য্য প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছিল। সর্ব্ব প্রথমে শাসন-ব্যাপারে শাসিতের বিশেষ কোন অধিকারই ছিল না। কিন্তু বৃটিশ সার্ব্বভৌম শাসনের ফলে ভারত ক্রমশঃ ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল। লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূর্ত্ত বিভাগ, ডাক বিভাগ, এবং ইলেক্‌ট্রিক্‌ টেলিগ্রাফ বা বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহের ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন অংশকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মিলিত হইবার সুযোগ প্রদান করে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন (University Act) অনুসারে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় জীবন গঠনের পথ সরল হইয়া আসিল।

ঐক্যের পথে অগ্রসর

এই প্রসঙ্গে দেশবাসীর উৎসাহ ও উদ্যমের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। বঙ্গদেশে "হিন্দু পেট্রিয়ট্" (The Hindoo Patriot), "অমৃতবাজার" ও "বেঙ্গলী" (The Bengalee) এবং মহারাষ্ট্রে "মরাঠা", "কেশরী" প্রভৃতি পত্রিকা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। জাতীয় জাগরণের ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে "কংগ্রেস" বা জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়।

ভারতবাসীর উৎসাহ ও উদ্যম

ভারতে শাসকবর্গের তুল্য মর্য্যাদা ও স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠাই ছিল এই জাতীয় মহাসভার মূল উদ্দেশ্য। ১৮৬১ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পর পর দুইটি ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্স্ এ্যাক্ট্ (Indian Councils Act) অর্থাৎ ব্যবস্থা-পরিষদ সংক্রান্ত বিধানের ফলে ব্যবস্থাপক সভাসমিতিতে বে-সরকারী সভ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলেও কার্য্যতঃ শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ কোন ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিগণকে দেওয়া হয় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে বঙ্গ-বিভাগ ব্যবস্থার প্রতিকারার্থ এক তুমুল আন্দোলন সৃষ্ট হয়। পর বৎসর কংগ্রেস মহাসভা দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে "স্বরাজ" লাভই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলিয়া ব্যক্ত করেন।

১৮৬১ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থা পরিষদ সংক্রান্ত বিধান

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার:—শাসন-কার্য্যে ভারতবাসীদের সহযোগিতা দেশ ও সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর বিবেচনা করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো এবং ভারতসচিব মিঃ মর্লি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের শাসন ও ব্যবস্থা-পরিষদের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। শাসনতন্ত্রের এই সংস্কার "মর্লি-মিণ্টো সংস্কার" নামে

শাসন ও ব্যবস্থা-পরিষদের সংস্কার

পরিচিত। নূতন ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ এবং গবর্ণর জেনারেল ও প্রাদেশিক গবর্ণরদের শাসন-পরিষদ বা কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার (Executive Council) পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের শাসক ও সচিবাতিরিক্ত সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৬ হইতে ৬০ করা হয়, এবং প্রাদেশিক পরিষদ্গুলির সভ্য-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বে-সরকারী সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

বে-সরকারী সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি

ব্যবস্থাপরিষদের সভ্যদিগকে বাজেট আলোচনা করিবার অধিকার দেওয়া হইলেও, মূল বাজেট অথবা তাহার কোন অংশ বিশেষে ভোট দিবার ক্ষমতা এবারেও দেওয়া হয় নাই। ভারতবাসীদের দেশ-শাসনকার্য্যে সহযোগী হইবার সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেল ও কয়েকজন ছোটলাটের শাসন-পরিষদে এক একজন ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করা হয়। বাংলা ও অন্যান্য কতিপয় বৃহৎ প্রদেশের গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সভ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনপ্রথা এই সময়কার ব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব।

শাসন-পরিষদে ভারতীয় সদস্য নিয়োগ

এই সংস্কারে ভারতে জনমতানুবর্ত্তী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেন্দ্রস্থ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ জনপ্রতিনিধিগণের নিকট দায়িত্ব-বিহীনই রহিয়া গেলেন। লাট বাহাদুরদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় ভারতবাসী নিয়োগের ফলে অথবা ভারত-সচিবের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভারতীয়ের নিয়োগে ভারতবাসীর আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইলেও, শাসন-তন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হইল না। ব্যবস্থা-পরিষদে বে-সরকারী সদস্যবৃন্দের কর্ত্তব্য কেবল শাসন-কার্য্যের দোষগুণ সমালোচনাতেই নিঃশেষিত হইত। কার্য্যকরীভাবে কোন সংস্কার প্রবর্ত্তনে তাঁহাদের বিশেষ কোন ক্ষমতাই ছিল না; কাজেই, স্ব-শাসন-

আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির পরিবর্ত্তে শাসন-কার্য্যে নিজেদের অধিকারের অভাবই দিন দিন বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই অবস্থা-সম্পর্কেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাটুটারী কমিশন (Indian Statutary Commission) নামক পার্লামেণ্ট নিয়োজিত তদন্ত সভা বলিয়াছেন যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল:—(১) কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সকল ব্যাপারে পুঞ্জীকৃত ক্ষমতা; (২) শাসক-কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপরিষদের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ; এবং (৩) সমগ্র ভারতশাসনের নিমিত্ত বৃটিশ পার্লামেণ্টের দায়িত্ব। এই ব্যবস্থায় ভারত-শাসনে ভারতীয় জনপ্রতিনিধির কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় নাই; কাজেই, মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের পরেও ভারতে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল।

শাসনতন্ত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য

দিল্লী দরবারের ঘোষণা:—১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। স্বয়ং সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী মেরী এই মহোৎসবকালে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে এতাদৃশ অনুষ্ঠান ও তাহাতে সম্রাটের উপস্থিতি বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে প্রথম। অভিষেক উপলক্ষে এই মহাসংসদ্ ভারত-ইতিহাসে এক উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। এই দরবারে সম্রাট্ নিজে ঘোষণা করেন যে, বঙ্গ-বিভাগ রহিত হইয়া অতঃপর বাংলা একটি গবর্ণর-শাসিত প্রদেশ বলিয়া বিবেচিত হইবে; বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া গঠিত নূতন প্রদেশের শাসনভার স-কাউন্সিল লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের উপর ন্যস্ত হইল; এবং আসাম

সম্রাটের উপস্থিতি

বঙ্গভঙ্গ রহিত

পুনরায় একটি চীফ্ কমিশনার-শাসিত প্রদেশরূপে গণ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজধানীও দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। এই সময়ে ব্যবস্থা-পরিষদের গঠন প্রভৃতিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত

মণ্টেগুর সংস্কার ব্যবস্থাঃ—এ যাবৎ কোন সংস্কারই ভারতবাসীর স্ব-শাসনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই। অবশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে মহাসমরের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইংলণ্ড এই যুদ্ধে বিব্রত হইয়া পড়িলে ভারতবর্ষ বৃটিশ রাষ্ট্রসংঘের কল্যাণ কামনায় ইংলণ্ডকে অর্থ ও লোক দ্বারা যথাশক্তি সাহায্য করে। ইহারই অন্যতম ফলস্বরূপে তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ভারতবাসীকে শাসনকার্য্যের প্রত্যেক বিভাগে সহযোগিতার সুযোগ প্রদান, এবং স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রমোন্নতি দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে স্তরে স্তরে ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত করিয়া তোলাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। এই ঘোষণায় ভারতে রাজনৈতিক বিক্ষোভ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। কিন্তু রাউল্যাট্ বিল্ (Rowlat Bill) নামক দমননীতিমূলক আইন পাশের সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষ-বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল।

স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রমোন্নতি

এই অবস্থায় ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এদেশে আসেন ও গবর্ণর জেনারেল লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহযোগিতায় ভারত-শাসন সংস্কার সম্পর্কে এক রিপোর্ট (Report on Indian Constitutional Reforms) প্রকাশ করেন। তাহাতে সংস্কারের ভিত্তি-স্বরূপ তাঁহারা নিম্নোক্ত চারিটি মূল নীতির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

ভারত শাসন সংস্কারের রিপোর্ট বা বিবৃতি

(১) বাহিরের হস্তক্ষেপ ব্যতীত জিলা ও পল্লী অঞ্চলের স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি যথাসম্ভব জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা, (২) প্রদেশ-সমূহেই সর্ব্ব-প্রথম দায়িত্বপূর্ণ গণ-শাসনের (Responsible Government) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, (৩) ভারতের কেন্দ্রস্থ-শাসন বৃটিশ পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা, এবং (৪) এদেশের জনপ্রতিনিধিবর্গের শাসন-দায়িত্ব-লাভের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রস্থ-শাসন ও প্রাদেশিক শাসনের উপর বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও ভারত-সচিবের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে অপসারিত করা।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কারের মূল নীতি

এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে এক নূতন ভারত-শাসন-আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে প্রদেশগুলির শাসন-কার্য্য সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এইরূপ দ্বিধা-বিভক্ত শাসনের নাম দ্বৈত শাসন (Diarchy)। "সংরক্ষিত" বিষয় সমূহ গবর্ণরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধীন। এই সকল বিষয়ের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা (Executive Council) গবর্ণরের নিকট দায়ী। তাহাতে ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council)স্থিত জনপ্রতিনিধিবর্গের মারফতে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর হস্তক্ষেপের বিশেষ কোন অধিকার নাই।

প্রাদেশিক দ্বৈত-শাসন-ব্যবস্থা

"হস্তান্তরিত" বিষয়ের ভার ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন কতিপয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত। এই পরিষদগুলিতে আবার বে-সরকারী নির্ব্বাচিত (elected) সভ্যের সংখ্যাধিক্য। পূর্ব্বে বাজেট সম্বন্ধে প্রাদেশিক পরিষদগুলির শুধু সমালোচনার অধিকার ছিল; কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় ভোটের অধিকারও দেওয়া হইল।

নূতন সংস্কারের ফলে ভারত-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থ বিধিপ্রণয়ন-পরিষদে দুইটি কক্ষের (chamber) সৃষ্টি হইল—ব্যবস্থাপক জনসমিতি বা লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্‌ব্লি (Legislative Assembly) ও রাষ্ট্রীয় সভা বা কাউন্সিল অব ষ্টেট (Council of State)। শাসন-কার্য্যের কেন্দ্রীয় সমস্ত বিষয়গুলিই গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার তত্ত্বাবধানে আছে। এপর্য্যন্ত সাধারণতঃ প্রধান সেনাপতি এবং অপর ছয় জন সভ্য লইয়াই বড়লাটের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা বা শাসন পরিষদ (Executive Council) গঠিত হইয়া আসিতেছে। এই সভ্যগণ তাঁহাদের কার্য্যের জন্য স্বয়ং গবর্ণর জেনারেলের নিকট দায়ী। কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ক্ষমতা এই সভ্যবৃন্দের কার্য্যসমূহের সমালোচনাতেই পরিসমাপ্ত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ সরকারের বাজেট আলোচনা এবং কতকগুলি বিশিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ভোট দিবার অধিকারও লাভ করিয়াছে। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড আইন অনুসারে বৃটিশ শাসকগণের হস্তে পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল। ভারত-সচিব নামক পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্ব-সম্পন্ন বৃটিশ মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহারা এই সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভারত সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভারত-সচিবের হস্তে ন্যস্ত। ইণ্ডিয়া-কাউন্সিল (India Council) বা ভারত-সভা সংজ্ঞক পরামর্শ-সভার সহিত আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইন প্রণয়নের পর এক রাজ-আদেশপত্র অনুসারে ভারতীয় হাই কমিশনারের পদ সৃষ্টি হয়। এই রাজকর্ম্মচারী ভারত-সরকারের অধীন। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের অভিভাবকত্ব

হাই কমিশনারের পদ সৃষ্টি

এবং বিলাত হইতে ভারত-সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা তাঁহার প্রধানতঃ কর্ত্তব্য।

সাইমন কমিশন ও নূতন শাসন ব্যবস্থা ঃ—মণ্টেগু প্রবর্ত্তিত দ্বৈত-শাসনের ব্যর্থতার প্রধান কারণগুলির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার আইন প্রণয়নের দশ বৎসর পরে ভবিষ্যৎ সংস্কারকল্পে ভারতের অবস্থা তদন্তের জন্য একটি রয়াল কমিশন বসিবে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনে এই ব্যবস্থা ছিল। স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবর্গ গঠিত স্বরাজ্যদল কোন কোন অঞ্চলে দ্বৈত-শাসনের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে শুধু পার্লামেণ্টের সভ্য গঠিত এক কমিশন ভারতের অবস্থা তদন্তের জন্য এদেশে উপস্থিত হয় এই তদন্ত সভায় ভারতবাসীর স্থান ছিল না। প্রধানতঃ এই কারণে উক্ত কমিশন ভারতের প্রভাবশালী জননায়কগণের সহযোগিতালাভে সমর্থ হয় নাই। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরেই বিলাতে বৃটিশ ও ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং সামন্ত নৃপতিদের লইয়া এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করা হয়। ইতিমধ্যে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আরুউইন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণা করেন। তাহাতে উল্লিখিত ছিল যে, তিনি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে ভারতবাসীদিগকে জানাইতেছেন যে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগুর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণার মর্ম্মানুযায়ী শাসন-সংস্কারের চরম লক্ষ্য

দ্বৈত-শাসনের ব্যর্থতা

তদন্ত সভা ও গোলটেবিল বৈঠক

গোলটেবিল বৈঠক

আরুউইনের ঘোষণা, ১৯২৯ খৃঃ

ভারতবর্ষকে স্বশাসক বৃটিশ মহাজনপদসমূহের মর্য্যাদা (Dominion Status) দান। কংগ্রেস প্রথমে এই বৈঠকে যোগদান করে নাই। বৃটিশ রাজ-নৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি, ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজ্যের প্রতিনিধি এবং ভারতের কয়েকজন রাজনীতিজ্ঞের সমন্বয়ে ঐ বৈঠক হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গ কতকগুলি শর্ত্তে ভারত জুড়িয়া এক বিশাল "সংহত" রাষ্ট্র (Federation) গঠনে এবং তাহাতে যোগদানে সম্মত আছেন, এই কথাটি এই বৈঠকে জানা গেল। প্রথম বৈঠকের পর ভারতের বিশ্ব-বিশ্রুত নেতা মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভারত-সরকারের একটি আপোষ মীমাংসা হয়। উহা গান্ধী-আরুইন চুক্তি (Gandhi-Irwin Pact) বলিয়া খ্যাত। ফলে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে পরবর্ত্তী গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

স্ব-শাসক মহাজনপদসমূহের মর্য্যাদা

ভারতীয় রাষ্ট্রসংহতি

গান্ধী-আরুইন চুক্তি

উপর্য্যুপরি গোল টেবিল বৈঠকের দুইটি অধিবেশন হইল; কিন্তু তাহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন মীমাংসাই হয় না দেখিয়া, বৃটিশ রাজ্যের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড তাঁহার "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" (Communal Award)র সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে সরকার মনোনীত স্বল্পসংখ্যক প্রতিনিধির মধ্যে শাসন-সংস্কারের যে আলোচনা হয়, তাহারই ফলে বৃটিশ-ভারতীয় প্রদেশসমূহ, এবং করদ ও মিত্র রাজ্যের সমন্বয়ে বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক এক সংঘীভূত রাষ্ট্রের (Federation) পরিকল্পনা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের "হোয়াইট পেপার"-সংজ্ঞক সরকারী বিবৃতিতে

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

"হোয়াইট পেপার"

প্রকাশিত হয়। এদিকে এই "বাঁটোয়ারা" অনুসরণে জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় মহাত্মা গান্ধী অগ্রণী হইয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর পুণাতে উচ্চবর্ণের হিন্দু (Caste Hindu) ও অনুন্নত হরিজন (Depressed বা Scheduled Class Hindu) সম্প্রদায়ের মধ্যে এক আপোষ মীমাংসা করেন। এই মীমাংসা "পুণা-চুক্তি" (Poona Pact) নামে পরিচিত। ইহার ফলে কতকগুলি বিশেষ শর্ত্ত অনুযায়ী উচ্চ ও অনুচ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দুদের একত্রে ভোট দিবার ব্যবস্থা হয়।

"পুণা-চুক্তি"

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে "সংঘীভূত রাষ্ট্র" পরিকল্পনার সমালোচনার্থ বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডস্ এবং হাউস অব কমন্স্ উভয় সভা হইতে মনোনীত সদস্য লইয়া এক যুগ্ম সমিতির (Joint Committee) অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজ্য এবং বৃটিশ ভারতের কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণান্তে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যুগ্ম সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া পর বৎসর পার্লামেন্টের উভয় সভা কর্ত্তৃক ভারত শাসন-আইন পাশ হয়।

পার্লামেন্টের যুগ্ম সমিতি

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন ঃ—এযাবৎ শাসনকার্য্য যে প্রণালীতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া এই আইন অনুসারে সমগ্র ভারত জুড়িয়া এক "সংহত" রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্ম্মা ও এডেন ব্যতীত গবর্ণর-শাসিত ও চীফ্ কমিশনার শাসিত বৃটিশ প্রদেশসমূহ এবং করদ ও মিত্র রাজ্যের সমন্বয়ে এই সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠিত হইবে। বিভিন্ন সময়ের নানাপ্রকার সন্ধি ও সনদ অনুযায়ী ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজ্যগুলির সহিত বৃটিশরাজের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে

সামন্ত রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ

জটিলতার অভাব নাই। বৃটিশ ভারতে নব শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পার্লামেণ্টের পক্ষে যত সহজ, সামন্ত নৃপতিবর্গের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় তত সহজ নহে। এইজন্য ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, দেশীয় সামন্ত রাজ্যসমূহ শাসন-সংক্রান্ত কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সম্মিলিত রাষ্ট্রে "যোগদান করিবার অঙ্গীকার-মূলক দলিল" (Instrument of Accession) লিখিয়া রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই ভাবে সামন্তরাজ কর্ত্তৃক অর্পিত বিষয়গুলি সম্মিলিত রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থ সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। অপরাপর বিষয় রাজন্যবর্গের নিজ অধিকারেই থাকিবে। এই বিষয়গুলির সঙ্গে সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে (His Majesty's Representative) গবর্ণর জেনারেলের সম্বন্ধ থাকিতে পারিবে।

গবর্ণর জেনারেল ভারত-রাষ্ট্রসংঘের অধ্যক্ষ থাকিবেন। শাসন-কার্য্যের শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থ শাসন বিভাগগুলিকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এই দুই শাখায় বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সংরক্ষিত বিষয়ের তত্ত্বাবধানতা সম্পূর্ণরূপে গবর্ণর জেনারেলের বিবেকবুদ্ধির (discretion) উপর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য তিনি উর্দ্ধপক্ষে তিন জন উপদেষ্টা (Counsellor) নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাঁহাদের দায়িত্ব শুধু গবর্ণর জেনারেলের নিকটে সীমাবদ্ধ থাকিবে। ভারতবর্ষ অথবা তাহার কোন অংশ বিশেষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, সম্মিলিত রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদলের স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে গবর্ণর জেনারেলের "বিশেষ দায়িত্ব" (Special responsibility) বর্ত্তমান। এই সকল ব্যাপারে গবর্ণর জেনারেল "নিজ বিবেচনামত" (Individual judgment) ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

গবর্ণর-জেনারেল

কেন্দ্রস্থ মন্ত্রিমণ্ডল

সম্মিলিত রাষ্ট্রে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির পর্য্যবেক্ষণের জন্য গবর্ণর জেনারেলের এক মন্ত্রিমণ্ডল হইবে। এই মন্ত্রিমণ্ডলে দশ জনের বেশি মন্ত্রী থাকিবে না। মন্ত্রিগণ সম্মিলিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদ্ হইতে নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের কার্য্যকাল গবর্ণর জেনারেলের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করিবে।

সম্মিলিত রাষ্ট্রের আইন সভা

সম্মিলিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদে কাউন্সিল অব ষ্টেট (Council of State) এবং হাউস অব এ্যাসেম্‌ব্লি (House of Assembly) নামক দুইটি কক্ষ বা সভা থাকিবে। কাউন্সিল অব ষ্টেটের সভ্যসংখ্যা ২৬০এর অধিক হইবে না ; তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি থাকিবে ১৫৬ জন এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি উৰ্দ্ধপক্ষে ১০৪ জন। আর হাউস অব এ্যাসেম্‌ব্লিতে বৃটিশ ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা হইবে ২৫০, এবং করদ ও মিত্র রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবে উৰ্দ্ধপক্ষে ১২৫ জন। কাউন্সিল অব ষ্টেটে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান ও ভারতায় খৃষ্টান সম্প্রদায় ব্যতীত সকল প্রতিনিধিই বিভিন্ন ভূভাগের নির্ব্বাচনকেন্দ্র (territorial constituency) হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইবে। হাউস অব এ্যাসেম্‌ব্লিতে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যাদি গঠিত বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনেরই (indirect election) ব্যবস্থা হইয়াছে। রাষ্ট্রসভা বা কাউন্সিল অব ষ্টেটই উৰ্দ্ধতনসভা (upper chamber) এবং ইহা এক হিসাবে চিরস্থায়ী হইবে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং শূন্যস্থানগুলিতে নূতন সভ্য গ্রহণ করা হইবে। হাউস অব এ্যাসেম্‌ব্লি সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইবে, কিন্তু যে কোন সময় গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করিলে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

পূর্ণ রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার এখনও বিলম্ব আছে মনে হয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল সেই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। নব গঠিত সিন্ধু ও উড়িষ্যা প্রদেশ সহ বৃটিশ ভারতে মোট এগারটি গবর্ণর-শাসিত প্রদেশ বর্ত্তমান। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইন অনুসারে রাজার প্রতিনিধিরূপে গবর্ণরগণই এই প্রদেশগুলির মুখ্য শাসক। তাঁহারা মন্ত্রীসভার পরামর্শমত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে অবস্থা বিশেষে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি (Individual judgment) অনুযায়ী কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষা এবং সরকারী কর্ম্মচারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকাররক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যের জন্য গবর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব (Special responsibility) বর্ত্তমান। এই দায়িত্ব অনুযায়ী কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নূতন শাসন পদ্ধতিতে প্রয়োজনবোধে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ন করিবার অধিকারও দেওয়া হইয়াছে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও রক্ষাবিধি

মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসাম ব্যতীত সকল প্রদেশেই ব্যবস্থাপরিষদে একটি করিয়া কক্ষ আছে। এই সভা লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্‌ব্লি (Legislative Assembly) নামে পরিচিত। লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্‌ব্লির মেয়াদ সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর। পূর্ব্বোক্ত ছয়টি প্রদেশে লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্‌ব্লি ব্যতীত লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল নামে একটি উর্দ্ধকক্ষও আছে। ইহা একটি স্থায়ী সভা, প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করিলে, সেইস্থলে নূতন সভ্য লওয়া হইবে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ্

বৃটিশ বালুচিস্তান, দিল্লী, আজমীর-মেরবাড়া, কুর্গ, আন্দামান-

নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ এবং পন্থ পিপ্‌লোডা এই ছয়টি ভারত-রাষ্ট্রান্তর্গত চীফ্ কমিশনারের প্রদেশ। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইন অনুসারে গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং এক একজন চীফ্ কমিশনারের সাহায্যে উপরোক্ত প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসন পরিচালনা করিবেন। বর্ম্মা ও এডেন এখন আর ভারত সরকারের অধীন নহে।

চীফ্ কমিশনারের প্রদেশ

শাসন-কার্য্যের এই নূতন ব্যবস্থায় সম্মিলিত রাষ্ট্র এবং তাহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংঘর্ষের মীমাংসার জন্য একটি সংঘকেন্দ্রস্থ বিচারালয় (Federal Court) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নূতন আইন অনুসারে দিল্লীতে ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থ বিচারালয়ের (Federal Court) স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিচারালয়ে একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন সাধারণ বিচারপতি আছেন। ইহাতে আদি বিচার-বিভাগ (Original jurisdiction) এবং আপীল বিভাগ দুই-ই আছে। এই বিচারালয়ের আদি-বিভাগের ভারত-শাসন-আইন অথবা রাজাদেশ-পত্র সম্বন্ধীয় যে কোন রায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলিবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিতে হইলে অনুমতি প্রয়োজন হইবে।

সংঘকেন্দ্রস্থ বিচারালয়

সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত-সচিবের লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাহার স্থানে ভারত-সচিব নিজেই ভারতসম্পর্কীয় ব্যাপারে উপদেশাদি প্রাপ্তির জন্য তিন হইতে ছয় জন পর্য্যন্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করা এবং তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করা ভারত-সচিবের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

ভারত-সচিব

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

ইংরেজ রাজত্বে দেশের অবস্থা

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন :—ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যা বিবিধ প্রকারের এবং তাহা নানাভাবে বিভিন্ন আচার এবং নানাধর্ম্মাবলম্বী জনগণের সংস্কারের সহিত জড়িত। কিন্তু দেড়শত বৎসরের অধিককালব্যাপী বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতীয়গণের সামাজিক এবং ধর্ম্মজীবনে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। বহুবিবাহ কমিয়া গিয়াছে এবং সহমরণ ও পর্দ্দাপ্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। স্ত্রী-শিক্ষারও প্রসার হইতেছে। আবার অন্যদিকে জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীতেও বহু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে।

সামাজিক পরিবর্ত্তন

কোনও দেশের উন্নতি অথবা অবনতির অন্যতম মাপকাঠি জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় সাড়ে আট কোটি বা শতকরা ৩২ ভাগ। অবশ্য এই বৃদ্ধি যে কতক পরিমাণে পতিত জমির উদ্ধার এবং নূতন জমিতে কৃষির প্রবর্ত্তনের জন্য হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতে জিনিষপত্র প্রভৃতির মূল্যের বৃদ্ধি সম্পর্কে যে অনুসন্ধান হইয়াছিল তাহার রিপোর্টে (Report on the Enquiry into the Rise of Prices in India) দেখা গিয়াছিল যে, যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার উন্নতির পরিচায়ক সে সকল দ্রব্য অধুনা ভারতে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে।

জনসংখ্যা

আর্থিক উন্নতি

কৃষি :—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের শতকরা ৭০ জনের অধিক লোকের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য্য। কূপ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি দ্বারা জলসেচনের ব্যবস্থা এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্রুত নানাস্থানে পাঠাইবার সুবন্দোবস্তের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের অনেক ভূমি বড় বড় খাল কাটিয়া উর্ব্বর করা হইতেছে। বিহারে শোন নদ হইতে খাল কাটিয়া জল লইয়া জমিতে সরবরাহ করা হয়। দক্ষিণ ও মধ্যভারতের অনেক স্থানে হ্রদ অথবা অন্যান্য জলাশয় (Reservoir) হইতে জমিতে জলসেচন করা হয়। মাদ্রাজে নদীগুলির মোহানার মুখে বাঁধ দিয়া সেই জল কাটা খালের সাহায্যে জমিতে চালাইয়া দেওয়া হয়। সিন্ধু দেশে বিখ্যাত লয়েড বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথের কাবেরী অঞ্চলে, পঞ্জাবের শতদ্রু নদীর উপত্যকায় বাঁধ ও পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। এইরূপে কূপ, খাল প্রভৃতির সাহায্যে পতিত জমিকে উদ্ধার করা হইতেছে এবং প্রতি বৎসরই বহু বিঘা জমিতে নূতন চাষ-আবাদ আরম্ভ করা হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব খালের সাহায্যে স্বল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক গতি সরবরাহের ব্যবস্থাও হইয়াছে।

জল সেচনের ব্যবস্থা

লয়েড বাঁধ

বৈদ্যুতিক গতি সরবরাহ

উৎকৃষ্ট বীজ এবং বহুবিধ উপকরণ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া ভারতীয় জমিতে চাষের জন্য সরবরাহ করা হয়। কৃষকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কৃষি সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণার নিমিত্ত সরকার হইতে স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র (Model Agricultural Farms) এবং গবেষণাগার স্থাপন করা হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে দিল্লীর (ইতিপূর্ব্বে পুষায় অবস্থিত) গবেষণাগার, বাঙ্গালোরের গবাদি পশু সংক্রান্ত বিদ্যালয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া যে প্রকারের বীজ ভারতের স্থান বিশেষে অধিক ফসল উৎপাদনে সমর্থ বলিয়া মনে করেন, সরকার সেই সেই স্থানের কৃষকদিগের মধ্যে সেই প্রকারের বীজ বিতরণ করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতিরেকে নানাস্থানে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ আধুনিক প্রণালীতে চাষ এবং গবাদি পশু ও পক্ষি প্রভৃতি পালন করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছেন।

কৃষি-গবেষণাগার

কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য নানাস্থানে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় এবং যাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য সন্তোষজনক তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হয়।

কৃষি প্রদর্শনী

কৃষি সম্বন্ধীয় রাজকীয় কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার বাহাদুর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লীতে কৃষি-অনুসন্ধান-সংসদ্ (Imperial Council of Agricultural Research) প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারত সরকারের কৃষি বিষয়ের উপদেষ্টার কার্য্য এই নব গঠিত সভার হাতে চলিয়া যায়। পশুপালন এবং কৃষি-বিষয়ক গবেষণার উৎসাহ দেওয়া এবং সাহায্য করা এবং বিদেশে গবেষণায় প্রাপ্ত ফল ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এই অনুসন্ধান সংসদের প্রধান কার্য্য। এই সংসদ্ গবেষণাকারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

সাম্রাজ্যকেন্দ্রস্থ কৃষি-অনুসন্ধান-সংসদ্

দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও প্রতিকার:—ভারতে ইংরেজ অধিকারের বহু পূর্ব্ব হইতেই দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যথাসাধ্য সাহায্য দানের ব্যবস্থা আছে।

প্রথমে লর্ড লিটনের আমলের দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী যে ব্যবস্থা হয় তাহা "দুর্ভিক্ষ বিধি" (Famine Code) নামে পরিচিত এবং সেই বিধান অনুসারে এখনও কার্য্য হয়। অনাবৃষ্টির জন্য জলের অভাবে যাহাতে কৃষির ক্ষতি এবং দুর্ভিক্ষ না হয় তাহার জন্য খাল কাটিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় এবং দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে সেই অঞ্চলে পথঘাট ও রেল-পথ নির্ম্মাণ করিয়া খাদ্যদ্রব্যাদির দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

"দুর্ভিক্ষ বিধি"

দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিবর্গকে খাল কাটা, পুষ্করিণী খনন, রেল লাইন স্থাপন, পথঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রশমনের চেষ্টা করা হয়। আবার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদের খাজানা প্রভৃতি হইতে রেহাই দিবার ব্যবস্থাও আছে। প্রজাদিগকে সরকার হইতে বিনামূল্যে খাদ্য ও বস্ত্রাদি বিতরণ করিবারও নিয়ম আছে। চাষের সময় আসিলে কৃষকদিগকে ধান্যের বীজ কিনিবার জন্য সরকার নামমাত্র সুদে টাকা ধারও দিয়া থাকেন। প্রাদেশিক সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবার কালে দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য কতক টাকা পৃথক্ করিয়া রাখিবার বিধি আছে।

দুর্ভিক্ষে নির্ম্মাণ কার্য্য

খাজানা মাপ

বীজ ক্রয়ের জন্য টাকা ধার

পল্লীসংস্কার ও সংগঠন :—সম্প্রতি ব্যাপকভাবে পল্লীসংস্কার ও সংগঠনের দিকে জননায়কগণের ও সরকারের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পল্লীসংস্কারের জন্য ভারত সরকার প্রায় ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সুসম্পাদনই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য :—(১) পানীয় জল সরবরাহ, (২) গ্রামের লোকের চিকিৎসা, (৩) স্বাস্থ্যরক্ষা, (৪) জলনিকাশ, (৫) লোকচলাচলের ব্যবস্থা

সংস্কারের জন্য টাকা মঞ্জুর

(৬) নদীসংস্কার, (৭) সর্ব্বসাধারণের জন্য খেলাধূলা ও অবসর যাপনের ব্যবস্থা, (৮) শিক্ষা প্রচার, (৯) কৃষিকার্য্য ও পশু চিকিৎসা, (১০) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি।

পল্লী সংগঠন এবং ভারতীয় কৃষকের দুরবস্থা দূর করিবার প্রচেষ্টায় নানাপ্রকারের সমবায় সমিতিগুলির কার্য্য প্রশংসনীয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে

সমবায় সমিতি

সমবায় ঋণদান বিষয়ক আইন পাশ হয়। পরে এই বিষয়ে আরও অনেক নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। মহাজনদিগের হস্ত হইতে কৃষকদিগকে উদ্ধার করিয়া নামমাত্র সুদে টাকা ধার, কৃষির উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ, মিতব্যয়িতা, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও অন্যান্য নানাবিষয়ে উন্নতি সাধনের ফলে অতি অল্প কালেই সমবায় সমিতিগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া

ব্যক্তিগত চেষ্টা

উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলেও পল্লী উন্নয়ন কার্য্য যথেষ্ট অগ্রসর হইতেছে। এই প্রসঙ্গে কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীনিকেতনপ্রতিষ্ঠা, স্যার্ ডেনিয়াল হ্যামিলটন মহোদয়ের সুন্দরবনস্থ গোসাবা অঞ্চলে এবং পঞ্জাবের মিঃ ব্রেইন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত গুরগাঁও জেলার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্যরক্ষা :—বৃটিশ ভারতের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার চিকিৎসা ও

স্বাস্থ্য বিভাগ

স্বাস্থ্য বিভাগের (Public Health Department) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ইষ্ট

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা

ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেই নানাস্থানে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। ১৮৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপিত হয়। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা বে-সরকারী লোকের উদ্যমেই হইয়াছে। বর্ত্তমানে অনেক জেলাতেই সরকারী চিকিৎসালয়

আছে এবং তাহা সরকারী কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সরকারী চিকিৎসালয়

ইহা ভিন্ন শহরে শহরে মিউনিসিপ্যালিটি এবং পল্লী অঞ্চলে জেলাবোর্ডগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতেছে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারি উপস্থিত হইলে সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি সমবেতভাবে তাহা দমনের চেষ্টা করিয়া থাকে। সম্প্রতি

স্ত্রী-চিকিৎসক

স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার জন্য স্ত্রী-চিকিৎসক ও ধাত্রীদিগের শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লেডি ডাফ্‌রিণ "ভারতীয় স্ত্রীলোকের চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য জাতীয় সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। লেডি হার্ডিঞ্জ দিল্লীতে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

শিশু-মৃত্যু নিবারণ ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে। এই কার্য্যে লেডি চেম্‌স্‌ফোর্ড কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান

"নিখিল ভারতীয় মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান", লেডি রেডিং কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত "জাতীয় শিশু সপ্তাহ", "রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান", পুণার "সেবাসদন সমিতি", "ভারত সেবা সঙ্ঘ" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছে।

ভারতীয় রোগ ও তাহার প্রতিষেধক ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার

গবেষণা

জন্য সরকার উৎসাহ দিতেছেন। কলিকাতায় এইজন্য "স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন" বিশেষভাবে কার্য্য করিতেছে। বৎসর বৎসর এই উদ্দেশ্যে ভারতের নানাস্থানে চিকিৎসকগণ সম্মিলিত হন এবং আলোচনা দ্বারা গবেষণা

কার্য্যে সাহায্য করেন। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কালাজ্বর, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ক্ষিপ্ত জন্তুদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য কসৌলিতে, মাদ্রাজের কুন্নুর নামক স্থানে এবং শিলং শৈলাবাসে "ভারতীয় পাস্তুর চিকিৎসালয়" স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনেও এই প্রকারের রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মহামারির প্রতিষেধক টীকা ও ইঞ্জেকসন্ প্রভৃতিরও বহুল প্রচার সাধিত হইয়াছে। বাতুল ও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত-দিগের চিকিৎসার জন্য স্থানে স্থানে বাতুলাশ্রম ও কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

পাস্তুর চিকিৎসালয়

পশ্বাদির চিকিৎসার জন্যও নানাস্থানে পশু চিকিৎসালয়, পিঁজরা-পোল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সরকার ভ্রাম্যমাণ পশু চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেছেন।

পশু চিকিৎসালয়

কলকারখানা—ভারতের কল ও কারখানার সংখ্যা আট হাজারের অধিক এবং এই সকল কলকারখানাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কর্ম্মচারী প্রতিদিবস কার্য্য করিতেছে। প্রথম কাপড়ের কারখানা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কলকারখানার সংখ্যা বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলাদেশ এবং আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তূলা, পাট, লৌহ ও ইস্পাত এবং চিনির কলকারখানাগুলির প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বোম্বাই, আমেদাবাদ শোলাপুর, বঙ্গদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাট বঙ্গদেশের প্রায় একচেটিয়া। লৌহ ও ইস্পাতের বড় কারখানার মধ্যে জামসেদপুরের

পাট

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানির প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চামড়া, ঔষধ-পত্রাদি, কাগজ, চিনি, দিয়াশলাই, সিমেণ্ট, কাচ, তেল, কালি, কয়লা, পেট্রোল, চা প্রভৃতির শিল্পও বর্ত্তমানে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানাপ্রকারের কারখানার সংখ্যা এবং তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বর্ত্তমান-কালে অধিবাসীবৃন্দের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অধিকাংশ এদেশেই প্রস্তুত হয় বলা চলে। খনিজ দ্রব্যের পরিমাণও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কংগ্রেস ও সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্র শিল্প এবং বিশেষভাবে কুটির-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইতেছে। প্রত্যেক প্রদেশেই একজন ডিরেক্টরের অধীনে শিল্প-বিভাগ আছে। কুটির-শিল্পীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রদর্শনী প্রভৃতিও খোলা হইতেছে।

টাটা কোম্পানি

খনিজ দ্রব্য

কুটির-শিল্প

কলকারখানার এবং খনির মজুরদিগের সুখ সুবিধার জন্য অনেক আইন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল আইনের বলে কারিকরদিগের কার্য্য করিবার সময় স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বালক এবং স্ত্রীলোক-দিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের "শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনে"র (Workmen's Compensation Act) বলে শ্রমিক-দিগকে দুর্ঘটনার পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মকর সম্মেলন আইন (Trade Union Act) বিধিবদ্ধ হওয়ায় শ্রমিকগণের পক্ষে সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থার উন্নতি করা সহজ হইয়াছে।

শ্রমিক আইন

যাতায়াতের ব্যবস্থাঃ—যাতায়াতের এবং মাল প্রেরণের

সুব্যবস্থার উপর জাতীয় উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হয়। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে রেলপথের বহুল প্রসার হইয়াছে। পাকা রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ কার্য্যও উপেক্ষিত হইতেছে না। মোটর, ট্রাম, জাহাজ, ব্যোমযান প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে যাতায়াত ও মাল আমদানী ও রপ্তানীর খুব সুবিধা হইয়াছে। ভারতীয়দিগকে নৌ-বিদ্যাদানের জন্য কোন বিশেষ জাহাজে ভারতীয় শিক্ষানবিশ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতির প্রবর্ত্তনে ভারতবাসীর ব্যবসা-বাণিজ্যে ও সংবাদ আদান প্রদানে সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

রেলপথ

ব্যোমযান

নৌ-বিদ্যা

আভ্যন্তরীণ শান্তি ও দেশরক্ষাঃ—বৃটিশ শাসকগণ আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারতরক্ষার জন্য স্থল, জল ও বিমান-বাহিনীতে বহু সৈনিক নিযুক্ত আছে। গত মহাসমরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীদিগের কয়েকজনকে সম্রাট্ নিয়োজিত সৈন্যাধ্যক্ষের মর্য্যাদা (King's Commission) অর্পণ করিয়াছেন। যুদ্ধশিক্ষার জন্য দেরাদুনে একটি সামরিক বিদ্যানিকেতনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেনাবাহিনীতে ভারতবাসীর উচ্চপদে নিয়োগের চেষ্টা হইতেছে।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

শিক্ষা বিস্তার

বৃটিশযুগের প্রারম্ভে শিক্ষার ব্যবস্থা :—ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ হইতেই শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হইয়াছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাশীর সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলিকাতার মাদ্রাসা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজ

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ বদলির সময় ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রচার কল্পে সাহায্যদান করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ

ক্যারী (Carey), মার্শম্যান (Marshman) ও ওয়ার্ড (Ward) প্রমুখ কয়েকজন খৃষ্টান মিশনারী ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিয়া ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে যে মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর ক্রমে সমসাময়িক পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইতে লাগিল। বাংলাদেশে রাজা রামমোহন রায় এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ ঘড়ি-ব্যবসায়ী ডেভিড্ হেয়ারও প্রতীচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার এদেশবাসীর নিকট উন্মুক্ত করিতে তাঁহার সমুদয় কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁহার সহিত রাজা

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তন

আজ্ঞাপত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্ (Public Instruction) অর্থাৎ সরকারী শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হয় এবং এই সময় হইতেই সরকারী সাহায্য শুধু সরকার প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুলে না দিয়া অপরাপর বিদ্যালয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃহৎ প্রদেশসমূহে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান আজ্ঞাপত্রের ব্যবস্থা সমূহের অন্যতম।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আদেশপত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংএর শাসনকালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডক্টর উইলিয়াম্ হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন (Education Commission) বসে। এই কমিশনের রিপোর্টের ফলে বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্যাদি (Grant-in-aid) দ্বারা উৎসাহ প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শিক্ষা প্রচারের উপযোগিতা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। লর্ড রিপণ প্রবর্ত্তিত পৌর ও জানপদ (Rural) সমিতিগুলির হস্তে প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পিত হয়।

হাণ্টার কমিশন

শিক্ষা সম্পর্কে তদন্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার:—১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জ্জন শিক্ষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি একটি তদন্ত সভা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সভা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অবস্থা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়-আইন (University Act of 1904) পাশ হয়। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারের প্রভুত্ব বর্দ্ধিত করিবার ব্যবস্থা ছিল

বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯০৪ খৃঃ

সন্দেহ নাই। তৎকালে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও হইয়াছিল। কিন্তু এই আইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্য্যক্ষেত্রের আয়তন বাড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান করিবার অধিকার দেয় এবং এই আইনের সাহায্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গের রাজধানীতে এক বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের শাসনকালে উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। মাইকেল স্যাড্‌লার (Dr. Michæl Sadler) এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম বিখ্যাত সদস্য ছিলেন। এই কমিশনের ব্যবস্থার ফলে ভারতের নানা প্রদেশে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন অদ্যাপি সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

সর্ব্ব স্তরে শিক্ষার প্রসারঃ—১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইন অনুসারে শিক্ষা প্রাদেশিক সরকারের শাসন বিভাগের মধ্যে গণ্য। ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন একজন দেশীয় মন্ত্রী এই বিষয়টির তত্ত্বাবধান করেন। বর্ত্তমানে ভারতের নানাস্থানে অনেক নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন

প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য্য করিবার আইনও (Compulsory Primary Education) নানা প্রদেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং স্থল বিশেষে ইহার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

শিক্ষার প্রসার

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারী খরচের পরিমাণ ও ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার যদিও পুরুষের শিক্ষার অনুপাতে কম, তথাপি ইদানীং এ বিষয়েও উন্নতি হইয়াছে।

স্ত্রী-শিক্ষা

ভারতবর্ষের শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে শুধু সাহিত্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বৈষয়িক ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করিতেছে। চিকিৎসা, পূর্ত্তবিদ্যা (ইঞ্জিনীয়ারিং), কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার জন্য অনেক নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। ভারতের উচ্চনীচ সর্ব্বস্তরের অধিবাসিগণ সুশিক্ষিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

উপসংহার :—ভারতবর্ষ মানব-সভ্যতার আদি জন্মভূমি না হইলেও, এক প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান সন্দেহ নাই। অতীতে কত জাতি যে এদেশে আসিয়া আপনাদিগের স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মুসলমান বিজয়ের পরে দুইটি সভ্যতা এমন সুন্দর ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে তাহার চিহ্ন আজিও আমরা স্থাপত্যে, চিত্রে, কবিতায়, সাধারণ আচার ব্যবহারে এবং অন্ধ কুসংস্কারের মধ্যেও দেখিতে পাইতেছি। তারপরে পশ্চিম হইতে অপর এক নূতন জাতি আসিল; ক্রমে ভারতবর্ষ বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেল। বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ পশ্চিমের সংস্পর্শে আসিয়াছে এবং যদিও আমরা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছি, তথাপি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার ত্যাগ করি নাই। ভারতবর্ষ কি প্রাচ্যের দর্শনের সহিত পশ্চিমের বিজ্ঞান, প্রাচ্যের কাব্যপ্রতিভার সহিত প্রতীচ্যের কলকৌশল, ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার সহিত ইংলণ্ডের পার্থিব জ্ঞানের মিলন ঘটাইতে পারিবে না? অথবা চিরকালই কি এই দুইটি দেশ অসন্তোষ ও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া চলিবে? ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, একমাত্র ভগবানই শুধু বলিতে পারেন। বৃটেন

কি করিয়াছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। বহুদিন ধরিয়া যে রাষ্ট্রীয় একতা আমরা কামনা করিয়া আসিতেছিলাম, বৃটেন তাহাই স্থায়ীভাবে আমাদিগকে দিয়াছে। বৃটেন আমাদিগকে শিখাইয়াছে যে জাতীয় আদর্শ ভিন্ন চিরস্থায়ী ঐক্য সম্ভবপর নহে। বৃটেনের শাসনে দেশে আবার শান্তি আসিয়াছে, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে। কিন্তু শুধু শান্তিও অবিচ্ছিন্ন শুভফল আনয়ন করে না। শান্তিস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পূর্ব্বতম সামরিক প্রতিভাও নষ্ট হইয়াছে। ভারতে বৃটিশ রাজত্ব সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত হইবার পর হইতে আমরা আর একটি শিবাজী, হায়দর আলি অথবা রণজিৎসিংহ দেখিতে পাই নাই। জগতের সর্ব্বজাতির প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের প্রাচীন শিল্প-বাণিজ্যের যে অধোগতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সুজলা সুফলা মাতৃভূমির স্বাভাবিক ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হইবার সন্ধান আমরা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট পাইয়াছি। রেল, টেলিগ্রাফ, ষ্টিমার, বিমান-পোত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় এক মহাজাতিতে পরিণত হইবার আকাঙ্ক্ষায় একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একই লক্ষ্যপথে চলিয়াছে। স্বরাজই সকলের লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে বৃটিশ এবং এদেশীয়দের মধ্যে মতভেদ নাই। তবে সময়ের তর্ক লইয়া কি মিলনের পথে বাধা পড়িবে? আশা করি, তাহা কখনই হইবে না। ভারতের অতীত গৌরবোজ্জ্বল, তাহার ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই যেন মাতৃরূপা জন্মভূমির গৌরব ও মহিমাবৃদ্ধির জন্য যত্নবান হই।

বংশ পরিচয়

মৌর্য্য সম্রাট্ বংশ

- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য
  - বিন্দুসার অমিত্রঘাত
    - সুষীম বা সুমন
    - অশোকবর্দ্ধন বা প্রিয়দর্শী
      - মহেন্দ্র (?)
      - সংঘমিত্রা (?)
      - চারুমতী (?)
      - কুণাল বা ধর্ম্মবিবর্দ্ধন (সুযশস্ ?)
        - বন্ধুপালিত (দশরথ ?)
        - সম্প্রতি
          শালিশূক
          দেবধর্ম্মন্ বা সোমশর্ম্মন্
          শতধন্বন্
          বৃহদ্রথ
        - বিগতশোক
      - জলৌক (কাশ্মীররাজ)
      - তীবর (কারুবাকীপুত্র)
    - বিগতশোক বা তিষ্য (?)

আদি গুপ্ত সম্রাট্ বংশ

মহারাজগুপ্ত

মহারাজ ঘটোৎকচ

মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত (১ম) = কুমার দেবী (লিচ্ছবি কন্যা)

,, সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাঙ্ক

,, চন্দ্রগুপ্ত (২য়) (বা দেবগুপ্ত) বিক্রমাদিত্য

- গোবিন্দগুপ্ত (ত্রিহুত)
- ,, কুমারগুপ্ত (১ম) বা মহেন্দ্রাদিত্য
- প্রভাবতী (বাকাটক রাজমহিষী)

কুমারগুপ্ত (১ম) →

- মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
- মহারাজাধিরাজ পুরগুপ্ত → মহারাজাধিরাজ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য → মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্ত (২য়) (ক্রমাদিত্য)
- ঘটোৎকচগুপ্ত (?)
- মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্ত (?) → তথাগতগুপ্ত → বালাদিত্য → বজ্র

থানেশ্বর ও কনৌজের পুষ্যভূতি রাজবংশ

নরবর্দ্ধন

রাজ্যবর্দ্ধন (১)

আদিত্যবর্দ্ধন

মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধন

- মহারাজাধিরাজ রাজ্যবর্দ্ধন (২য়)
- মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য
- রাজ্যশ্রী (মৌখরি রাজমহিষী)

হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য → কন্যা = বলভীরাজ ধ্রুবসেন বা ধ্রুবভট বালাদিত্য

মহারাজাধিরাজ ধরসেন (৪র্থ)

বাংলার পাল রাজবংশ

- দয়িতবিষ্ণু
  - শ্রীবপ্যট
    - প্রথম গোপাল
      - ধর্ম্মপাল
        - ত্রিভুবনপাল
        - দেবপাল
          - রাজ্যপাল
      - বাক্‌পাল
        - জয়পাল
          - প্রথম বিগ্রহপাল (শূরপাল)
            - নারায়ণপাল
              - রাজ্যপাল
                - গোপাল (দ্বিতীয়)
                  - বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়)
                    - মহীপাল (প্রথম)
                      - নয়পাল
                        - বিগ্রহপাল (তৃতীয়)
                          - মহীপাল (দ্বিতীয়)
                          - শূরপাল
                          - রামপাল
                            - রাজ্যপাল
                            - কুমারপাল
                              - গোপাল (তৃতীয়)
                            - মদনপাল

বাংলার সেন রাজবংশ

বীরসেন
|
সামন্তসেন (রাঢ় বা পশ্চিম বঙ্গ)
|
হেমন্তসেন
|
বিজয়সেন (সমগ্র বঙ্গদেশ)
|
বল্লালসেন
|
লক্ষ্মণসেন
|
বিশ্বরূপসেন — কেশবসেন

? লখ্মণ্য পিসার রায় লখ্মন্ (তবাকত-ই-আকবরীতে উল্লিখিত)

দিল্লীর মুইজ্জী ও সামসী বংশীয় দাসরাজগণ ১২০৬-৯০

১ কুত্‌বুদ্দীন অইবক ১২০৬-১০
(মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘুরীর-ক্রীতদাস)

- ২ আরাম (দত্তক ?)
  মৃত্যু ১২১১
- কন্যা =৩ সামসুদ্দীন ইল্‌তুৎমিস্
  (দাস) মৃত্যু ১লা মে, ১২৩৬
  - নাসিরুদ্দীন মামুদ
    (বঙ্গদেশ)
  - ৪ রুক্‌নুদ্দীন
    ফিরুজশাহ
    সিংহাসনচ্যুত ও নিহত
    ২০শে নভেম্বর, ১২৩৬
    - ৭ আলাউদ্দীন মসুদ
      সিংহাসনচ্যুত ১১ই জুন, ১২৪৬
  - ৫ কন্যা রজিয়া
    সিংহাসনচ্যুত
    মে, ১২৪০
    মৃত্যু ১৫ই অক্টোবর,
    ১২৪০
  - ৬ মুইজুদ্দীন বহ্‌রাম
    মৃত্যু ১৫ই মে,
    ১২৪২
  - ৮ নাসিরউদ্দীন মামুদ ?
    মৃত্যু ১৯শে ফেব্রুয়ারী,
    ১২৬৬
    - কন্যা =
      - ১০ মুইজউদ্দীন কেকুবাদ
        নিহত ১৪ই অক্টোবর, ১২৯০
        - ১১ কয়ুমারস
  - কন্যা = ক্রীতদাস
    ৯ গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন
    মৃত্যু ১২৮৬
    - কুমার মহম্মদ
    - নাসিরউদ্দীন মামুদ
      বুঘ্‌রা খাঁ (বাংলা)

দিল্লীর লোদী রাজগণ ১৪৫১-১৫২৬

১ বাহলুল লোদী, মৃত্যু—১৪৮৯

বারবক শাহ
(জৌনপুর)

২ নিজাম খাঁ সিকন্দর লোদী
মৃত্যু—২১শে নভেম্বর, ১৫১৭

৩ ইব্রাহিম লোদী
মৃত্যু—২১শে এপ্রিল, ১৫২৬

আলম

দিল্লীর সূর রাজবংশ ১৫৪০-৫৫

ইব্রাহিম খাঁ

হাসান খাঁ — গাজী খাঁ — অজ্ঞাতনামা ?

১ ফরিদ খাঁ
শের শাহ
নিহত—২২শে মে, ১৫৪৫

নিজাম খাঁ

৪ ইব্রাহিম শাহ

৫ সিকন্দর শাহ

২ ইস্‌লাম (সেলিম) শাহ =কন্যা
মৃত্যু—২১শে অক্টোবর, ১৫৫৪

৩ আদিল শাহ
নিহত—১৫৫৬

কন্যা= ইব্রাহিম শাহ
(উড়িষ্যায় নিহত,
১৫৬৭-৬৮)

কন্যা= সিকন্দর শাহ
(? বঙ্গে মৃত্যু—
১৫৫৮-৫৯)

ফিরুজ শাহ
নিহত—অক্টোবর, ১৫৫৪

গবর্ণর-জেনারেলগণের নাম

[১] বাংলার ফোর্ট-উইলিয়মের গবর্ণর-জেনারেলগণ

(রেগুলেটিং এ্যাক্ট ১৭৭৩)

(অস্থায়ী শাসকগণের নাম তারকা চিহ্নিত)

১৭৭৪ (অক্টোবর) ওয়ারেণ হেষ্টিংস্

১৭৮৫ (ফেব্রুয়ারী) * সার জন ম্যাক্‌ফারসন

১৭৮৬ (সেপ্টেম্বর) আর্ল (মার্কুইস্) কর্ণওয়ালিস্

১৭৯৩ সার জন সোর (লর্ড টেনমাউথ)

১৭৯৮ (মার্চ্চ) *সার এ. ক্লার্ক

১৭৯৮ (মে) আর্ল অব মর্ণিংটন (মার্কুইস্ ওয়েলেস্‌লি)

১৮০৫ (জুলাই ৩০) মার্কুইস্ কর্ণওয়ালিস্ (দ্বিতীয় বার)

১৮০৫ (অক্টোবর) *সার জর্জ্জ বার্লো

১৮০৭ (জুলাই) ব্যারণ (আর্ল অব) মিণ্টো (প্রথম)

১৮১৩ (অক্টোবর ৪) আর্ল অব ময়রা (মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্)

১৮২৩ (জানুয়ারী) *জন এডাম

১৮২৩ (আগষ্ট ১) ব্যারণ (আর্ল) আমহার্ষ্ট

১৮২৮ (মার্চ্চ) *উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেইলী

১৮২৮ (জুলাই ৪) লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিস্-বেণ্টিঙ্ক

[২] ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলগণ

(চার্টার এ্যাক্ট ১৮৩৩)

১৮৩৩ লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিস্-বেণ্টিঙ্ক

১৮৩৫ (মার্চ্চ ২০) *সার চার্লস্ (লর্ড) মেটকাফ

১৮৩৬ (মার্চ্চ) ব্যারণ (আর্ল অব) অক্‌ল্যাণ্ড

১৮৪২ (ফেব্রুয়ারী) ব্যারণ (আর্ল অব) এলেনবরা

১৮৪৪ (জুন) *উইলিয়াম উইলবারফোর্স্ বার্ড

১৮৪৪ (জুলাই) সার হেন্‌রি (ভাইকাউন্ট) হার্ডিঞ্জ

১৮৪৮ (জানুয়ারী) আর্ল (মার্কুইস্) অব ডালহৌসী

১৮৫৬ (ফেব্রুয়ারী) ভাইকাউন্ট (আর্ল) ক্যানিং

[৩] গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়গণ

১৮৫৮ (নভেম্বর ১) ভাইকাউন্ট (আর্ল) ক্যানিং

১৮৬২ (মার্চ্চ) আর্ল অব এলগিন এ্যাণ্ড কিঙ্কারডাইন (প্রথম)

১৮৬৩ * সার রবার্ট নেপিয়র (ব্যারণ নেপিয়র অব ম্যাগডালা)

১৮৬৩ * সার উইলিয়াম টি ডেনিসন

১৮৬৪ (জানুয়ারী) সার জন (লর্ড) লরেন্স

১৮৬৯ (জানুয়ারী) আর্ল অব মেয়ো

১৮৭২ * সার জন ষ্ট্র্যাচি

১৮৭২ * লর্ড নেপিয়ার অব মার্চ্চিষ্টন

১৮৭২ (মে) ব্যারণ (আর্ল অব) নর্থব্রুক

১৮৭৬ (এপ্রিল) ব্যারণ (আর্ল অব) লিটন

১৮৮০ (জুন) মার্কুইস্ অব রিপণ

১৮৮৪ (ডিসেম্বর) আর্ল অব ডফ্‌রিণ (মার্কুইস্ অব ডফ্‌রিণ এ্যাণ্ড্ আভা)

১৮৮৮ (ডিসেম্বর) মার্কুইস্ অব ল্যান্সডাউন্

১৮৯৪ (জানুয়ারী) আর্ল অব এল্‌গিন এ্যাণ্ড্ কিঙ্কারডাইন (দ্বিতীয়)

১৮৯৯ (জানুয়ারী) ব্যারণ (আর্ল) কার্জ্জন অব কেড্‌লৃষ্টন

১৯০৪ (এপ্রিল) * লর্ড এম্পট্‌হিল

১৯০৪ (ডিসেম্বর) ব্যারণ (মার্কুইস্) কার্জ্জন অব কেড্‌লৃষ্টন (পুনর্নিযুক্ত)

১৯০৫ (নভেম্বর) আর্ল অব মিণ্টো (দ্বিতীয়)

১৯১০ (নভেম্বর) ব্যারণ হার্ডিঞ্জ অব পেনস্‌হার্ষ্ট

১৯১৬ (এপ্রিল) ব্যারণ চেম্‌স্‌ফোর্ড

১৯২১ (এপ্রিল) আর্ল অব রেডিং

১৯২৫ * লর্ড লিটন (দ্বিতীয়)

১৯২৬ (এপ্রিল) লর্ড আরউইন

১৯২৯ *লর্ড গোসেন (লর্ড আরউইনের অনুপস্থিতিতে)

১৯৩১ (এপ্রিল) দি রাইট্ অনারেবল দি আর্ল অব উইলিংডন

১৯৩৪ * সার জর্জ্জ ষ্ট্যান্‌লী (লর্ড উইলিংডনের অনুপস্থিতিতে)

১৯৩৬ (১৮ এপ্রিল) লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো

বাংলার লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণরগণ

সার ফ্রেডারিক জেম্‌স্‌ হালিডে	...	১৮৫৪
সার জন পিটার গ্র্যাণ্ট	...	১৮৫৯
সার সেসিল বিডন	...	১৮৬২
সার উইলিয়াম গ্রে	...	১৮৬৭
সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল	...	১৮৭১
সার রিচার্ড টেম্পল	...	১৮৭৪
সার এস্‌লি ইডেন	...	১৮৭৭
সার ষ্টুয়ার্ট সি. বেইলী (অস্থায়ী)	...	১৮৭৯
সার অগাষ্টাস্‌ রিভার্স টমসন	...	১৮৮২
এইচ. এ. ককারেল (অস্থায়ী)	...	১৮৮৫
সার ষ্টুয়ার্ট সি. বেইলী	...	১৮৮৭
সার চার্লস্‌ আলফ্রেড ইলিয়ট	...	১৮৯০
সার এ. পি. ম্যাক্‌ডোনেল (অস্থায়ী)	...	১৮৯৩
সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি, ৬ই এপ্রিল, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন	...	১৮৯৫
চার্লস্‌ সিসিল ষ্টিভেন্‌স্‌ (অস্থায়ী)	...	১৮৯৭
সার জন উডবার্ণ, ২১শে নভেম্বর, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু		১৮৯৮
জে. এ. বোর্ডিলন (অস্থায়ী)	...	১৯০২
সার এ. এইচ. লীথ ফ্রেজার	...	১৯০৩
ল্যান্সেলট্‌ হেয়ার (অস্থায়ী)	...	১৯০৬
এফ্‌. এ. স্ল্যাক্‌ (অস্থায়ী)	...	১৯০৬

"বর্লাস-তুর্ক", "চঘতী গুর্গনী" বা "মুঘল" (মোগল) বলিয়া খ্যাত

তৈমুর বংশীয় প্রথম ছয়জন রাজা (১৫২৬-১৭০৭)

- ১ জহীরউদ্দীন বাবর, মৃত্যু—১৫৩০
  - ২ মহম্মদ হুমায়ুন মৃত্যু—১৫৫৬
    - ৩ জালালুদ্দীন আকবর মৃত্যু—১৬০৫
      - ৪ নূরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর (সেলিম) মৃত্যু—১৬২৭
        - খুসরু
          - দাওয়ার বখ্শ
        - পরভেজ
        - ৫ শিহাবউদ্দীন মহম্মদ শাহজাহান সিংহাসনচ্যুত ১৬৫৮, মৃত্যু—১৬৬৬
          - দারা শিকোহ্
          - সুজা
          - ৬ মুহীউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজীব আলমগীর মৃত্যু—১৭০৭
          - মুরাদ
        - শাহরিয়র
      - মুরাদ
      - দানিয়াল
    - মির্জ্জা হাকিম
  - কামরাণ
  - হিন্দল
  - আস্করি

মহারাষ্ট্রের ভোঁসলা ছত্রপতিগণ

মালোজী (চিতোরের রাজবংশধর বলিয়া দাবী করেন)

দেবগিরির যাদবগণ

লুখজী যাদব

জিজাবাই = শাহজী = তুকাবাই

ব্যাঙ্কোজী বা একোজী (তাঞ্জোর)

সন্তাজী (কনক-গিরিতে মৃত্যু হয়)

সইবাই = প্রথম শিবাজী = সোয়রাবাই

য়েশুবাই = প্রথম সন্তাজী

শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী)

রামরাজা

দ্বিতীয় শাহু (দত্তক)

প্রতাপসিংহ

শাহজীরাজা

তারাবাই = রাজারাম = রাজসবাই

তৃতীয় শিবাজী

রামরাজা (শাহুর দত্তক পুত্র)

দ্বিতীয় সন্তাজী (কোল্হাপুর)

মহারাষ্ট্রের পেশবাগণের বংশ পরিচয়

- বিশ্বনাথ
  - ১ বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৪)
    - ২ প্রথম বাজীরাও (১৭২০)
      - ৩ বালাজী বাজীরাও (১৭৪০)
        - বিশ্বাসরাও
        - ৪ মাধবরাও বল্লাল (১৭৬১)
        - ৫ নারায়ণ রাও (১৭৭২)
          - ৭ মাধবরাও নারায়ণ (১৭৭৪)
      - ৬ রঘুনাথ রাও (রাঘব) (১৭৭৩)
        - অমৃতরাও (দত্তক)
          - বিনায়ক রাও
        - ৮ বাজীরাও দ্বিতীয় (১৭৯৬)
          - নানাসাহেব (দত্তক পুত্র)
        - চিমনজী আপ্পা
    - চিমনজী আপ্পা
      - সদাশিব রাও ভাও

৬ মুহীউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজীব আলমগীর (প্রথম), মৃত্যু—১৭০৭

- মহম্মদ সুলতান
  মৃত্যু—১৬৭৬
- ৭ মুয়াজ্জম শাহ আলম (প্রথম) বাহাদুর শাহ
  সিংহাসনারোহণ ১৭০৭
  মৃত্যু—১৭১২
  - ৮ মুইজউদ্দীন জাহান্দার শাহ
    ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে নিহত
    - ১৪ (ক) আজিজুদ্দীন আলমগীর (দ্বিতীয়)
      ১৭৫৪এ সিংহাসন লাভ, ১৭৫৯এ নিহত
      - ১৫ (ক) মির্জ্জা আবদুল্লা আলা গোহর, শাহ আলম (দ্বিতীয়)
        ১৭৫৯এ সিংহাসন লাভ, ১৭৮৮এ অন্ধ,
        ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু
        - ১৬ আকবর শাহ (দ্বিতীয়)
          সিংহাসন লাভ ১৮০৬, মৃত্যু —১৮৩৭
          - ১৭ বাহাদুর শাহ (২য়)
            ১৮৩৭এ সিংহাসনারোহণ
            ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পদচ্যুত, মৃত্যু—১৮৬২
  - আজিমউদ্দীন আজিম্ উশ্-শান
    - ৯ মহম্মদ ফরখ্সিয়র
      সিংহাসন লাভ ১৭১২,
      নিহত ১৭১৯
  - রফিউল কাদের রফিউশ্-শান
    - ১২ (খ) মহম্মদ ইব্রাহিম
      ১৭২০
    - ১১ রফিউদ্দৌলা বা শাহজাহান (দ্বিতীয়)
      সিংহাসনারোহণ ও মৃত্যু—১৭১৯
    - ১০ (ক) রফিউদ্দরজাৎ
      সিংহাসনারোহণ ও মৃত্যু—১৭১৯
  - খুজিস্তাহ্ আখ্তার জাহান শাহ
    (যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত)
    - ১২ (ক) মহম্মদ শাহ
      সিংহাসন লাভ ১৭১৯,
      মৃত্যু—১৭৪৮
      - ১৩ আহম্মদ শাহ
        সিংহাসনারোহণ ১৭৪৮
        সিংহাসনচ্যুত ১৭৫৪,
        - ১৫ (খ) বিদর বখ্ত
- মহম্মদ আজম
  ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে জাজাউএ নিহত
  - বিদর বখ্ত
    জাজাউএ নিহত
- আক্বর
  ১৭০৪ বা ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে পারস্যে মৃত্যু
  - ১০ (খ) নেকুসিয়র
    ১৭১৯
- কামবক্স
  হায়দরাবাদের নিকট নিহত—১৭০৯
  - মহীউস্ সুন্নত
    - ১৪ (খ) শাহজাহান (তৃতীয়)

সার ই. এন্. বেকার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন	...	১৯০৮
এফ্. ডব্লিউ. ডিউক (অস্থায়ী)	...	১৯১১

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল লেফ্টেনাণ্ট-গবর্ণরের পদ তুলিয়া দেওয়া হয় এবং বঙ্গদেশে গবর্ণর শাসন পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়।

বাংলার গবর্ণরগণের নাম

[* চিহ্নিত রাজপুরুষগণ অস্থায়ীভাবে কার্য্য করেন]

দি রাইট্ অনারেবল ব্যারণ কারমাইকেল অব স্কার্লিং, জি. সি. আই. ই., কে. সি. এম্. জি.	...	১৯১২
দি রাইট্ অনারেবল আর্ল অব রোণাল্ডসে, জি. সি. আই. ই.		১৯১৭
* সার হেন্‌রি হুইলার (মার্চ্চ)	...	১৯২২
দি রাইট্ অনারেবল লর্ড লিটন	...	১৯২২
* সার জন কার (১০ই এপ্রিল হইতে ৭ই আগষ্ট)		১৯২৫
দি রাইট অনারেবল লর্ড লিটন (৮ই আগষ্ট হইতে)		১৯২৫
* সার হিউ ষ্টিফেন্‌সন্ (১১ই জুন হইতে ১০ই অক্টোবর)		১৯২৬
দি রাইট্ অনারেবল লর্ড লিটন (১১ই অক্টোবর হইতে)		১৯২৬
দি রাইট্ অনারেবল সার ফ্রান্সিস্ ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন, পি. সি. জি., সি. আই. ই.	...	১৯২৭
* সার হিউ ষ্টিফেন্‌সন্ (৫ই জুন হইতে চারি মাস)		১৯৩০
দি রাইট্ অনারেবল সার ফ্রান্সিস্ ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন		১৯৩০
সার জন এণ্ডার্সন	...	১৯৩২
* সার এ্যাক্‌রয়েড্ উড্‌হেড্ (অস্থায়ী)	...	১৯৩৪
সার জন এণ্ডার্সন	...	১৯৩৪
লর্ড ব্র্যাবুর্ণ	...	১৯৩৭

বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণরগণ

লর্ড সিংহ অব রায়পুর, পি. সি., কে. সি.	...	১৯২০
সার হেন্‌রি হুইলার	...	১৯২১
সার হিউ ল্যান্সডাউন ষ্টিফেন্‌সন, কে. সি. এস্. আই.		১৯২৭
সার জেম্‌স্ ডেভিস্ সিফ্‌টন্	...	১৯৩২

বিহারের গবর্ণর

সার মরিস্ গার্ণার হ্যালেট	...	১৯৩৭

উড়িষ্যার গবর্ণর

সার জন অষ্টেন হিউব্যাক্	...	১৯৩৬

আসামের গবর্ণরগণ

সার নিকোলাস ডড্ বিটসন্ বেল, কে. সি. এস্. আই.		১৯২১
সার উইলিয়াম সিনক্লেয়ার ম্যারিস, কে. সি. এস্. আই., কে. সি. আই. ই.	...	১৯২২
সার জন হেন্‌রি কার, কে. সি. এস্. আই., কে. সি. আই. ই.	...	১৯২৫
সার উইলিয়াম জেম্‌স্ রীড্, কে. সি. আই. ই., সি. এস্. আই.	...	১৯২৫
সার এগ্‌বার্ট লরি লুকাস হ্যামণ্ড, কে. সি. এস্. আই., সি. বি. ই.	...	১৯২৭
সার মাইকেল কীন	...	১৯৩২
সার রবার্ট নীল রীড	...	১৯৩৭

নির্ঘণ্ট

য

র